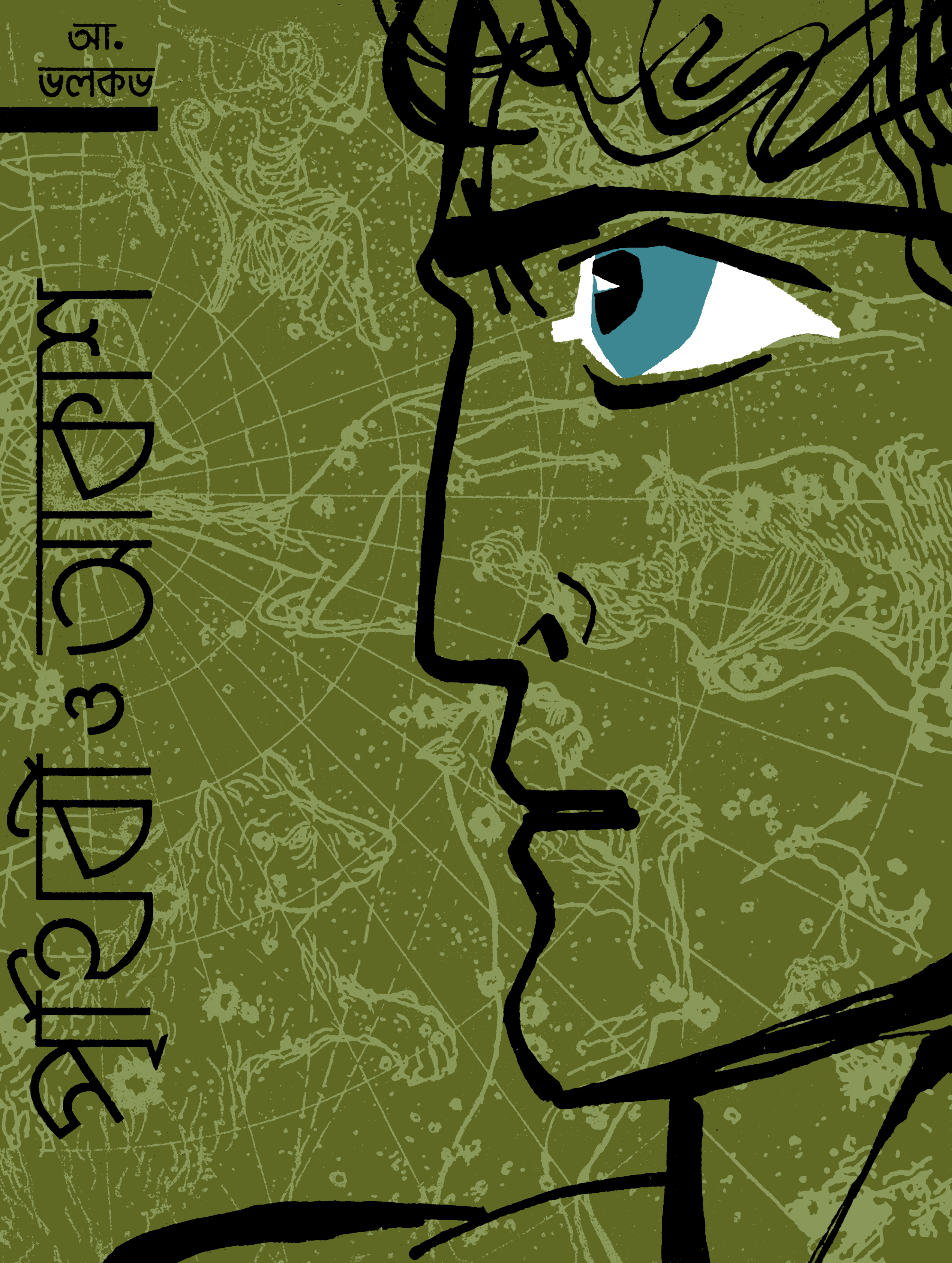
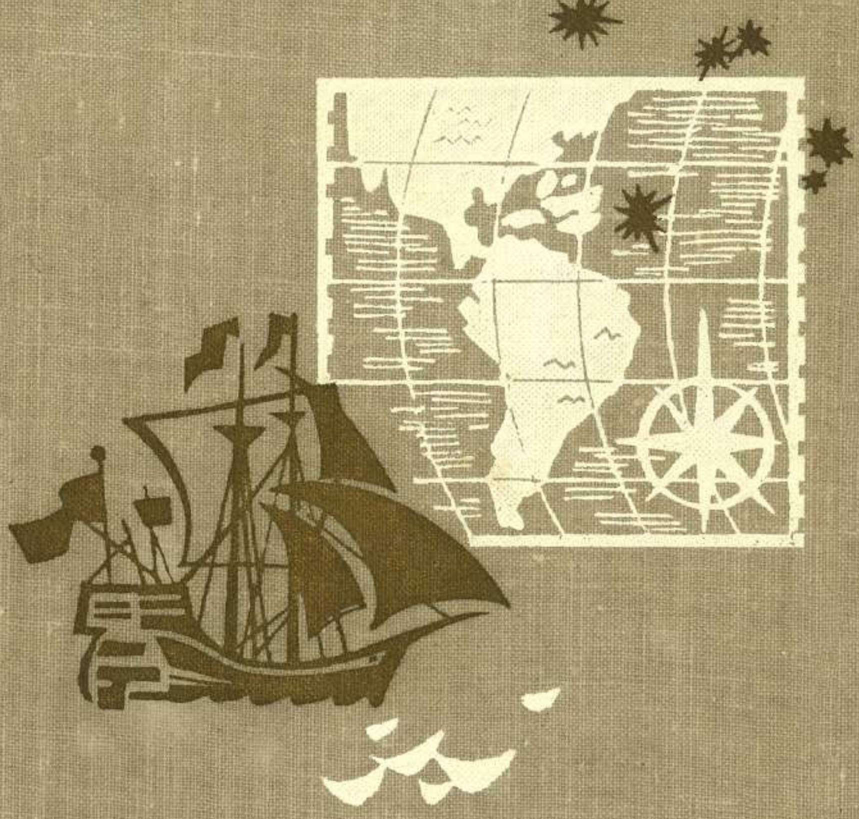
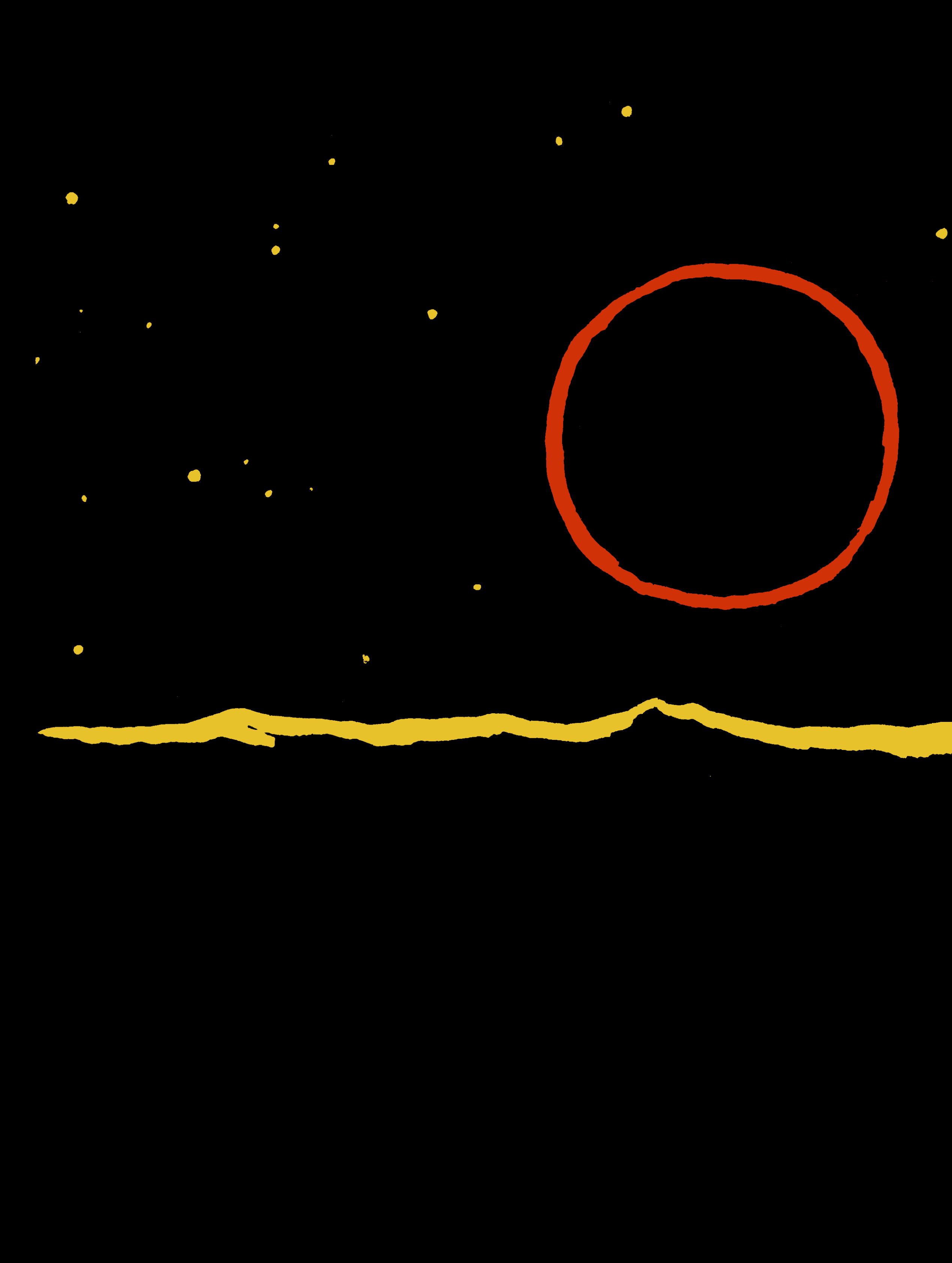
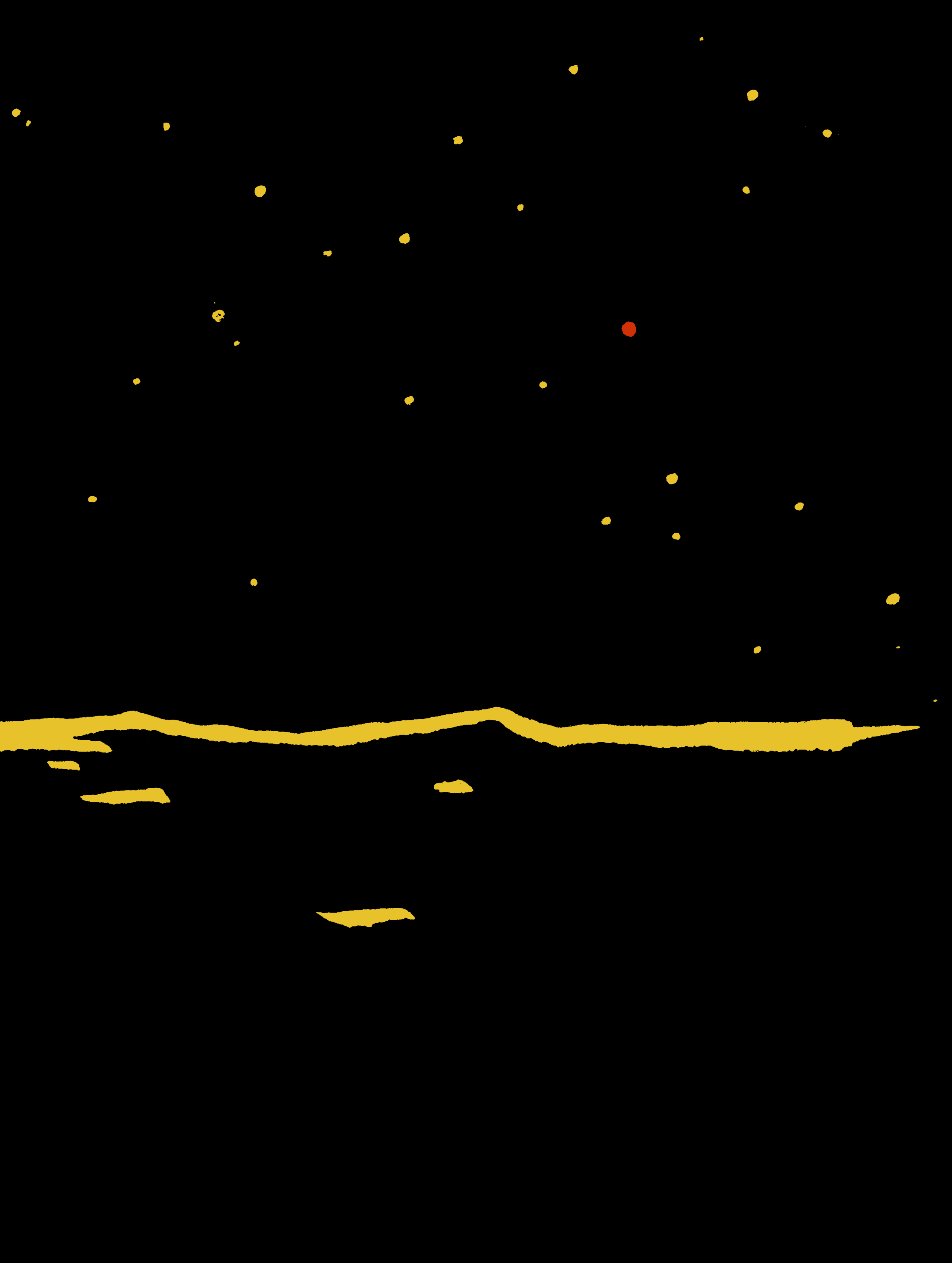

আ.
ভলকভ
পৃথিবী ও আকাশ

আ.
ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ

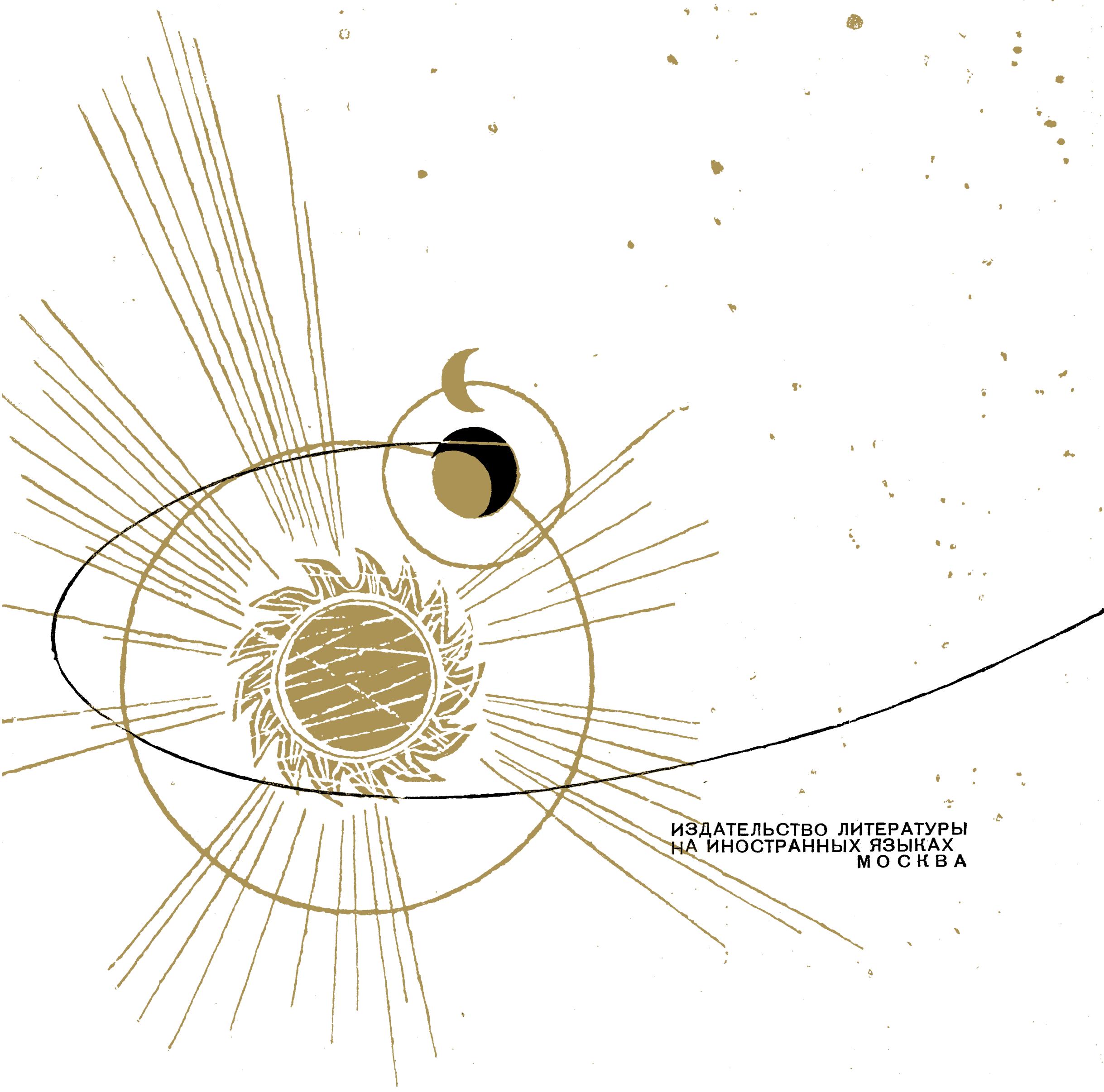






А. ВОЛКОВ

ЗЕМЛЯ И НЕБО



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
МОСКВА



আ. ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ

ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: সমর সেন

সূচী

তৃতীয় খণ্ড

ভূমিকা

পূর্ণিমার সময়ে খোলামেলা জায়গায় গিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ।

চাঁদের নরম রূপালী আলোয় পৃথিবী প্লাবিত, কিন্তু সে আলো সূর্যালোকের চেয়ে অনেক ক্ষীণ; কাছাকাছির জিনিস চোখে পড়ে, কিন্তু দূরের জিনিস নীলাভ আবছায়ায় অস্পষ্ট।

আকাশকে আলো জোগায় চাঁদও; আশেপাশের তারাগুলি সে উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ে না, এমন কি দূরের তারাগুলিকেও চাঁদহীন রাত্রে যতটা তত উজ্জ্বল দেখায় না।

আবহাওয়া ভালো থাকলে রাত্রির আকাশ প্রকৃতির অপরূপ একটি দৃশ্য—চাঁদের ঝকঝকে মুখ, কালো আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হাজার হাজার তারার ফুলকি—দেখে আশ মেটে না।

তারপর দিগন্তের দিকে নামতে শুরু করে চাঁদ, শেষ পর্যন্ত একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়; অন্ধকার আকাশে দেখা দেয় নতুন সব তারা, মনে হয় তাদের জৌলুষ বেড়ে গিয়েছে।

আকাশ দেখার সবচেয়ে ভালো সময় হল গ্রীষ্মের উষ্ণ রাত্রি; নদীতীরে ছিপ নিয়ে বস বা খোলা স্তেপে নিঃসঙ্গ টিলায় শুয়ে পড়। সংক্ষিপ্ত রাত্রি কেটে যায় তাড়াতাড়ি, পূবদিকে উষার রক্তাভা। একের পর এক তারাগুলি মিলিয়ে যায়। সবচেয়ে উজ্জ্বলগুলি টিকে থাকে সবচেয়ে বেশি।

দূরে পূবের দিগন্তে ওঠে সূর্যের প্রান্তদেশ। চোখ ধাঁধানো আলোয় সূচনা হয় আর একটি নতুন দিনের।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আদিমকাল থেকে মানুষ মনে মনে কত না প্রশ্ন করেছে।

মাথার উপরে এই যে বিরাট মণ্ডল, কী সেটি? স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো শক্ত কোনো জিনিসে তৈরি? মণ্ডলের প্রান্তদেশ কি পৃথিবী ছুঁয়েছে? অগণিত দপদপে তারাগুলিই বা কি? যেমন দেখায় সত্যি কি তেমন ছোট ওগুলো? ওগুলো কি আকাশ মণ্ডলে আবদ্ধ না স্বাধীনভাবে চলমান?

তারাগুলির মধ্যে চাঁদের বিহার কেন? কেন তার আকার বদলে যায় — মাঝে মাঝে চাকতির মতো, কখনো আবার বাঁকা কাস্তে, মাঝে মাঝে একেবারে অগোচর?

গ্রীষ্মকালে সূর্য কেন অনেক উপরে ওঠে আর পৃথিবীকে উত্তাপ জোগায়, আর তুহিন শীতে দিগন্তের কাছাকাছি থেকে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকার চেষ্টা করে, যেন তুষারাবৃত মাঠ আর বরফে ঢাকা নদী দেখা তার অনিচ্ছা?

নক্ষত্র নিয়ে যার কারবার সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বয়স অত্যন্ত প্রাচীন। গ্রীক শব্দ এ্যাস্ট্রন অর্থাৎ তারা এবং নমোস অর্থাৎ নিয়ম থেকে এ্যাস্ট্রনমি কথাটার উদ্ভব।

আমাদের আদিপুরুষেরা কেন আকাশ নিয়ে মাথা ঘামান, কেন তারা-গতি নিয়ম আবিষ্কারের প্রয়াস করেন? এতে তাঁদের কী ফয়দা?

এ নিরীক্ষা শুধু যে কাজের তা নয়, অপরিহার্য। অনেক অনেক দিন আগে লোকে চাষ ও পশুপালন শুরু করে। কখন বসন্ত আসবে, কখন শুরু হবে গ্রীষ্ম, কখন দেখা দেবে বৃষ্টি-ধোওয়া হেমন্ত—সেটা না জানলে চলত না পশুপালকের ও চাষীর। আর তাই সূর্যের উপর নজর রাখতে আরম্ভ করল মানুষ; বেশ উপরে উঠেছে সূর্য, গরম লাগছে — তার মানে শীত শেষ, উজ্জ্বল উষ্ণ বসন্ত দিনের শুরু।

সূর্যের গতিবিধি নিরীক্ষার যথেষ্ট কারণ ছিল প্রাচীন মিশর, চীন ও ভারতের লোকেদের। এ সব দেশে বিরাট অনেক নদী বর্তমান, কূল ছাপিয়ে তারা মাঠে রেখে যায় উর্বর পলি। নদী উপত্যকার বাসিন্দেদের সঠিক জানা দরকার ছিল কখন বন্যা আসবে, শুধু বীজ বপনের প্রস্তুতির জন্য নয়, বন্যার হাত থেকে জিনিসপত্র, পশু, এমন কি ঘরদোর বাঁচাবার তাগিদেও।

সাধারণ লোকের পক্ষে, পশুপালক বা চাষীর পক্ষে এ নিরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়; এ কাজের ভার ছিল পুরোহিতদের উপর।

তাই পুরোহিতরা হল প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নক্ষত্রগুলির গতিতে নজর রেখে তারা বলত কখন বন্যা নামবে, কখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই দখলের দরুন জনগণের উপর জোর কর্তৃত্ব ছিল পুরোহিতদের, এত ক্ষমতাবান তারা ছিল যে রাজারা পর্যন্ত তাদের মেনে চলত।

শুধু পশুপালক ও চাষী নয়, সমুদ্রে বা স্থলপথে দূরের যাত্রীরা নক্ষত্র নিয়ে মাথা ঘামাত। দিনের বেলায় তাদের পথ দেখাত সূর্য, রাত্রে তারার আলো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৌলতে প্রাচীন পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র তৈরি করতে পারে পুরাকালের মানুষ। এমন কি এখনো এ বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে সঠিক মানচিত্র।

এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'মহাশূন্য বিজ্ঞানের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে লৌকিক প্রয়োজনের।



প্রথম খণ্ড

পৃথিবীর আকার

স্কুলের ছেলেমেয়ে সবায়ের জানা যে পৃথিবী গোল, চেহারাটা বলের মতো, আর মহাশূন্যে তার সফর।

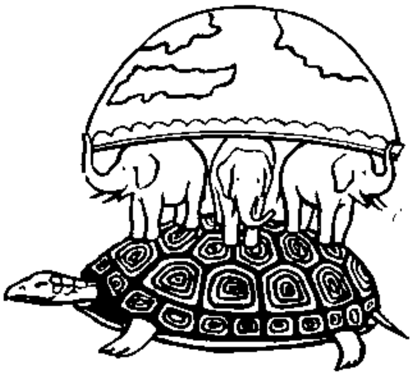
অনেক দিন আগে লোকেরা ভাবত যে পৃথিবী আকারে চেপ্টা চাকতির মতো বা একটু উত্তল (প্রাচীন যোদ্ধার বর্ম গোছের), কিছু একটার উপর ভর করে আছে। কীসের উপরে ভর করে আছে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত ছিল।

প্রাচীন ভারতের লোকেরা ভাবত পৃথিবী একটা গোলার্ধ, জিনিসটা ভর দিয়ে আছে চারটি দিগহস্তীর উপর, আর দিগহস্তীগুলো দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট একটা কূর্মের উপর। কূর্মটি কীসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সে নিয়ে তারা মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না।

আগেকার দিনে রাশিয়ায় জ্ঞানপিপাসু কোনো বাচ্চা ছেলে হয়ত জিজ্ঞেস করল:

'দাদু, পৃথিবীকে ধরে আছে কী?'

'তিমি, ভায়া, ইয়া বড়ো বড়ো তিমি,' উত্তর দিতেন দাদু। 'তিমিগুলো লেজ নড়ালেই ভূমিকম্প।'



'তিমিগুলো কীসের ওপরে ভর করে আছে, দাদু?'

'ভায়া, ওগুলো তো থাকে জলে।'

'আর জলের নিচে কী?'

'পৃথিবীর মাটি।'

'তাহলে পৃথিবী কীসের উপর দাঁড়িয়ে আছে?'

'তোর মতো বোকা আর দেখিনি। বলেছি তো পৃথিবী তিনটে তিমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ...'

এ যুক্তির শেষ কখনো হবে না।

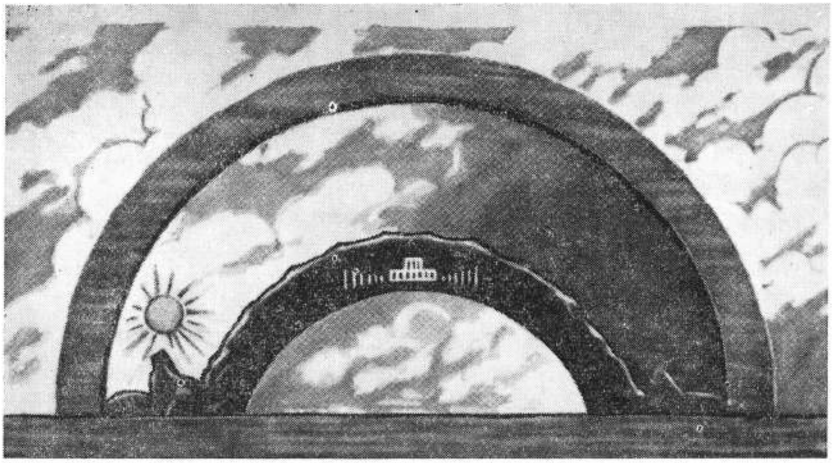
পৃথিবী টেবিলের ওপরের মতো চেপ্টা, অনেক দিন লোকে এটা যে ভাবত তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অবাক হবার কথা হল যে, মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের গ্রহের সত্যিকার আকার বের করতে পারে। অবশ্য এটা করতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়, লোকে যখন সমুদ্রে এবং স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে তখন ব্যাপারটা বোঝা সহজতর হয়।

লোকে দেশ বিদেশে ভ্রমণ শুরু করে এত দিন আগে যে প্রথম যাত্রাগুলির কথা কোনো ইতিহাস বলতে পারবে না। দাবানল, বন্যা, ক্ষুধা, উত্তর থেকে নেমে-আসা বরফ, মরুভূমি থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে-পড়া বালি, ইত্যাদির দরুন মানুষ বাধ্য হয় স্থান পরিবর্তনে ...



আদিম মানুষের যাত্রা এত মন্থর ছিল যে সেটাকে ভ্রমণ না বলে দেশান্তর যাত্রা বলাই উচিত। যাই হোক, অনেক বছর ব্যাপী যাত্রার মধ্যে লোকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিবাহিত করত।

ইতিহাসের পরের যুগে মানুষ পণ্য বিনিময়ের জন্য যেত অন্য জায়গায়। তলোয়ার, ছুরি ও ধাতুর শক্ত পাত্রের বদলে শিকারীরা দিত জন্তুজানোয়ারের চামড়া, যারা চাষ করত তারা কাপড়, সুন্দর ব্রেসলেট ও গলার হারের বদলে দিত খাদ্যশস্য। গোটা একটা



ব্যাবিলনীয়দের চোখে পৃথিবী।

উপজাতির পক্ষে এ পণ্য বিনিময়ে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ লোকে যেত এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যবসার জন্য — এরা ছিল সওদাগর।

আগেকার দিনের সওদাগররা ছিল সাহসী উদ্যোগী লোক; প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চালাতে হত তাদের, বুনো জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হত; সম্পদলোভী হামলাদারদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হত।

স্থলপথে দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত সওদাগররা, সমুদ্র পাড়ি দিত ছোট ছোট জাহাজে।

প্রায় সাত শ' বছর আগে ইতালীয় সওদাগর মার্কো পোলো ইতালির ভেনিস সহর থেকে ভ্রমণ করে যান চীনে। তিনি যান স্থলপথে, উত্তুঙ্গ পাহাড় আর সীমাহীন মরুভূমি পেরিয়ে, ফেরেন জলপথে, দক্ষিণ এশিয়ার উপকূল বরাবর।

মার্কো পোলো যখন ভেনিস ছাড়েন তখন তিনি কিশোর আর ফিরে আসেন মধ্য বয়সে। চব্বিশ বছর দেশছাড়া ছিলেন তিনি। চীনে কাটান সতেরো বছর, সেখানে যাবার আর ফেরার পথে কাটে সাত বছর।

ভেনিসে ফিরে এসে বহু দিন বেঁচে থাকেন মার্কো পোলো। তখনকার চীনে জীবনযাত্রার বিষয়ে বড়ো একটা বই তিনি লেখেন।

দু শ' বছর পরে ত্ভের-এর রুশ সওদাগর আফানাসি নিকিতিন যান প্রাচ্যে। উত্তর রাশিয়া থেকে পারস্য হয়ে তিনি যান ভারতে। 'তিন সমুদ্র পাড়ি' নামের একটি মনোগ্রাহী

বই-এ নিজের যাত্রার কথা তিনি লিখেছেন। ভারতে পেঁাছতে ছ বছর লাগে নিকিতিনের।

তখনকার দিনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেক সময় লাগত। আজকাল যেখানে হপ্তাখানেক দুয়েক লাগে, তখন সেখানে পেঁাছতে বছরের পর বছর কেটে যেত। দ্রুতগামী উড়োজাহাজ, রেলওয়ে বা বাষ্পপোত তো ছিল না। স্থলে সওদাগরদের বাহন ছিল ঘোড়া বা উটের ক্যারাভান, সমুদ্রে ক্ষুদে জাহাজ।

তবু অনেক লোক দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত। সে-সব যাত্রার স্মৃতি অবলুপ্ত হয়ে যেত অবিলম্বে, কেননা মার্কো পোলো এবং আফানাসি নিকিতিনের মতো নিজেদের এ্যাডভেঞ্চারের কথা লিখে রাখতে পারে এমন লোক বেশি ছিল না।

দূর দেশে যাত্রার ফলে লোকে পৃথিবীর বিষয়ে আরো ভালো করে, বিশদ করে জানল। দেখা দিল পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের মানচিত্র — অবশ্য এগুলো অনেক দিনই নিখুঁত বা সম্পূর্ণ ছিল না।

ধরো ১৩ পাতার মানচিত্রটা। দু হাজার বছরেরও আগে এটা আঁকেন একটি ভূগোলবিদ। পৃথিবীকে চেপ্টা একটা চাকতির মতো দেখানো হয়েছে, যেন খাবার প্লেট, শুকনো ডাঙাকে ঘিরে আছে ওসেনাস নদী। ডাঙার মাঝখানে বড়ো একটা সমুদ্র — এমন কি পুরাকালেও লোকে ভালো করে জানত সমুদ্রটিকে: একে পাড়ি দিত সওদাগর, যুদ্ধ জাহাজ, জলদস্যু। এর নাম ভূমধ্যসাগর, মেডিটেরানিয়ন; লাটিন শব্দ মেডিয়াস — মধ্য এবং টেরা — ভূমি থেকে কথাটার উৎপত্তি। লোকে ভাবত এটার অবস্থিতি পৃথিবীর মধ্যভাগে। এখন সবাই জানে কথাটা ঠিক নয়, তবু নামটা টিকে আছে।

আজকালকার মানচিত্রে লাইনের একটা ঘন বুনোট চোখে পড়ে, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ রেখা। গোলকে যে কোনো পয়েন্টের অবস্থান ঠিক করতে আমাদের সাহায্য করে লাইনগুলি।

ডিগ্রিতে নির্দিষ্ট লাইনগুলি বের করা হয় আঠারো শ' বছরেরও আগে। গ্রীসের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি ভূগোল বিষয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে পৃথিবীর একটি মানচিত্র তৈরি করেন — গ্রীক এবং তাদের প্রতিবেশীরা পৃথিবীকে যা ভাবত সেই পৃথিবীর মানচিত্র।

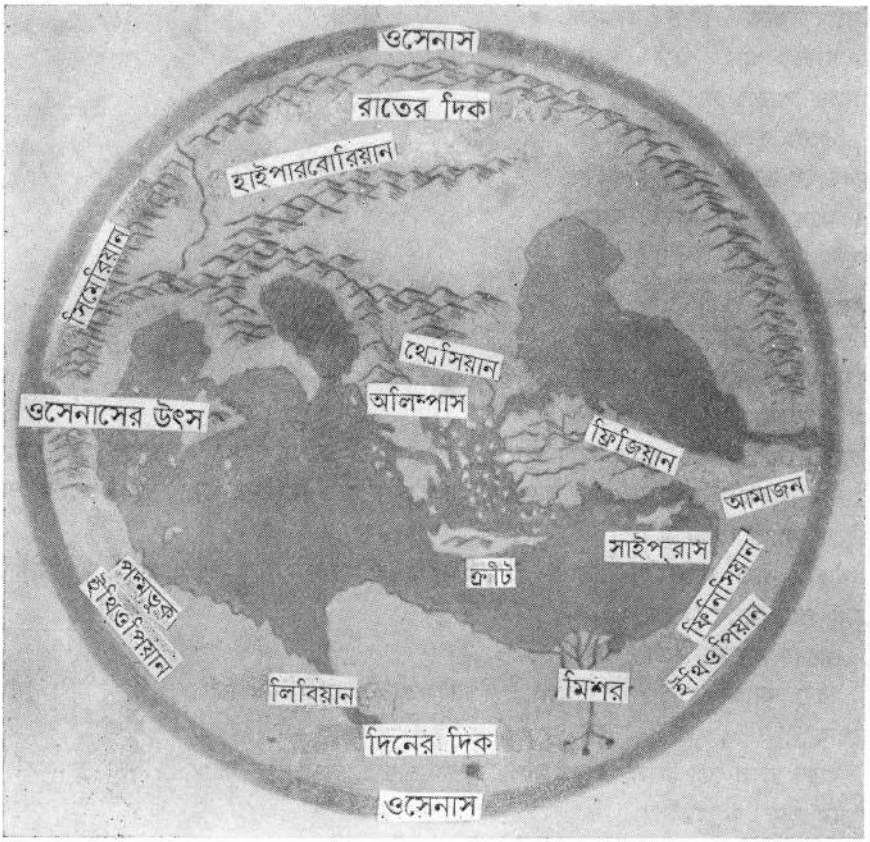
মানচিত্রে আছে ইউরোপের সমস্তটা (উত্তরাংশ বাদে), উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেকখানি।

টলেমি সঠিক ধরেছিলেন যে পৃথিবী একটি গোলক, এর চারপাশে মহাশূন্য।

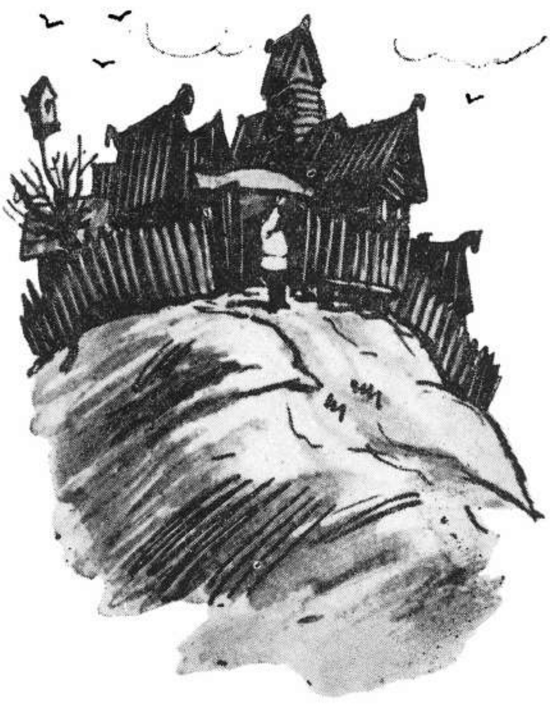
শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজের কথা লোকে ভুলে গেল, হারিয়ে গেল তাঁদের লেখা; আবার লোকে ভাবতে শুরু করল যে পৃথিবী চেপ্টা আর ধর্মভাবাপন্ন ভূগোলবিদরা মৃত সন্তদের স্থান হিসেবে স্বর্গ বসালো

মানচিত্রে। স্বর্গ জায়গাটা তারা নির্দিষ্ট করল এশিয়া মাইনরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে।

পনেরো শতকের শেষার্ধে সমুদ্রপথে দীর্ঘ যাত্রা শুরু হল লোকের। প্রথম সব সমুদ্রযাত্রীদের শুনতে হল যে তাদের সমস্ত পরিকল্প পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। জোর দিয়ে তাদের বোঝানো হল যে পৃথিবী চেপ্টা, ওসেনাস নদী পৃথিবীর প্রান্তদেশ ঘিরে বিরাট একটা জলপ্রপাতে পড়েছে অতল গহ্বরে। পৃথিবীর প্রান্তদেশে পৌঁছলে জাহাজ সে গহ্বরে পড়ে বিনষ্ট হবে।



হোমারের ধারণায় পৃথিবীর মানচিত্র।



কিন্তু তখনো এমন সব পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা প্রাচীন টলেমির মতো বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী বলের মতো গোল, প্লেটের মতো চেপ্টা নয়।

দূরযাত্রার বিরোধিতা যারা করত তারা বলত, 'বেশ, মেনে নিলাম যে পৃথিবী গোল। কিন্তু ওপর থেকে নিচে নামলে জাহাজটা আর উঠে ফিরে আসতে পারবে না!'

এদের ভুলটা কোথায়? এরা ভাবত যে তারাই যেন পৃথিবীর একেবারে চূড়ায় আছে, আছে একটা পাহাড়ের উপরে।

ছোট একটা গল্প বলি।

একদা ঊর্ধ্ব পৃথিবীর গ্রামে থাকত দুই বন্ধু, তাদের নাম ঘরকুনো আর যাত্রী। ঘরকুনো অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আছে কিন্তু বিচিত্র দেশের সফরে বেরোবে যাত্রী, তার ইচ্ছে পৃথিবীকে চক্কর দেওয়া। ঘরকুনো সাংঘাতিক সব বিপদের কথা তুলে বন্ধুকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করল।

'তুমি যাচ্ছ পৃথিবীর তলাকার জায়গায়,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ঘরকুনো, 'সেখান থেকে পড়ে যাবে আকাশে।'

যাত্রীর বুকের পাটা ছিল।

'তবু যাচ্ছি, ভাই,' সে বলল। 'তিন বছরের মধ্যে না ফিরলে ধরে নিও মরে গিয়েছি...'

যাত্রী চলল তো চলল, কতো সহর, কতো দেশ পেরোল; সে বরাবর চলল এক দিকে। যেখানে যায় সেখানেই পায়ের নিচে মাটি, মাথার উপরে আকাশ। হয়ত পৃথিবী থেকে আকাশে পড়ে গেলে তার ভালোই লাগত। কিন্তু আকাশে কী করে পড়া যায়? সর্বদা তো সেটা মাথার উপরে।

'আমরা কী বোকা,' যাত্রী ভাবল, 'আমাদের ছোট্ট গ্রামটার নাম দিয়েছি ঊর্ধ্ব পৃথিবী। এখন তো মনে হচ্ছে সব জায়গাই হল পৃথিবীর ওপরদিকে। ঘরকুনোকে কথাটা জানালে অবাক হয়ে যাবে সে।'

দেড় বছর কেটে যাবার পর যাত্রী হিসেব করল যে এত দিনে পৃথিবীর বিপরীত দিকে এসে পড়েছে।

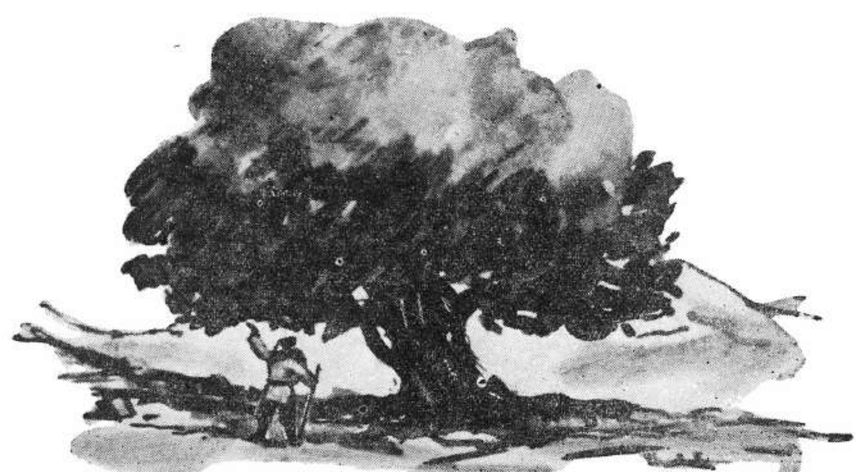
'খাসা ব্যাপার,' বলে উঠল সে। 'ঘরকুনো আর আমার পা এখন মুখোমুখি আর দুজনের মাথা উল্টোদিকে।' ঘরকুনোর সঙ্গে তর্কে জিতেছে বলে সে এত খুশি যে আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল আর বাড়ি পৌঁছল তিন মাস আগে।

ঘরকুনো বরাবর অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে যাত্রী যে পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-দিকে তাকিয়েছিল বিষণ্নমুখে। প্রথম প্রথম বন্ধু ফিরে আসার ভরসা ছিল, কিন্তু পরে সব আশা উবে যায়।

'জানতাম ও পৃথিবী থেকে পড়ে যাবে,' প্রতি দিন বিষণ্নভাবে সে বলত।

কিন্তু যাত্রী ঘরে ফিরে এল নিরাপদে, সুস্থ দেহে, খোশ মেজাজে। যে রাস্তা ধরে তার যাত্রা শুরু তার অন্য মোড় ধরে ফিরে এল।

তখন ঘরকুনোর বিশ্বাস হল যে পৃথিবী গোল, লোকেরা পা মুখোমুখি আর উল্টো দিকে মাথা রেখে বাঁচতে পারে। গ্রামের নাম বদলানো হল — ঊর্ধ্ব পৃথিবী নয়, সাধারণ গ্রাম।



এ গল্পের কোনটা সত্যি আর কোনটা কল্পনাপ্রসূত?

এটা সত্যি যে পৃথিবী গোল, পূর্বদিকে সরাসরি সোজা চলতে থাকলে যাত্রা শুরুর জায়গায় ফিরে আসবে, কিন্তু আসবে পশ্চিম থেকে।

এটা সত্যি যে পুরোনো দিনে অনেকে ভাবত তারা আছে পৃথিবীর 'ঊর্ধ্বাংশে', 'তলাকার অংশে' গেলে বিপদের সীমা থাকবে না।

ল্যাকটানটিয়াস নামের একটি লেখক একদা লেখেন:

'মাথা নিচের দিকে আর পা উপরে রেখে লোকে হাঁটে, আমাদের পৃথিবীর সব কিছু শূন্য থেকে লম্বমান, সে-দেশে ঘাস আর গাছ গজায় নিচের দিকে, বৃষ্টি আর শিলা পড়ে উপর দিকে, এটা ভাবার মতো অপ্রকৃতিস্থমনা কেউ থাকা সম্ভব?'

বিশ্রামের সময় পড়ার জন্য ল্যাকটানটিয়াসের বই ঝোলাতে নিয়ে বেরোলে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে পেণছিয়ে আমাদের যাত্রী লেখকপ্রবরকে নিয়ে বেশ একচোট হেসে নিতে পারত। ল্যাকটানটিয়াস লেখক ছিলেন বটে, কিন্তু অজ্ঞ জনের নির্বোধ সব ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

আমাদের যাত্রী হয়ত বলত:

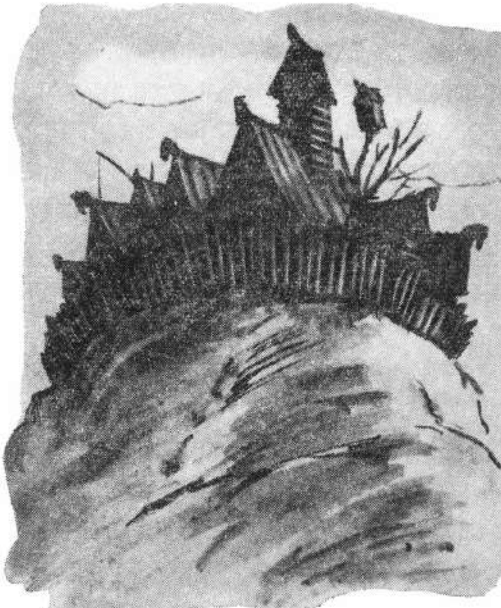
'ল্যাকটানটিয়াসের উচিত নিজে ঘুরে বেড়ানো। তাহলে এ সব ছাইভস্ম তিনি লিখতেন না। ঘরকুনো আর আমি পৃথিবীর এ-দিকে ও-দিকে আছি, কিন্তু দুজনার মাথাই উপরে আর পা মাটিতে। এখানকার আর ওখানকার গাছ বাড়ে একই ভাবে: শেকড় মাটিতে, গুঁড়ি আর ডালপালা ওপর দিকে। বৃষ্টি আর শিলা মেঘ থেকে পড়ে নিচে।



ভেবে দেখলে বোঝা যায় এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। পৃথিবী গোল বলে সমস্ত লোকেই থাকে একই ভঙ্গীতে, ফুটির ওপরে পিঁপড়ের মতো।'

এ গল্পের মধ্যে কোনটা কল্পনাপ্রসূত?

একটা জিনিস মাত্র: যে-ভাবে যাত্রী ভ্রমণ করে সেটা। পৃথিবীকে ঘুরে প্রথম যাত্রাগুলি ঘটে সমুদ্রপথে, আমাদের যাত্রীর ভ্রমণের মতো সহজ ছিল না সেগুলি।



পৃথিবীকে প্রথম চক্কর দেওয়াটা ঘটে কী ভাবে সে কথা বলব একটু পরে। কিন্তু তার আগে ইতিহাসের কয়েকটা পাতা ওলটানো যাক। তমসার সঙ্গে জ্ঞানের মহাযুদ্ধ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বীর আর শহীদ যাঁরা সত্যের সন্ধানে এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচারে সর্বপ্রয়াস করেন, এমন কি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জনে কুণ্ঠা করেননি, শোনা যাক তাঁদের কথা।

ফায়েটনের গল্প

প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ছিল যে বিশ্ব অত্যন্ত ছোট। আকাশ পৃথিবীর খুব কাছে। বিশ্বের বিষয়ে নিচের গল্পটা তারা চালু করে।

দেবতারা হলেন বিশ্বের শাসক। এঁদের পিতা ও অধিকর্তা হলেন বজ্রধারী জিউস, তিনি বিদ্যুৎ পাঠান পৃথিবীতে। সূর্যদেবকে গ্রীকরা হিলিয়স বলে ডাকত (রোমানরা বলত এ্যাপোলো)। প্রতিদিন সকালে পূর্বদিকে হিলিয়স তাঁর হৃষ্টপুষ্ট, জিরিয়ে-নেওয়া ফিটফাট সূর্যঘোড়ায় চেপে দেখা দেন, ঘোড়াগুলো রাত্রি কাটায় মাটির নিচে। সূর্যঘোড়ার দীপ্ত রথে হিলিয়স আকাশপথে প্রতিদিন তাঁর যাত্রা সাঙ্গ করে সন্ধেবেলায় চলে যান মাটির নিচে, ঘোড়াগুলো যাতে জিরোতে পারে।

বাপের রথে আকাশ ভ্রমণের বেজায় সখ নবীন ফায়েটনের। অনেক দিন হিলিয়স মত দেননি, পরে কিন্তু রাজী হলেন। উত্তেজিত ফায়েটন ঝকঝকে রথে উঠে ঘোড়ার লাগাম টেনে আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে রওনা হলেন।

বৃশ্চিক নামের নক্ষত্র গোষ্ঠীকে পেরিয়ে যেতে হল ফায়েটনকে। বৃশ্চিক রাক্ষসটির চেহারা এত ভয়ঙ্কর যে ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দৌড়ল। আগুনের মতো তেজী ঘোড়াগুলোকে সামলাবার শক্তি ছিল না কিশোরের, ভীষণ একটি দুর্ঘটনা ঘটল; সূর্যরথ ঠিক পথ ছেড়ে পৃথিবীর কাছে চলে এল। রথের সর্বদিক থেকে ঝকঝকে তপ্ত রশ্মি ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে পুড়িয়ে দিল পৃথিবীর সবকিছু। ধূলিসাৎ হয়ে গেল সহর গ্রাম, বনে আর মাঠঘাসে আগুন ধরে গেল ...

জ্বলন্ত ঘরবাড়ি থেকে আতঙ্কে লোকজন পালিয়ে ভীষণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানাল জিউসকে, মহাদিদেবকে। কিন্তু অগ্নিদীপ্ত রথকে থামানো যায় কী করে? ক্ষিপ্রগতি সূর্যঘোড়াগুলোকে ধরবে কে?

ফায়েটনের দিকে বজ্র নিক্ষেপ করলেন জিউস, রথ থেকে পড়ে গেল মৃত কিশোর। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো। দৌড়িয়ে গিয়ে হিলিয়স রথকে ঠিক পথে নিয়ে এলেন। থেমে গেল পৃথিবীর অগ্নিকাণ্ড।



রাক্ষস, অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডলসমূহ পরিবেষ্টিত বেপরোয়া নবীন ফায়েটন সূর্যরথ চালাচ্ছেন আকাশে।

ভয় কাটিয়ে লোকে যখন তাকাল আকাশের দিকে তখন সূর্য নিজের জায়গায় এসেছেন। প্রাণরক্ষা করেছেন জিউস, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পশুমেধের তাড়াহুড়ো পড়ে গেল ...

এমন কি সুদূর সেই কালেও সবাই এ-সব গল্প বিশ্বাস করত না।

পিথাগোরাস নামে একজন মহাপণ্ডিত থাকতেন আড়াই হাজার বছর আগে। তিনি বলেন, পৃথিবী বলের মতো, তার উপর নিচ নেই।

পিথাগোরাসের দু শ' বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিস্টটল চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহের গতির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সূর্য, গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু তারা চলে কীসে, কী ভাবে থাকে শূন্যে, এটা নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন।

অনেক ভেবে চিন্তে একটা সমাধানে এ্যারিস্টটল এলেন: পৃথিবীর উপরে আটটি কঠিন এবং স্বচ্ছ মণ্ডল আছে। সবচেয়ে কাছেরটি হল চন্দ্র মণ্ডল, এটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, চাঁদ এটিতে নিবদ্ধ। এরপর হল বুধ, তারপর শুক্র। এদের পর অন্যান্য মণ্ডল বা সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনির খ-গোলক। তাঁর ধারণায় তারকাগুলি অষ্টম মণ্ডলে নিবদ্ধ।

এ্যারিস্টটলীয় দর্শন নামে পরিচিত এই তত্ত্ব উদ্ভাবনের পর এ্যারিস্টটল ভাবলেন এই আটটি খ-গোলক ঘোরে কীসে? মাউণ্ট ওলিম্পাস বাসী সূর্যদেবতা হিলিয়স প্রমুখ দেবতাদের বিষয়ে অজ্ঞ পুরোহিতদের নানা কাহিনীতে বিশ্বাস করতেন না মহাপণ্ডিতটি।

পাল-তোলা জাহাজকে চালায় বায়ুশক্তি; মানুষ চলে নিজের পেশী বলে; গাড়ি টানে ঘোড়া, ঘোড়াও চলে পেশী বলে। এ্যারিস্টটল ঠিক করলেন নবম একটি মণ্ডল নিশ্চয়ই আছে, অন্য লোকগুলিকে চালাবার মোটর গোছের একটি মণ্ডল। এর নাম তিনি দিলেন 'প্রাথমিক চালিকা শক্তি'।

এ্যারিস্টটলীয় দর্শন নিয়ে হাসাহাসি করা অন্যায় — সে কালে এর উপকারিতা ছিল — বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে দেবগণ বিতাড়িত হলেন এর ফলে, ধ্বংস হল ধর্মীয় কুসংস্কার।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না পুরোহিতদের। এ্যারিস্টটলকে সক্রোধে আক্রমণ করল তারা।

'আগুনের মতো তেজী ঘোড়াগুলিকে যে হিলিয়স চালান আকাশপথে তাঁর স্বর্ণরথ হল সূর্য, এ কথা এ্যারিস্টটল বলে না, বলে সূর্য হল একটা জ্যোতিষ্ক — আপনা থেকে পৃথিবীকে চক্কর দেয়। এ্যারিস্টটল ভগবানে বিশ্বাস করে না, ও হল দেবতাদের শত্রু, ওকে শাস্তি দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।'

তাদের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে এ্যারিস্টটল স্বদেশ ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁর মৃত্যু ঘটে বিদেশে।

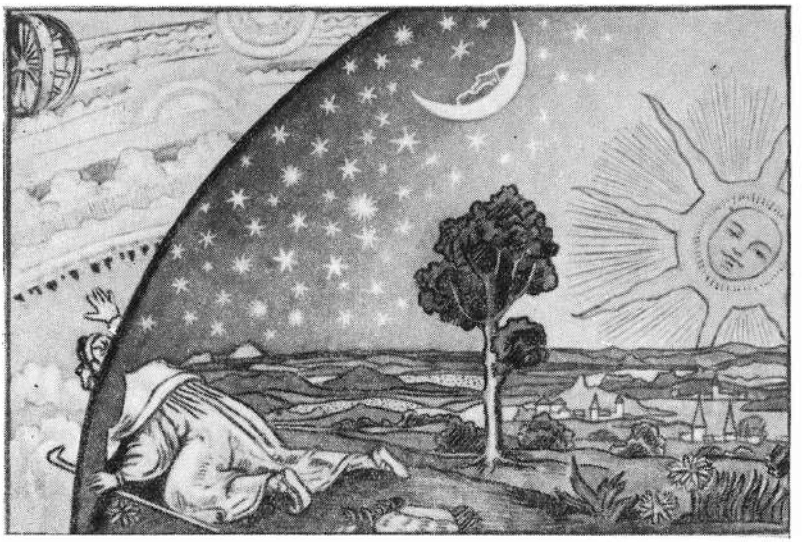
টলেমি ও তাঁর বিশ্বতত্ত্ব

তোমরা জানো যে পুরাকালে আকাশকে লোকে ভাবত একটা কঠিন স্বচ্ছ স্ফটিক পাত্র বলে। সে পাত্রে হাতুড়ি দিয়ে গাঁথা পেরেকের জ্বলজ্বলে মাথার মতো সমস্ত নক্ষত্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। ধারণা ছিল যে নক্ষত্রগুলি এক জায়গায় আবদ্ধ, তাদের নিজেদের গতি নেই। পরে দেখব এ ধারণাটা ঠিক নয়।

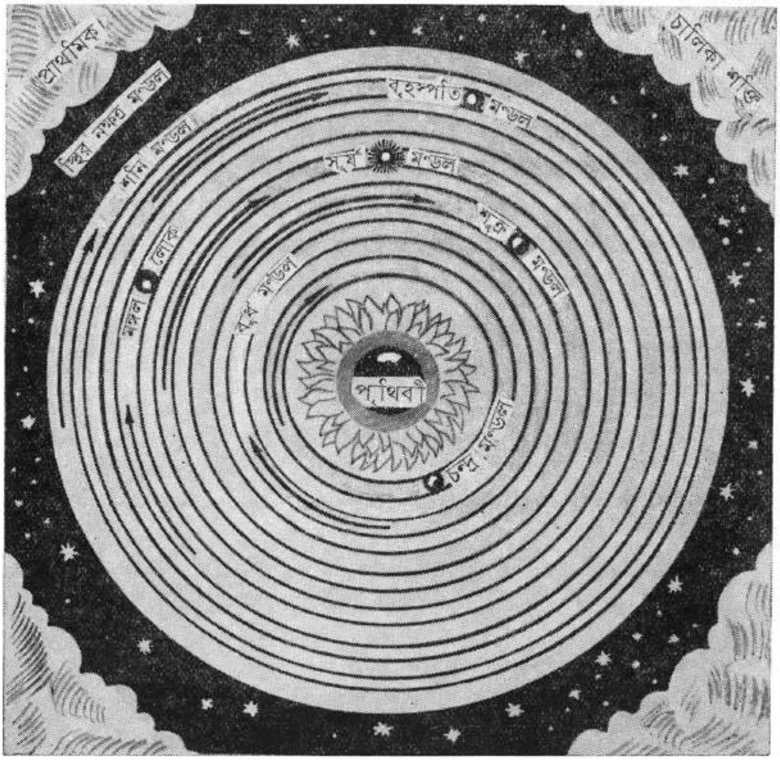
কিন্তু আকাশে যারা নজর রাখে তারা দেখত নক্ষত্রের মধ্যে চলমান দেহ, কয়েকটির দ্রুতগতি, কয়েকটির মন্থর যাত্রা। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন: আকাশপথে যাত্রায় দেহগুলি প্রথমে যায় একদিকে, তারপর ঘুরে চলে উল্টো দিকে, বিপরীত পথে।

পেরেকের ঝকঝকে মাথাগুলোর মধ্যে যেন গুড়ি গুড়ি চলেছে কয়েকটা জোনাকি; আকাশের একদিকে প্রথমে, তারপর অন্যদিকে তাদের আবির্ভাব। তাই তাদের গ্রীকরা বলত 'প্ল্যানেট' যার অর্থ 'ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র'।

আজ যে-সব আকাশদেহ নিজের আলো নয়, সূর্যালোক ছড়ায় তাদের 'গ্রহ' বলি



কয়েক শ' বছর আগেকার ড্রয়িং। পৃথিবীকে ঘেরা চাঁদোয়ায় যাত্রী পৌঁছিয়ে একটা ফাঁক পেয়েছে, সেখান থেকে এ্যারিস্টটলের স্ফটিক মণ্ডলগুলির তারিফ করছে।



এ্যারিস্টটলের বিশ্বদর্শন: গ্রহগুলি স্ফটিক মণ্ডলে নিবদ্ধ।

আমরা। হঠাৎ যদি সূর্য বিদায় নেয় তাহলে চাঁদ শুক্র মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহ আর জ্বলবে না।

নক্ষত্রগুলি নিজের আলোয় ভাস্বর। আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র হল সূর্য, সূর্য আমাদের আলো আর তাপ জোগায়, তাতে সম্ভব হয় জীবনযাত্রা। আগেকার দিনে ভুল করে সূর্যকে গ্রহ বলা হত।

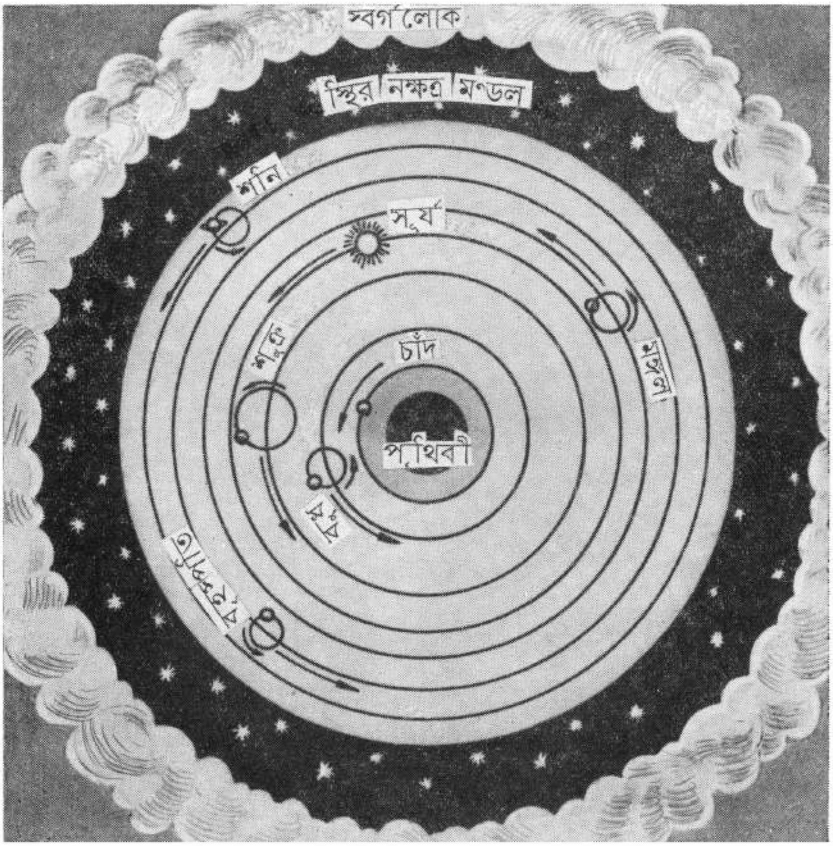
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনের কী ব্যাখ্যা এ্যারিস্টটল দেন তা আগেই বলেছি। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ শ' বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত টলেমি নতুন একটি বিশ্বতত্ত্ব গড়ে তোলেন।

এ্যারিস্টটলের স্ফটিক লোকে টলেমি বিশ্বাস করতেন না। তিনি ভাবতেন যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

টলেমীয় দর্শন এত জটিল যে টলেমি নিজে না বলে পারেননি: 'গ্রহগুলি কী করে চলে তা বোঝাবার চেয়ে আমার পক্ষে গ্রহগুলি চালানো আরো সহজ।'

তাঁর দর্শনের দৌলতে কিন্তু আকাশে গ্রহগুলির গতির বিষয়ে আগে থেকে বলা সম্ভব হল। তাঁর ধারণা ভ্রান্ত হলেও নিজের কালে টলেমি ছিলেন মহা জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁর দর্শন এ্যারিস্টটলের দর্শনের চেয়ে অনেক অগ্রসর।

পরবর্তী কালে টলেমীয় দর্শনকে সত্য বলে স্বীকার করে খৃষ্টীয় চার্চ, তাঁর ধারণায় সন্দেহ করাটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।



টলেমির বিশ্বদর্শন: শূন্যে মহাকাশে গ্রহের চক্রপাক।

স্বাধীন চিন্তার শত্রু ছিল খৃষ্টধর্ম। বিজ্ঞানের বিপক্ষতা করত খৃষ্টীয় বিশপ ও পাদরীরা। তাদের কাছে বিজ্ঞানী এবং তাদের বই দুই-ই পরম শত্রু।

টলেমি থাকতেন যে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে সেখানে তাঁর মৃত্যুর দু শ' বছর পরে একটা ব্যাপার ঘটে। প্রাচীন কালের সবচেয়ে বড়ো লাইব্রেরি ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। চার লক্ষের বেশি, সবকটি হাতে লেখা। এমন কি আজকের দিনেও এ-রকম একটা গ্রন্থসংগ্রহকে বড়ো লাইব্রেরি মনে করা হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রাচীন কালের পণ্ডিতদের লেখা বই ছিল লাইব্রেরিতে। দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিতরা আসতেন পড়তে।

৩৯১ সালে বিশপ থিওফিলাস-এর উসকানিতে একদল খৃশ্চান আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয় লাইব্রেরিটা। মহামূল্যে সব জিনিস বিলুপ্ত হল। সোনা বা হীরের চেয়ে দামি ছিল পুঁথিগুলো, ওগুলো তো আর ফিরিয়ে দেওয়া চলে না।

প্রায় বিশ বছর পরে উন্মত্ত জনতা প্রাচীন জগতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মহিলাকে, হাইপেসিয়াকে ছিন্নভিন্ন করে। হাইপেসিয়া ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের প্রথম শিক্ষিকা। সত্যসন্ধানী হাইপেসিয়া খৃষ্টীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়লাভ চাইতেন, তাই বিশপ সিরিল তাঁর কাছে পাঠালেন খুনেদের...

এ ভাবে বিজ্ঞানীদের শিক্ষা দিত চার্চ।

টলেমীয় দর্শন কেন চার্চের সমর্থন পায়?

তার কারণ বাইবেল-কথিত সৃষ্টি কাহিনীর সঙ্গে অনেক মিল আছে এ দর্শনের; একটা জিনিস শুধু অপছন্দ ছিল পাদরীদের — সেটা হল গোলাকার পৃথিবী। তারা ধর্মভীরুদের বলে, পৃথিবী যে চেপ্টা সেটা মানতে হবে।

খৃষ্টীয় তত্ত্ব বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর শুরুতে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি করেন, পৃথিবীর কোনো রূপ ছিল না, ছিল মহাশূন্য। তারপর ঈশ্বর অন্ধকার থেকে বিভিন্ন করলেন আলোককে। পৃথিবী তাই শুরু থেকে বিশ্বের কেন্দ্রে, টলেমীয় দর্শনে যেমন।

দ্বিতীয় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আকাশমণ্ডল, নাম দিলেন তার স্বর্গ আর এই নিরেট স্বর্গ বা আকাশমণ্ডল উপরের জলকে আলাদা করল নিচের জল থেকে। উপরের জল, স্বর্গীয় জল যা পৃথিবীতে পড়ে তা হল বৃষ্টি। প্রাচীন কালে লোকে ভাবত যে স্বর্গলোকের কোথাও এ জল জমে, তারপর ছোট ছোট গর্তের মধ্য দিয়ে পড়ে পৃথিবীতে।

তৃতীয় দিনে জল থেকে শুকনো ডাঙাকে আলাদা করে গাছপালা গজাবার হুকুম দিলেন ঈশ্বর।

শুধু চতুর্থ দিনে ঈশ্বর 'পৃথিবীকে আলো দেবার জন্য' সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন।

পঞ্চম দিনে তিনি সৃষ্টি করলেন সরীসৃপ, মাছ আর পাখি আর ষষ্ঠ দিনে পশু ও মানুষ।

বাইবেলের কাহিনীটিতে কত যে উলটোপালটা কথা আছে পড়লে অবাক লাগে। সবকটি আলোচনার যোগ্যও নয়। শুধু একটা প্রশ্ন করা যাক: প্রথম দিনে দেখা দিল আলো আর চতুর্থ দিনে সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলি — তাহলে আলো এল কোথা থেকে? তাছাড়া, সূর্য নেই, চাঁদ নেই, প্রথম তিনটে দিন তাহলে কী করে গোনা হল?

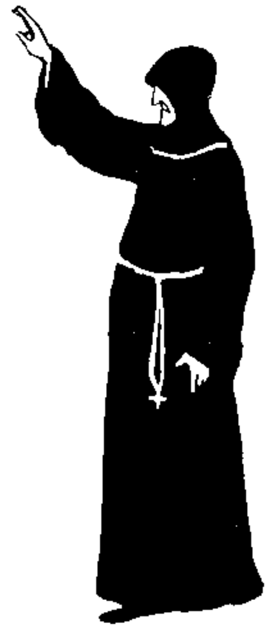


এ সব উলটোপালটা জিনিসে চার্চের লোকেরা নজর দেয়নি। তারা বলে: 'যীশু খৃষ্টের পর আর কোনো বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই!' চার্চের কর্তারা টলেমির ধ্যানধারণা গ্রহণ করল, তার কারণ বাইবেল-কাহিনীর খুব বিরোধিতা এগুলো করেনি। টলেমির নীতি ভুল প্রমাণিত যখন হল তখনো চার্চের মহোদয়গণ সেটা আঁকড়ে ধরে থাকে, আর অবিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন চালায়।

চার্চগুরুরা চেলাদের শিক্ষা দেয় যে পৃথিবীর গভীর জঠরে নরক নামের একটা জায়গা আছে যেখানে পাপীদের ভয়ানক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আর দেবদূত আর মুনি ঋষিদের আবাস স্বর্গ, এ্যারিস্টটল কথিত 'প্রাথমিক চালিকা শক্তি'র জায়গায় অবস্থিত।

দেবদূতদের একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া হল স্বর্গে। পাদরীরা বলল দেবদূতরাই গ্রহ চালায়। পোনেরো শতকে জি. ফণ্টানা-র লেখা একটা বইয়ের এমন কি নাম দেওয়া হল:

'পৃথিবীতে প্রাকৃতিক জিনিস এবং গ্রহচালক দেবদূতদের বিষয়ক গ্রন্থ।'



একটা বিষয়ে শুধু চার্চের লোকেদের মতান্তর ছিল: দেবদূতরা গ্রহ চালায় কী করে?

কয়েকজন বলল: 'চাষী যেমন শস্যের থলে নিয়ে যায় কারখানায় ঠিক তেমন ভাবে দেবদূতরা পিঠে বহন করে ভাস্বর গোলকগুলিকে।'

অন্যরা বলল: 'না! কুলিরা মদের পিপে যেমন করে সেলারে গড়িয়ে দেয় ঠিক তেমন ভাবে দেবদূতরা ভাস্বর গোলকগুলিকে গড়ায়।'

আর একদল বলল: 'দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়। গাড়িতে জোতা ঘোড়ার মতো দেবদূতরা গোলকগুলোকে টানে।'

পণ্ডিত ব্রহ্মচারী রিচোলি নক্ষত্র এবং গ্রহদের ভালো করে দেখে লেখেন: 'নক্ষত্র চালাবার সময়ে সঙ্গীরা কী করছে তার উপর নজর রেখে দেবদূতরা ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে গ্রহকে রাখে নির্দিষ্ট একটা পথে।'

চার্চ শেখাল যে মেঘকে তৈয়ার রাখে দেবদূতরা বৃষ্টি আর বরফ পাঠানোর জন্য, আবহাওয়ার ভার তাদের হাতে, গরম আর ঠাণ্ডা ছড়ায় তারা।

টলেমির দর্শনে লোকে বিশ্বাস করে চৌদ্দ শ' বছর। পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের গোড়ায় কলম্বাস, মাগেল্লান প্রমুখের মতো মহা অভিযাত্রীরা সমুদ্র পথে যে-সব সুদীর্ঘ যাত্রা করেন তার ফলে তখনকার দিনে জানা পৃথিবীর সীমা অনেক বেড়ে গেল।

ক্রিস্টফার কলম্বাস এবং তাঁর আবিষ্কার

ক্রিস্টফার কলম্বাস ইতালির লোক, তাঁর জন্ম জেনোয়া সহরে কিন্তু তাঁর কৈশোর কাটে পর্তুগালে, পর্তুগীজ নাবিকদের সঙ্গে দূর যাত্রায় তিনি যান। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই সুদক্ষ নাবিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রটে। এই বয়সে ভারত ও চীনে সমুদ্রযাত্রার সংকল্প প্রথমে জাগে তাঁর মনে।

এ দুটি সমৃদ্ধ দেশে স্থলপথে যাত্রা সুদীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ছিল, বরাবর পূর্বাভিমুখী যেতে হত। পৃথিবী যে গোলাকার এ ধারণা তখন বেশ জোরদার, তাই কলম্বাসের মনে হল যে পশ্চিমে পাড়ি দিলেও ভারত ও চীনে পৌঁছনো যাবে।

তিনি জানতেন না যে তাঁর পথ আটকাবে আমেরিকার বিরাট মহাদেশ। এও তিনি জানতেন না যে সমুদ্রপথে চীন অনেক দূর, যদিও স্থলপথে যাত্রার চেয়ে সমুদ্রযাত্রা সহজ। সত্যি বলতে পৃথিবীর আয়তন তখনকার দিনে অজানা ছিল, লোকে যা ভাবত তার চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো ছিল পৃথিবী।

অভিযানের তোড়জোড়ের অনুমতিলাভে বিশেষ বেগ পেতে হল কলম্বাসকে। তাঁর ধারণায় বিশ্বাস করে এমন লোক ছিল না পর্তুগালে। সেখান থেকে তিনি যান প্রতিবেশী স্পেনে, কয়েক বছরের দুশ্চিন্তা ও প্রচেষ্টার পর তিনটে ছোট্ট জাহাজের ভার তাঁকে দেওয়া হল। ১৪৯২ সালের ৩রা আগস্টে পালস বন্দর থেকে তিনি যাত্রা করলেন এগুলিতে (স্প্যানিশ ভাষায় এদের বলত কারাভেলা)।

তিনটি জাহাজে — সান্টা মারিয়া, নিনিয়া ও পিন্টা — সবসুদ্ধ ছিল নব্বইটি অফিসার ও নাবিক। লোকবল কম, দীর্ঘ যাত্রা — কিছুতেই ডরালেন না এ্যাডমিরাল।

যাত্রা সফল হওয়াতে কলম্বাসের আত্মবিশ্বাস সার্থক হল। অনেক সপ্তাহ পরে গোচরে এল গুয়ানাহানি দ্বীপের সবুজ উপকূল। গুয়ানাহানি নামটা সেখানকার অধিবাসীদের দেওয়া, কিন্তু কলম্বাস নাম দিলেন 'সান সালভাদর' অর্থাৎ 'পূত পরিত্রাণকর্তা'।

দু সপ্তাহ পরে আবিষ্কৃত হল বৃহৎ দ্বীপ কিউবা এবং তারপর হাইটি।

কলম্বাসের দৃঢ় ধারণা হল যে তাঁর আবিষ্কৃত দ্বীপগুলি ভারতের অংশ — এ ধারণা নিয়ে তিনি ফিরলেন স্পেনে।

অনতিবিলম্বে ইউরোপীয়রা জানল যে নব-আবিষ্কৃত দ্বীপগুলি ভারত নয়, এদের পেছনে আছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা বিরাট একটি মহাদেশ। তবু কলম্বাসের দেওয়া নামগুলো রয়ে গেল, এদের বলা হত ওয়েস্ট ইন্ডিয়া আর আসল ভারতের নাম হল ইস্ট ইন্ডিয়া (বর্তমানে শুধু ভারত নামে পরিচিত)। ভারতের অধিবাসীরা হল ইন্ডিয়ান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেশজ বাসিন্দাদেরও ডাকা হয় ইন্ডিয়ান বলে; দুটো জায়গার মধ্যে সমুদ্রের বিরাট ব্যবধান, তবু কলম্বাসের ভুলের জন্য তাদের এই নাম দেওয়া হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ পেরিয়ে যে বিরাট মহাদেশ সেটি আবিষ্কৃত হয় মহানাবিক কলম্বাসের দৌলতে কিন্তু তার নাম রাখা হল অভিযাত্রী আমেরিগো ভেসপুচি-র নামে, ইনি নূতন পৃথিবীতে কয়েকবার পাড়ি দেন (আমেরিকাকে এখনো প্রায়ই নূতন পৃথিবী বলা হয়)। কিছু দিন পরে বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্রে কলম্বাস তাঁর নানা যাত্রার বর্ণনা দেন।

১৫০৬ সালে দরিদ্র, প্রায় বিস্মৃত কলম্বাস দেহ রাখেন।

কয়েক বছর পরে আর একটি মহা অভিযাত্রী, ফার্নান দ্য মাগেল্লান-এর নেতৃত্বে জাহাজের একটি স্কোয়াড্রন পৃথিবী পরিক্রমণ করে। এ যাত্রার বিষয়ে আরো কিছু তোমাদের বলব।

প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা

১৫১৯ সাল, ২০শে সেপ্টেম্বর। স্পেনের সেভিল বন্দর থেকে ছাড়ল পাঁচটি ছোট্ট জাহাজের একটি স্কোয়াড্রন।

জাহাজগুলির নাম সান আন্তনিও, ট্রিনিডাড, কনসেপসিয়ন, ভিক্তরিয়া ও সান্তিয়াগো। অফিসার এবং নাবিক মিলিয়ে সবসুদ্ধ যাত্রা করে ২৩৯ জন, ফেরে মাত্র কয়েকজন।

স্প্যানিশ স্কোয়াড্রনটির অধিনায়ক এ্যাডমিরাল মাগেল্লান। জন্মসূত্রে তিনি স্পেনের লোক নন, প্রতিবেশী পর্তুগাল থেকে আসেন তিনি।

যে কর্তব্যকর্ম ফার্নান দ্য মাগেল্লান নিজের সামনে রাখেন তা দুরূহ — সেটি হল আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার একটি পথ বের করা।

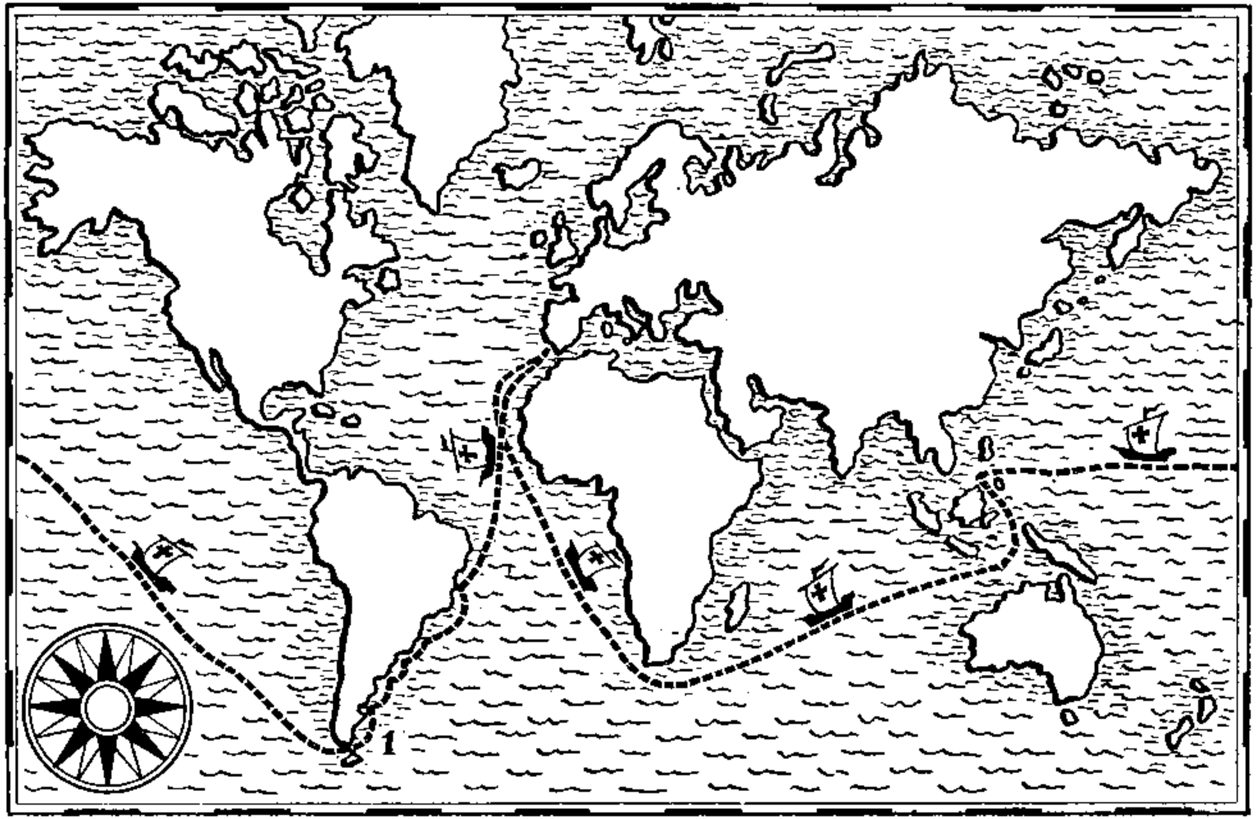
মানচিত্রে একবার চোখ বোলাও। দুটি মহাসমুদ্রের মাঝে বিরাট আমেরিকা মহাদেশ, সুমেরু মহাসমুদ্রের তুষারাবৃত জল থেকে কুমেরু সমুদ্র পর্যন্ত তার বিস্তার। সে-সময় আমেরিকার পশ্চিমবর্তী মহাসমুদ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নামকরণ করা হয় বৃহৎ দক্ষিণ সমুদ্র।

মাগেল্লানের আগেও সমুদ্রযাত্রীরা নতুন অজানা মহাসমুদ্রটিতে হানা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যেখানেই তাঁরা যান, ভূবিষুবরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে, তাঁদের পথ রোখে আমেরিকা মহাদেশ। প্রায় সবাই ভাবত যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র থেকে এই বৃহৎ দক্ষিণ সমুদ্রে যাওয়া অসম্ভব।

এ কথাটা মেনে নেননি মাগেল্লান। তাঁর সন্দেহ ছিল না যে দক্ষিণে কোথাও একটি প্রণালী দুটি মহাসমুদ্রকে যুক্ত করেছে। লোকবল এবং জাহাজ পেলে প্রণালীটি বের করার ভার তিনি নেবেন বলেন। নিজ দেশ পর্তুগালে জাহাজ ও লোকজন জোগাড়ের চেষ্টা বহু বছর করে তিনি ব্যর্থ হন। স্বদেশ ছেড়ে তাই যেতে হল স্পেনে। সেখানে তাঁকে বিশ্বাস করে এমন লোকের সন্ধান মিলল। তাঁকে দেওয়া হল একটি স্কোয়াড্রনের ভার।

অদৃষ্টপূর্ব এমন একটি যাত্রায় স্প্যানিশ অভিযানের নেতা এই ভাবে হলেন পর্তুগালের মাগেল্লান (পর্তুগীজ ভাষায় মাগেলহায়েনস)।

যাত্রা সফল হলে বিশাল সম্পদের অধিকারী হবেন মাগেল্লান: স্পেনের রাজার সঙ্গে একটি চুক্তি সর্তে নব-আবিষ্কৃত সমস্ত দেশের শাসকপদ তিনি পাবেন, আর পাবেন সে-সব



ম্যাগেল্লানের পৃথিবী পরিক্রমা।

দেশ থেকে পাওয়া লাভের বিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু উচ্চ পদ আর সম্ভাব্য সম্পদের জন্য বড়ো একটা দাম দিতে হয় তাঁকে: বিদেশীর অধীনে নিযুক্ত গর্বিত স্প্যানিশ ক্যাপ্টেন তাঁকে হিংসা করত, সুযোগ পেলে তাঁকে সাবাড় করার শপথ তারা গ্রহণ করে।

এমন কি যাত্রা শুরুর আগেই তাঁকে বাধা দেবার সমস্ত কিছু আয়োজন তারা করে। অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তারা জোগাল না, এমন কি তাঁর জান নেবার একটা চেষ্টা পর্যন্ত করা হল। তাঁকে ওরা দিল পুরোনো পচা কারাভেলা; তাঁর মাঝিমাল্লা হল নানা দেশের ভবঘুরে, স্বদেশে নানা অপরাধের দণ্ড এড়াবার জন্য পলাতক জার্মান, ইংরেজ ও ইতালীয়রা।

মাগেল্লান কিন্তু হার মানলেন না। সমস্ত অসুবিধা তিনি অতিক্রম করলেন। দু বছরের জন্য যথেষ্ট খাবার ও সরঞ্জাম কেনার মতো টাকার জোগাড় করলেন তিনি; জাহাজগুলিকে মেরামত করা হল, তালিম দেওয়া হল নাবিকদের।

সত্যি, সুদূর দেশে অভিযান চালাবার জন্য মাগেল্লানকে কেন নিয়োগ করা হয়?

মাগেল্লানের আশা ছিল তিনি সমস্ত সংশয়গ্রস্ত লোকের কাছে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করবেন যে পৃথিবী বলের মতো গোল। সে-সময় কিন্তু কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত পৃথিবীর আকার নিয়ে মাথা ঘামাতেন। রাজারাজড়া বা সওদাগরদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের একমাত্র চিন্তা — মাগেল্লানের অভিযান সফল হলে অঢেল মুনাফা পেটা যাবে।

তোমাদের হয়ত মজার মনে হবে, এমন কি বিদঘুটে ঠেকবে যদি কোন দোকানদারকে বলতে শোনো:

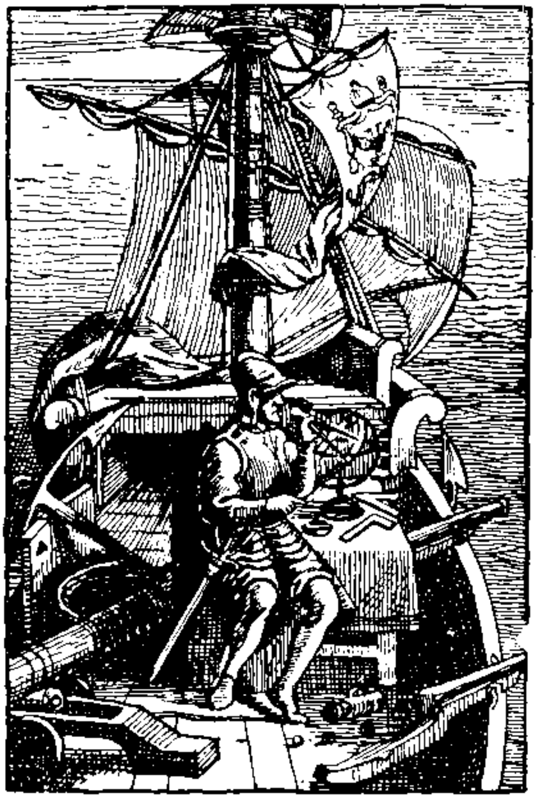
'ওহে যা কিনলে তার জন্য বিশটে গোলমরিচদানা পাওনা রইল।'

একসময় টাকা হিসেবে চল ছিল গোলমরিচের, তখন ধার শোধ করা হত, খাজনা দেওয়া হত গোলমরিচে, গোলমরিচ দিয়ে কেনা হত বাড়ি, খামার, জাহাজ।

এখনকার দিনে বড়োলোকদের বলা হয় 'টাকার থলে', কিন্তু আগেকার দিনে এদের নাম ছিল 'গোলমরিচের থলে'।

আর এই সব দিনে মাগেল্লান রওনা দিলেন তাঁর সুবিখ্যাত যাত্রায়। প্রাচ্যের মশলা, গোলমরিচ, দারুচিনি আর আদা লাগত বড়োলোকদের খানায়, খাদ্য হত ঝাঁঝালো আর রসালো, আর রসালো খাবার তো হজমি জিনিস। ওষুধ তৈরি-করিয়েদের অতি নিখুঁত নিক্তিতে মশলা ওজন করা হত, প্রত্যেকটি দানার মূল্য অনেক। প্রাচ্যের নানা ওষুধের, যেমন কর্পূরের বিশেষ সমাদর ছিল, অথচ যে-সব দেশে এগুলি জন্মাত অর্থাৎ ভারত এবং মলক্কাদ্বীপপুঞ্জে (মশলা দ্বীপপুঞ্জ) এরা বিকোত ইউরোপের যইশস্য বা মটরের দামে।

ইউরোপে তাহলে প্রাচ্যের মশলা আর ওষুধপত্তরের এত দাম ছিল কেন? কারণ, ইউরোপে পৌঁছবার পথ সুদীর্ঘ আর কঠিন; প্রাচ্য থেকে মশলা-আনা সওদাগরদের আসতে



পৃথিবী পরিক্রমণের কালে মাগেল্লান। চারিদিকে যন্ত্রপাতি নিয়ে জাহাজের গলুইতে তিনি উপবিষ্ট। যন্ত্রপাতিগুলি জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য (১৬ শতকের ড্রয়িং)।

হত ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে, সমুদ্রে জলদস্যু আর ডাঙায় ডাকাতদের হাতে জান যাবার ভয় ছিল তাদের, পথিমধ্যে নানা দেশের রাজাদের দিতে হত মোটা মাশুল। সুদূর প্রাচ্য থেকে ইউরোপে আসতে দু তিন বছর যেত কেটে — মার্কো পোলো আর আফানাসি নিকিতিনের কথা মনে আছে তো?

১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার পর প্রাচ্যে পেঁছিনো আরো কঠিন, বাস্তবিক পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই মালয়ে এক পিপে গোলমরিচের যা দাম তাই ইউরোপে দিতে হত এক চিমটি গোলমরিচের জন্য।

মাগেল্লানকে অভিযানে পাঠানোর সময় ধনী স্প্যানিশ সওদাগররা ভাবে যে তিনি মশলা দ্বীপপুঞ্জে অল্প সময়ে এবং নিরাপদে পেঁছিনোর একটা পথ বের করতে পারবেন। তাছাড়া তাদের আশা ছিল মলক্কা দ্বীপপুঞ্জকে কবলে আনার। শুধু এই কারণে তারা মাগেল্লানের অভিযানের জন্য পয়সা খরচ করে।

আমেরিকার উপকূল পর্যন্ত রোমাঞ্চকর কিছু ঘটল না। অবশ্য সান আন্তনিও, কনসেপসিয়ন এবং ভিক্তোরিয়ার ক্যাপ্টেনরা সর্বদা মাগেল্লানের বিরুদ্ধে ষড় চালিয়ে যায়, চেষ্টা করে বিভিন্ন জাতির লোকদের ক্ষেপিয়ে দেবার।

প্রধান অসুবিধে শুরু হল আমেরিকার উপকূলে এসে পড়ার পর। দুটো মহাসমুদ্রের

মাঝে একটা প্রণালী আছে বলে মাগেল্লান অনুমান করেছিলেন বটে, কিন্তু কোথায়, তা তিনি জানতেন না। এক একটা উপসাগরে তিনি ঢোকেন, এক একটা খাঁড়িতে — কোথায় সেই রহস্যময় প্রণালী যেটা ধরে তিনি যেতে পারেন?

এতে করে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হল। শীতকাল আসন্ন, দক্ষিণ গোলার্ধের সেই নিষ্ঠুর কঠিন শীতকাল আর দক্ষিণ মেরু সমুদ্রগুলির অভিমুখেই তো নাবিকেরা পাড়ি দিচ্ছে।

মাগেল্লান বুঝলেন যে শীতকালে যাত্রা চালিয়ে যাওয়া পাগলামি হবে, সমুদ্রের হিমশীতল বুকে শীতকালের করাল ঝড়ে মৃত্যু হবে সকলের। হাওয়া আসে না এমন একটা উপসাগরে নোঙর ফেলে রইল পাঁচটি জাহাজ; হাওয়া আসে না বটে, কিন্তু এমন একটা ধুধু নিঃসঙ্গ জায়গা পৃথিবীর বুকে আর বুঝি নেই। তটভূমি রিক্ত, গাছ বা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে না। এমন কি শীতের মুখে পাখিরা পর্যন্ত ভয়াল জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছে।

নাবিকদের মেজাজ তিরিক্ষি; খাবারের ভাগ এ্যাডমিরালের হুকুমে কমিয়ে দেওয়াতে তারা চটে ছিল — মাগেল্লানের আশঙ্কা খাবার না কমালে যাত্রা শুরু করার সময় কিছুই থাকবে না। নাবিকদের অসন্তোষকে আস্কারা দিয়ে স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনরা একটা বিদ্রোহ বাধাল। বিদ্রোহ দাবিয়ে পাণ্ডাদের শাস্তি দিলেন মাগেল্লান। এরপর খোলাখুলি ভাবে তাঁর বিরোধিতা করার দুঃসাহস কারো রইল না, তবে তাঁর প্রতি স্প্যানিশ অফিসারদের বিদ্বেষ কমল না, তলায় তলায় তারা তাঁর শত্রুই রইল।

পাঁচটি বিরস মাস কাটল শীতের আস্তানায়। তারপর জাহাজগুলো আবার চলল দক্ষিণমুখো, সেই রহস্যময় প্রণালীর খোঁজে।

শীত শেষ কিন্তু স্কোয়াড্রনের দুর্ভোগের শেষ নেই। একটা খাঁড়ির তল্লাসে গিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগামী যে জাহাজ সেই সান্তিয়াগো নষ্ট হল। ঝড়ে তটে ধাক্কা লেগে ভেঙে গেল জাহাজটা। নাবিকদের উদ্ধার করে অন্য জাহাজগুলিতে ভাগ করে দেওয়া হল, আবার যাত্রা শুরু। অবশেষে এল দীর্ঘ-প্রত্যাশিত জয়লাভের দিন! একটা উঁচু অন্তরীপ চক্কর দিয়ে সমুদ্রযাত্রীরা দেখল মহাদেশের গভীরে ঢুকেছে অন্ধকার বিষণ্ণ একটি প্রণালী — বিক্ষুব্ধ জলরাশি, প্রবল বাত্যা।

খোঁজখবরের জন্য দুটো জাহাজ পাঠালেন মাগেল্লান। কয়েক দিন পরে ফিরল জাহাজগুলি, কামানের শব্দে সালিউট জানিয়ে, মাস্তুল পতাকায় সাজিয়ে; নাবিকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। সেই মহান আবিষ্কার ঘটেছে, পাওয়া গিয়েছে সেই রহস্যময় প্রণালী!

মাগেল্লান আনন্দে উদ্বেল। তাহলে তাদের মহাশ্রম ও নানা কষ্ট বৃথায় যায়নি, সমস্ত বাধাবিঘ্ন সার্থক হয়েছে, অবাধ্য স্প্যানিয়ার্ডদের শাস্তিদান নিরর্থক নয় তাহলে; তিনি যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই — প্রণালীটা আছে, সেটা ধরা পড়েছে তাঁর কাছে!

মহান আবিষ্কারকের সম্মানার্থে পরে প্রণালীটির নাম দেওয়া হল মাগেল্লান প্রণালী। দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রে এখনো নামটা বর্তমান।

বাকি চারটে জাহাজ সাবধানে এবং মন্থর গতিতে চলতে লাগল আবার।

নব-আবিষ্কৃত প্রণালীটি ধরে পুরো এক মাস ধরে চলল যাত্রা। অবশেষে ইউরোপীয়দের অজানা একটি মহাসমুদ্রে এসে পড়ল তারা। আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল মাগেল্লানের চোখ।

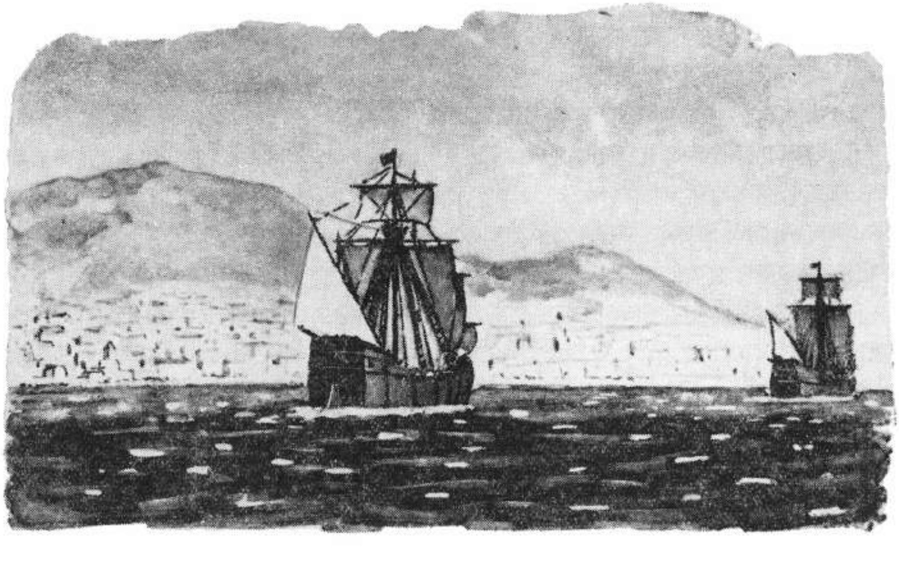
'পশ্চিম দিকে! পশ্চিম দিকে পুরো দমে চল মশলা দ্বীপপুঞ্জের দিকে!'

কিন্তু সাফল্যের একেবারে কাছে এসে আর একটি দুর্বিপাকের মুখোমুখি হলেন অদম্য সেই নাবিক: বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমস্ত যাত্রাটির প্রায় সর্বনাশ হতে চলে। সান আন্তনিও-র সহকারী ক্যাপ্টেন দলের মধ্যে বিদ্রোহ বাধিয়ে গোপনে স্পেনের দিকে নিয়ে চলল সান আন্তনিও-কে।

বড়ো কঠিন একটা ধাক্কা খেলেন মাগেল্লান: সবচেয়ে বড়ো জাহাজ সান আন্তনিও, খাবারের বেশির ভাগ তাতে, আর তাও সেরা খাবার, যেটা দীর্ঘতর যাত্রার জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

তিনটে মাত্র ছোট জাহাজ, খাবারের অবস্থা কাহিল, মাগেল্লান কী করলেন তখন?

সুদৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমরা যাত্রা চালিয়ে যাব, জাহাজের রশারশির চামড়ার বাঁধন খেতে হয় তাও সই!'



১৫২০ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনটে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের ঊষর বিশাল জলরাশিতে পাড়ি দিল। এর আগে ইউরোপের কোনো জাহাজ এখানে আসেনি।

সে মহাসমুদ্র কতো বিশাল আগে জানলে সমুদ্রে বিধ্বস্ত, জীর্ণ, নড়বড়ে মাস্তুল আর ছেঁড়া পাল জাহাজগুলোকে নিয়ে মাগেল্লান পাড়ি দেবার চেষ্টা করতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি জানতেন না।

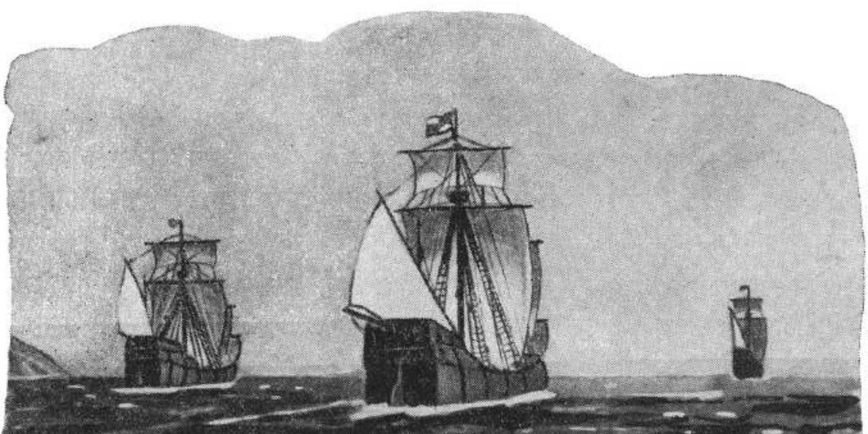
মাগেল্লানের সফরের আগে পৃথিবীর প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না লোকের। এ্যাডমিরাল ভেবেছিলেন যে তিন চার হাজার কিলোমিটার পরেই মশলা দ্বীপপুঞ্জে এসে পড়বেন। আসলে তাঁর এবং দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যেকার ব্যবধান ১৮ হাজার কিলোমিটার!

অপরূপ আবহাওয়ায় যাত্রীদের স্বাগত জানাল নতুন মহাসমুদ্র। নির্মেঘ আকাশ, দীর্ঘ কঠিন শীতে ভোগা নাবিকদের গা জুড়ালো তপ্ত সূর্য, ফুরফুরে হাওয়ায় জাহাজগুলি অবিরাম চলল পশ্চিম দিকে। শান্তিপূর্ণ সমুদ্রকে মাগেল্লান প্রশান্ত মহাসাগর নামে অভিহিত করলেন।

পরে দেখা গেল মহাসমুদ্রটি অত নিরীহ নয় মোটে। এত বিরাট সে সমুদ্র যে নাবিকেরা বলল এটি বিরাট মহাসমুদ্র — রুশ ভাষায় এখনো দুটো নামে সমুদ্রটি পরিচিত।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল, কিন্তু বাঞ্ছিত তটদেশের কোনো লক্ষণ নেই। কাটল এক মাস, আরো একটা মাস, তবু তিনটে ছোট জাহাজকে ঘিরে শুধু মহান রিক্ত মহাসমুদ্র।

জাহাজে ক্ষুধার তাড়না। দেখা গেল যে, অভিযানের জোগাড়যন্ত্রের সময়ে তাজা খাদ্যদ্রব্যের জায়গায় মাগেল্লানের শত্রুরা পচা জাহাজী বিস্কুটের বাক্স তার ঘাড়ে চাপিয়েছে।



আরো খারাপ ব্যাপার — ইঁদুরে বাক্সগুলো ফুটো করে খাবার সাবাড় করছে। নাবিকেরা ইঁদুর ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগল, এক একটা ইঁদুর ধরা পড়ে, খাবার মতো জিনিস বটে, নাবিকেরা গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে।

মদ শেষ হয়েছে অনেক দিন, পিপেতে রাখা টাটকা জল গিয়েছে টকে। সে জলের এমন দুর্গন্ধ যে ন্যক্কার আসে, লোকে খায় নাক টিপে।

মাগেল্লানের সেই বিরস ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল: জাহাজের রশিরশার চামড়া কেটে খেতে হল লোককে। রশিরশা ডেক-এ নামিয়ে লোনা জলে ডুবিয়ে নরম করে নিয়ে তারপর চামড়া কেটে সিদ্ধ করে গিলে ফেলা, চিবোনোর বালাই নেই। এত শক্ত সে চামড়া যে চিবোনো চলে না। খাবার পর পেটে দারুণ যন্ত্রণা।

পুরো তিন মাস ধরে যাত্রা চলল, ডাঙার লক্ষণ নেই। অনাহারে নাবিকেরা মরে যেতে লাগল। মৃতদের জলে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত হাঙরেরা খেয়ে ফেলে।

অবর্ণনীয় একটা বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে সবাইকে: মনে হল তরঙ্গের সীমাহীন এই মরুভূমিতে অমোঘ মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে তাদের জন্য। নাবিকদের মনে হল তাদের যাত্রার আর শেষ হবে না, স্থলদেশ কখনো আর চোখে পড়বে না।

মাগেল্লান কিন্তু জানতেন যে ফেরার উপায় নেই। সামনে কোনো একদিন দ্বীপ দেখা দেবেই। ফেরা অসম্ভব। ফেরার পথ দীর্ঘ, শক্তি বা খাদ্যতে কুলোবে না।

ভয়ঙ্কর সেই যাত্রার তিন মাসেরও বেশি কাটার পর চোখে পড়ল ডাঙা — কঠোর রিক্ত পাথুরে জায়গা, নেই এক ফোঁটা জল বা গাছপালা। তবু ভরসা মিলল। ডাঙার মানে জল মরুভূমি শেষ হয়ে এসেছে, সত্বর দেখা দেবে সমৃদ্ধ দ্বীপপুঞ্জ, তাতে মিলবে খাদ্য আর পানীয়। এবারে সত্যি নিরাশ হল না নাবিকেরা।

১৫২১ সালের ৬ই মার্চ আনন্দমুখর নাবিকদের সামনে দেখা দিল একটি দ্বীপ, সত্যিকার একটি দ্বীপ, পামগাছ আর মিষ্টি জলের স্রোত, ঠান্ডা আর পরিষ্কার জল, যে জলের তৃষ্ণায় এত দিন তারা কাটিয়েছে। এবার মিলবে টাটকা মাংস! সাহসী নাবিকদের অভাবকষ্টের দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত এবারে।

এখন স্বচ্ছন্দে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মাগেল্লানের অভিযানের সব দুর্বিপাক শেষ, এবার তারা দ্বীপ থেকে দ্বীপে যাবে বিনা ঝামেলায়, যাবে বন্দর থেকে বন্দরে, টিকে-থাকা তিনটে জাহাজ ইউরোপে ফিরবে জয়গর্বে।

কিন্তু ব্যাপারটা সে-রকম দাঁড়াল না। মাগেল্লান আর তাঁর সহযাত্রীদের সামনে তখনো অনেক দুর্ভোগ, সে দুর্ভোগ তারা নিজেরা ডেকে আনল। তখন দুর্বিপাকের জন্য প্রকৃতির আর দায়িত্ব নেই; নাবিকদের লোভ আর সস্তা জয়াশা দুর্বিপাকের মূলে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদে রাজাদের যে ঝগড়াঝাঁটি তাতে নাক গলালেন মাগেল্লান: ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি তাদের দেখিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে। বর্মাবৃত ষাটজন লোক নিয়ে তিনি যুদ্ধে নামলেন মাটান দ্বীপের অধিবাসী এক হাজার লোকের সঙ্গে যাদের হাতে শুধু তীর ধনুক আর বর্শা। সে যুদ্ধে নিহত হলেন মাগেল্লান।

সারা জীবন যে কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই কাজ অসমাপ্ত রেখে এই ভাবে মারা গেলেন প্রসিদ্ধ সেই সমুদ্রচারী।

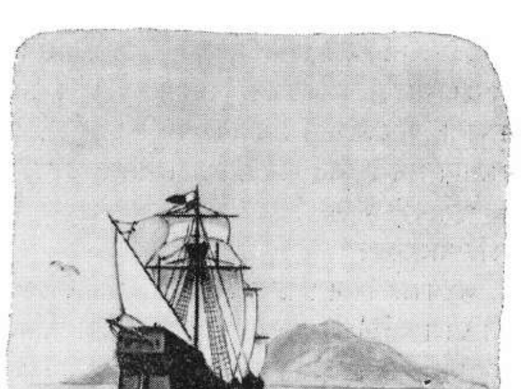
মাগেল্লান ও তাঁর দলের অনেকের মৃত্যুর পর স্প্যানিশ নাবিকেরা বহু দিন এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত নানা দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। তখন তাদের হাতে মাত্র দুটো জাহাজ — ত্রিনিডাড ও ভিক্তোরিয়া। ওখানকার লোকদের হাতে যাতে না পড়ে তার জন্য জীর্ণ কনসেপসিয়নকে তারা জ্বালিয়ে দেয়।

তারপর তারা দেখল যে ত্রিনিডাডের এমন দুরবস্থা যে ইউরোপে আর যেতে পারবে না। ঠিক হল পুরোপুরি সারাবার জন্য ত্রিনিডাডকে রেখে যাওয়া হবে, শুধু ভিক্তোরিয়াতে পাড়ি দিতে হবে ইউরোপে। ভিক্তোরিয়ার নাবিকদের সংখ্যা ৪৭, তারা যাঁর অধীনে সেই সেবাস্তিয়ান দেল কানো ছিলেন অবশিষ্টদের মধ্যে সেরা নাবিক।

প্রসঙ্গত ত্রিনিডাড ইউরোপে ফেরেনি। নানা দ্বীপের মধ্যে বহুদিন ঘোরার পর জাহাজটি ডুবে যায়। সঙ্গে মরে নাবিকদের বেশির ভাগ। শেষ পর্যন্ত মাত্র চারজন পেঁছয় স্পেনে।

টাটকা জল আর খাবার নিয়ে ভিক্তোরিয়া পাড়ি দিল গৃহমুখে।

ভয়ঙ্কর সে যাত্রা। পচে গেল খাবার, টকে গেল জল। জাহাজে ছিল ২৬ টন মশলা, তখনকার দিনে রীতিমতো একটা কুবেরভাণ্ডার। প্রাচ্য দ্বীপগুলিতে স্প্যানিয়ার্ডরা জিনিসের বিনিময়ে পায় মশলা। মশলা কিন্তু খাদ্য নয়, খাদ্যকে তারা সুগন্ধি করে, কিন্তু সুগন্ধ করার মতো খাদ্য কোথায়।



স্পেনের সেভিল বন্দরে ভিক্তোরিয়া পেঁছল ১৫২২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের পতাকা উড়ছে মাস্তুলে, তার নিচে দাঁড়িয়ে মাত্র ১৮ জন মানুষ। পৃথিবীর এই প্রথম পরিক্রমণে লাগে তিন বছর, মাত্র বারো দিন বাদ দিয়ে তিন বছর।

স্প্যানিশ সওদাগররা খুশি। অভিযানের খরচা আর পাঁচটি জাহাজের দাম বেশ উঠে এসেছে ২৬ টন মশলা থেকে।

সত্যি বটে ১৬০ জনের বেশি অফিসার আর নাবিকের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু তা নিয়ে সওদাগরদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ওদের মৃত্যুতে পয়সা বের করতে হয়নি গাঁট থেকে।

এই ভাবে শেষ হল মাগেল্লানের সুবিখ্যাত অভিযান।

এই প্রথম পাকা প্রমাণ মিলল যে পৃথিবী গোল, দেখা গেল যে নৌযোগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা চলে।

সমকালীনদের উপরে মাগেল্লানের আবিষ্কারের বিরাট প্রতিক্রিয়া কল্পনা পর্যন্ত করা আমাদের পক্ষে কঠিন।

পৃথিবীর মানচিত্র আর একবার দেখ। কলম্বাসের আগে ইউরোপীয়রা আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না; মাগেল্লানের আগে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রকৃত আয়তন সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এখন মানচিত্র থেকে আমেরিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরকে সরিয়ে দাও। বাকি অংশটা কত বড়ো? কলম্বাস আর মাগেল্লানের অদ্ভুত সমুদ্রযাত্রার আগে, সাড়ে চার শ' বছর আগে লোকে ভাবত এই বাকি অংশটাই হল পুরো পৃথিবী।

নিকোলাওস কোপের্নিকাস, মহান পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী

কলম্বাস, মাগেল্লান ও অন্যান্য নাবিকদের মহান সমুদ্রযাত্রার ফলে বদলে গেল পৃথিবীর মানচিত্র।

লোকে সবিস্ময়ে দেখল নতুন নানা দেশ, বাইবেলে উল্লেখ পর্যন্ত নেই এমন সব বিস্তৃত ভূখন্ড। আর ঠিক একালে বিশ্বজগতের গঠন নিয়ে একটি নতুন তত্ত্ব উত্থাপন করেন নিকোলাওস কোপের্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩), পোলিশ সহর টরুনের লোক তিনি। কোপের্নিকাস ছিলেন যাজক, গির্জা পরিষদের সভ্য।

পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চার্চের আপ্তবাক্যের বিরোধিতা করার সাহস কী করে হল একটি যাজকের?

আগেকার দিনে চার্চের সেবকরা ছিলেন বিশেষ একটি সমাজ বা শ্রেণী। যাজকসমাজ বলে তারা অভিহিত হতেন, বাকি সবাই হল অনিত্য বা পার্থিব সমাজের লোক। সে-সব দিনে যারা যাজক বৃত্তির জন্য তৈরি হত শুধু তারাই শিক্ষা পেত।

প্রার্থনার বই অনুসারে ধর্মোপাসনা গির্জায় চালাতে হবে, তাই তারা পড়তে শিখত। গির্জার ব্যাপার নিয়ে যাজক ও বিশপদের পত্র বিনিময় তো করতে হবে, তাই তারা লিখতে শিখত; ছাপাখানা আবিষ্কার হবার আগে সন্ন্যাসীরা ধর্মগ্রন্থ হাতে নকল করত।

পার্থিব বৃত্তি যাদের তাদের মধ্যে শুধু অল্প কয়েকজন লেখাপড়া জানত। রাজা বা সম্রাট কোনোক্রমে হিজিবিজি করে নাম সই করে, পড়ালেখার বালাই নেই, এ ব্যাপারটা খুব দুর্লভ ছিল না। তাদের বিষয়কর্ম চালাত যাজকেরা।

সেজন্য বিজ্ঞানে মন দেবার ইচ্ছে থাকলে পেশাদার যাজক হতে হত। রুটিওয়ালার সন্তান নিকোলাওস কোপের্নিকাস ঠিক তা-ই করেন। তিনি মানুষ হন কাকার কাছে, কাকা ছিলেন ক্যাথলিক বিশপ, তিনি তাঁকে এমন কি ইতালিতে পাঠান দীর্ঘকাল অধ্যয়নের জন্য। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া কোপের্নিকাস চিকিৎসাশাস্ত্র ও টেকনলজি অধ্যয়ন করেন, তিনি ভালো চিকিৎসক এবং সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।



নিকোলাওস কোপের্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩)।

মহান পোলিশ দেশপ্রেমিক ছিলেন কোপের্নিকাস। চার্চের যাজক হলেও তিনি জার্মানদের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে যোগ দেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়র তিনি, নিজেই দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করে দুর্গরক্ষাকারী সৈন্যদের পরিচালনা করেন।

চার্চের কাজকর্মে তাঁর অনেক সময় ও প্রচেষ্টা যেত। তাছাড়া গরিব অসুস্থ লোকেদের চিকিৎসায় অনেকখানি সময় তিনি দিতেন, চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়।

সন্ধ্যেবেলা আর রাতে কাজ থাকত না, সে-সময়টা তিনি দিতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিজ্ঞানে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে।

কয়েক শ' বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজ আজকের থেকে একেবারে অন্য রকম ছিল। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে তারা দেখতে পারেন। আকাশের যে কোনো অংশের ছবি তোলা যায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা এবং অদেখা অনেক তারা সে-ছবিতে ধরা পড়বে। কোপের্নিকাসের কালে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না, খালি চোখে শুধু তারাদের অধ্যয়ন করতে হত।

গ্রহনক্ষত্রকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য আকাশে তাদের অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষমতা রাখতে হত জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে, পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো সহরের অবস্থান

যে ভাবে বের করতে হয় ঠিক সে ভাবে। আকাশের মানচিত্রে রেখার একটা বুনোট ডিগ্রি মেপে আঁকতে হত তাঁদের, সে রেখাগুলো দেখতে আমাদের মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা রেখার মতো।

আগের দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন, অনেকটা দুই হাতওয়ালা বিরাট কাঠের কোণমাপা যন্ত্রের মতো। একটা হাত সে যন্ত্রে লাগানো থাকত, আর এ হাত হত দিগন্তমুখী। অন্য সচল হাতটা থাকত তারাদের দিকে মুখ করে। দুটোর মাঝেকার কোণ থেকে বোঝা যেত দিগন্ত থেকে তারাটি কত উঁচুতে। সে-সব দিনে মিনিট বা সেকেন্ড মাপার জন্য ঘড়ি পর্যন্ত ছিল না। জল আর বালি-ঘড়ির সাহায্যে লোকে মোটামুটি সময় বিচার করত।

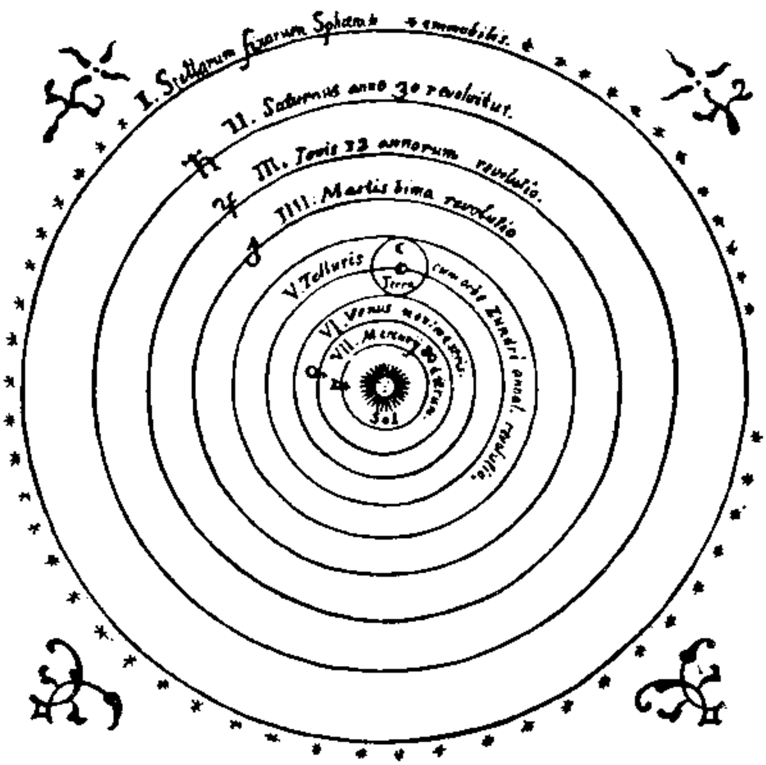
এ ধরনের বেঠিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কঠিন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালানোর জন্য লাগত অসীম কৌশল আর ধৈর্য আর বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ।

বছরের পর বছর, রাতের পর রাত, গরমে বা তুহিন আবহাওয়ায় কোপের্নিকাস যেতেন ফ্রমবোর্ক ক্যাথিড্রালের দেয়ালের একটি গম্বুজের ছাদে।

সুদীর্ঘ অনেক বছর পরিশ্রমের ফলে গ্রহনক্ষত্রের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ তিনি করেন।



জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ। ১৫২০ সালে আঁকা।



কোপার্নিকীয় দর্শন। গ্রহগুলির নাম লাটিন ভাষায় লিখিত, সে কালে এ ভাষাতেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক রচনা লেখা হত।

পর্যবেক্ষণগুলির ফলে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল যে টলেমীয় দর্শন ভ্রান্ত। এ দর্শনে একটি মাত্র সঠিক কথা তিনি পান — চাঁদ সত্যি সত্যি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ শুক্র মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবীকে নয়। আর স্বয়ং পৃথিবীর ব্যাপারটা কী? পৃথিবীটা কি একটা ব্যতিক্রম, অন্য গ্রহ থেকে আলাদা? অবশ্যই নয়। অন্যদের মতোই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সূর্যকে।

কোপের্নিকাসের মতে, বিশ্বজগতের স্থিরকেন্দ্র হিসেবে পৃথিবীকে ধরা চলে না, পৃথিবী এমন একটা কেন্দ্র নয় যার জন্য অন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীকে নক্ষত্রগুলির প্রদক্ষিণের মূলে আছে নিজের মেরুরেখাতে দিনে একবার পৃথিবীর আবর্তন। পৃথিবীর এই আবর্তনের জন্য মনে হয় সূর্য ও গ্রহগুলি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

কোপের্নিকাস যখন এই মহান আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। বহু বছর নির্যাতনের ভয়ে তিনি আবিষ্কারের কথা চেপে যান, কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাউকে বলেননি।

জীবনের শেষ দিকে কোপের্নিকাস শুধু বন্ধুদের নির্বন্ধে তাঁর রচনা ছাপাবার অনুমতি দেন। তাঁর বই প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে। লোকে বলে বইটির প্রথম কপি কোপের্নিকাসের কাছে আনা হয় তাঁর মৃত্যুশয্যায়।

চার্চের কর্তৃপক্ষরা বইটির গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারেননি। মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এত কঠিন ভাষায় বইটি লেখেন যে অজ্ঞ মঠবাসীদের মগজে ঢোকেনি।

অনেক দিন কোপের্নিকাসের বইকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বিনা বাধায় লোকে পড়ে। আর তাই অলক্ষিতে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল কোপের্নিকাসের নবতত্ত্ব।

কিন্তু অবশেষে বিশ্বজগতের এই নতুন দর্শনের আসল তাৎপর্য ধর্মগুরুদের কাছে ধরা পড়াতে তাঁরা কোমর বাঁধলেন নতুন তত্ত্বের বিরুদ্ধে। এ তত্ত্ব তো খৃষ্টধর্মের খাস বুনিয়াদের শত্রু: বাইবেল মতে, বিশ্বজগতের কেন্দ্র হল পৃথিবী, পৃথিবীর প্রভু হল মানুষ; সূর্য চাঁদ আর তারাদের সৃষ্টি করা হয় বিশেষভাবে মানুষের খাতিরে।

আর হঠাৎ কিনা ভোল বদলে গেল — পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, অন্যান্য গ্রহদের মতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা ছোট্ট একটা গ্রহ মাত্র, এমন কি বাচ্চাদের লাটিমের মতো নিজের মেরুরেখাতে ঘোরে।

এর সঙ্গে আবার বলা হয়েছে যে, বুধ শুক্র এবং অন্য গ্রহগুলি আকাশের স্ফটিক পাত্রে আলোর অতিক্ষুদ্র কণা নয়, তারাও স্বতন্ত্র জগৎ, তাদেরো আছে নিজের নিজের আকাশ ও পাতাল। অন্য গ্রহগুলির প্রকৃতি বিষয়ে সে-সময়ে কোনো ধারণা ছিল না জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের, তাঁরা ভাবতেন আমাদের পৃথিবীতে যেমন তেমন ওগুলিতেও প্রাণ আছে। অন্য জগতের লোকেরা বাইবেল-কথিত ভগবানসৃষ্ট প্রথম পুরুষ ও নারী, আদম ও ইভের বংশপ্রসূত তো হতে পারে না।

ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ধর্মগুরুরা: কোপের্নিকাসের কথা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেই লোকে অবিশ্বাসী হয়ে পড়বে, বাইবেলের নানা উপকথা যে আজগুবী সেটা বুঝতে তারা আরম্ভ করলে তাদের উপর চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

জিওর্দানো ব্রুনো

সেকালে ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ড যাওয়াটা ছিল দুঃসাধ্য, প্রতিবেশী দেশ দুটির মধ্যে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের প্রাচীর — আল্পস পর্বতমালা। উঁচু গিরিসঙ্কটে শুধু বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণ পথের ফালি।

ধনীরা খচ্চরের পিঠে চেপে পাহাড় অতিক্রম করত, স্থানীয় লোকেরা দেখাত পথ। যারা গরিব তারা যেত পদব্রজে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে বরফে জমে বা খাদে পড়ে মৃত্যু। শীতের দুর্ধর্ষ তুষারঝড়ের সময় লোকে মরত প্রায়ই।

তখনকার দিনে পথে চোর ডাকাতের সংখ্যা বেশ ছিল, তাদের হাত এবং প্রাকৃতিক নানা অসুবিধা এড়াবার জন্য যাত্রীরা — অশ্বতরসওয়ার ও পাদচারী দুইই — যেত বড়ো দল বেঁধে।

১৫৭৬ সালের শীতকালে সুইজারল্যান্ডযাত্রী এমন একটি ক্যারাভানে যোগ দিলেন মঠবাসীর বেশধারী একটি নবীন ইতালীয়।

সরাইখানায় যখন দলের লোক বিশ্রাম করে তখন যুবকটি সহযাত্রীদের থেকে আলাদা বসে থাকেন কোণে ঘুপসিতে, তাদের কথাবার্তায় যোগ দেন না: কেন তিনি চলেছেন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন সংক্ষেপে, আর কথা বলার সময়ে পোষাকের হুড দিয়ে মুখ আবৃত করেন। পথ চলেন একা একা, পুলিশ বা অন্য মঠবাসীদের এড়িয়ে চলেন।

কৌতূহলীরা পর্যন্ত যাত্রাশেষে নবীন ইতালীয়টির গোপন কথা ধরতে পারেনি। কিন্তু তাঁর গল্পটা এবার তোমাদের বলি।

তাঁর নাম জিওর্দানো ব্রুনো। 'স্বাধীন চিন্তার' জন্য দুস্তর সাজার কথা ওঠাতে মাতৃভূমি ইতালি ছেড়ে তিনি পলাতক। স্বাধীন চিন্তার মানে, চার্চের নির্দেশমাফিক না চলে অনেক বিষয়ে অন্যভাবে ভাবার দুঃসাহস তিনি ধরতেন।



জিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮—১৬০০)।

ইতালির ছোট একটি সহর নোলায় তাঁর জন্ম ১৫৪৮ সালে। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে মানুষ হন মঠে। এ কথা তোমরা তো আগেই শুনেছ যে সে-দিনে শিক্ষালিপ্সুদের যাজক আর মঠবাসীদের কাছে আবেদন করতে হত। সমস্ত শিক্ষার রূপ ছিল ধর্মতত্ত্বগত; ছেলেরা পড়তে শিখত ধর্মগ্রন্থ থেকে, আমাদের মতো প্রথম ভাগ থেকে নয়।

ক্যাথলিক মঠবাসীদের মধ্যে অনেক বিভাগ ছিল, তাদের নাম সম্প্রদায় বা বর্গ। সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ডমিনিকান বর্গ। ব্রুনো শিক্ষা পান ডমিনিকানদের কাছে। খুব চালাক চতুর ছিলেন বলে তিনি অনেক জ্ঞান আহরণ করেন, বর্গে তাঁকে গ্রহণ করা হয়, পরে তিনি যাজক হন।

বয়স যখন নিতান্ত কাঁচা তখনই চার্চের অনেক শিক্ষাবলী নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন, অনেক কিছু তাঁর কাছে ভ্রান্ত ঠেকত। মনে দেখা দিল প্রথম নানা ভীরু সংশয়।

মঠের লাইব্রেরির একটা অজ্ঞাত তাকে একদিন একটা ধুলোভরা, চামড়ায় বাঁধানো, ইঁদুরে-কাটা বই তাঁর হাতে এল। নবীন যাজক বইটি খুলে লাটিনে লেখা নাম থেকে জানলেন সেটা টরুনের নিকোলাওস কোপের্নিকাসের রচনা, বিষয়বস্তু হল গ্রহনক্ষত্রের কথা।

প্রসিদ্ধ এই বইটির বিষয়ে কানাঘুষো ইতিমধ্যেই জিওর্দানো শুনেছিলেন। আর এখন একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে মহারত্নটি! এবার মঠবাসীদের মুখ থেকে নয়, স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে তিনি জানবেন কোপের্নিকাসের তত্ত্ব।

লাইব্রেরিতে কদাচিত লোকে আসত, সেখানে নিরিবিলিতে বা নিজের বদ্ধদ্বার কুঠরিতে গোপনে বইটি মন দিয়ে পড়লেন ব্রুনো। নতুন দর্শনের সহজ স্বচ্ছতা তাঁকে অবাক করে দিল। নিজেকে সামলাতে না পেরে একজন মঠবাসীর কাছে বললেন কোপের্নিকাসের রচনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা। ব্রুনোর দুঃসাহসী বচনের কথা মঠবাসীটি বলে দিল ডমিনিকান বর্গের শীর্ষস্থানীয়দের কাছে।

নবীন মঠবাসীকে ভয়ঙ্কর শাস্তির হুমকি দেওয়া হল। তখন তিনি স্বদেশ ছেড়ে পালালেন, যাজকপদ পরিত্যাগ করলেন। মঠবাসীর বেশ তিনি ছাড়লেন না, কেননা যে দেশে হাজার হাজার মঠবাসী এবং যেখানে যাজকবৃন্দের লোকে ভয়সম্ভ্রম করে সেখানে এ বেশ রক্ষাকবচের সামিল।

পালিয়ে তিনি বাঁচলেন বটে, কিন্তু বহু বছর স্বদেশের মুখ আর দেখতে পেলেন না। সারা জীবন কোপের্নিকাসের ধ্যানধারণা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন জিওর্দানো ব্রুনো। অবশ্য বাধ্য চেলার মতো শুধু পুরনো বুলি কপচাননি তিনি। কোপের্নিকাসের মতামত তিনি বিকশিত করেন। বিশ্বজগৎ বিষয়ে তাঁর ধারণা এমন কি গুরুর ধারণার চেয়েও সঠিক।

ব্রুনো বললেন, শুধু পৃথিবী কেন, সূর্যও নিজের অক্ষে ঘোরে। ব্রুনোর মৃত্যুর অনেক দশক পরে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

ব্রুনো বেশ জোর দিয়ে বলেন যে, আমাদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনেক গ্রহ, আর নতুন অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে যাদের কথা পৃথিবীতে অজানা। ব্রুনোর মৃত্যুর দু শ' বছর পর প্রথম নতুন গ্রহ—ইউরেনস—আবিষ্কৃত হল, এবং আরো পরে নেপচুন, প্লুটো এবং শত শত ক্ষুদে গ্রহ—গ্রহাণুপুঞ্জ। প্রতিভাবান মানুষটির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল এই ভাবে।

সুদূর নক্ষত্রগুলিতে বিশেষ নজর দেননি কোপের্নিকাস। ব্রুনো বললেন যে, প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি সূর্য, আমাদের সূর্যের মতোই প্রকাণ্ড, আর তাদের প্রদক্ষিণ করে নানা গ্রহ। অনেক অনেক দূরে বলে সেগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের সৌরজগতের মতো প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি বিশ্বজগতের কেন্দ্র, এমন বিশ্বজগতের সংখ্যা অসীম।

ব্রুনো আরো বলেন যে, মহাশূন্যে সমস্ত বিশ্বজগতের শুরু ও শেষ আছে, তারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। অসাধারণ দুঃসাহসী ধারণা এটি; খৃষ্টধর্ম মতে, বিশ্বজগত অবিনশ্বর, ঈশ্বর যে-ভাবে সৃষ্টি করেছেন অনাদিকাল ঠিক সে-ভাবে আছে।

ক্ষুরধার মনশক্তি ছিল ব্রুনোর; শুধু বুদ্ধির সাহায্যে যে-সব জিনিস তিনি বুঝতে পারেন সেগুলি পরবর্তী কালে দূরবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কী দারুণ পরিবর্তন ব্রুনো আনেন সেটা আমাদের পক্ষে এমন কি কল্পনা করা কঠিন। যেন কারাগার থেকে একটি বন্দীকে তিনি মুক্ত করলেন আর সেই মানুষটির চোখের সামনে অন্ধকার ঘুপসি জেলকুঠরির দেয়ালের জায়গায় অবারিত হল অপরূপ ও অসীম একটি বিশ্বজগত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার কিছুকাল পরের লোক। তিনি স্বীকার করেন যে, 'সুবিখ্যাত ইতালীয়টির রচনাবলী পড়ার সময় মাথা ঘোরে, হয়ত তিনি মহাশূন্যে চলেছেন, যে মহাশূন্যের কেন্দ্র নেই, আদি নেই, শেষ নেই — এ কথাটা ভাবলে গোপন একটা বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে দেয়।'

জিওর্দানো ব্রুনোকে চরম শত্রু বলে চিনল চার্চ। অগণিত অধ্যুষিত জগৎ বর্তমান, বিশ্বজগৎ শেষহীন — ব্রুনোর এ তত্ত্ব বিশ্ব সৃষ্টি ও পৃথিবীতে খৃষ্টের আবির্ভাব বিষয়ে বাইবেলের সমস্ত কাহিনীকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করল — আর এদেরি উপরে তো খৃষ্টধর্মের পত্তন। ব্রুনোর বিরুদ্ধে চার্চ কর্তৃক আনীত অভিযোগে ১৩০টি পয়েণ্ট ছিল।

ব্রুনোকে কালাপাহাড়ী লোক বলে ঘোষণা করল চার্চের পান্ডারা, এ-দেশ ও-দেশে তাঁর বাস নিষিদ্ধ করে দিল কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করে। আর ব্রুনো যত ঘোরেন তত বেশি করে ছড়াতে লাগলেন নিজের মতাবলী সারা পৃথিবীতে।

বহু দিন নির্বাসনে কাটল। রৌদ্রোজ্জ্বল ইতালিতে ফিরে যাবার বাসনা প্রখর হল ব্রুনোর। এর সুযোগ নিয়ে তাঁর সর্বনাশ ঘটাল শত্রুরা।

একজন নবীন ইতালীয় অভিজাত, জিওভানি মচেনিগো, এমন ভাব দেখালেন যে ইউরোপের বিভিন্ন সহরে মুদ্রিত ব্রুনোর অগুনতি লেখায় তাঁর সাতিশয় আগ্রহ*। ব্রুনোকে তিনি লিখলেন যে তাঁর শিষ্য হতে চান, পরিশ্রমের মূল্য দেবেন অনেক।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ব্যাপারটা নির্বাসিত ব্রুনোর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু বেইমানি করে মচেনিগো আশ্বাস দিলেন যে, সব শত্রুর হাত থেকে তাঁকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন। ব্রুনোর আস্থা হল, বিদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর ক্লান্তি এসে গিয়েছিল।

মহান বিজ্ঞানী জানতেন না যে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁকে ইতালিতে ফিরিয়ে আনার বেইমানি পরিকল্পনাটা করেছিল ইনকুইজিশন। ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্তদের নির্যাতনের জন্য ইতালি ও স্পেনে যে নিষ্ঠুর বিচারসভা বসত তার নাম ইনকুইজিশন। ইনকুইজিশনের কালে বিচারকেরা হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড ঘটায়। এবার তাদের বলি হবে ব্রুনো।

ভেনিসে গিয়ে ব্রুনো মচেনিগোকে পড়াতে শুরু করলেন। শিষ্য তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে চলে যাবার সঙ্কল্প করলে প্রথমে তার কাছে বিদায় নিতে আসবেন। মচেনিগোর ভয়, পাছে ইনকুইজিশনের মতলব টের পেয়ে ব্রুনো পালিয়ে যান, যৌবনে যেমন পালিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিদায় নিতে এলে তাঁকে আটকে রাখতে পারবে সে।

কয়েক মাস পড়ার পর মচেনিগো বলল ব্রুনো তাকে ভালো করে শিক্ষা দিচ্ছেন না, তাঁর গুপ্ত বিদ্যার সমস্ত কিছুর ভাগ দিতে তিনি নারাজ।

এর উত্তরে ভেনিস ছাড়ার প্রস্তুতি করলেন ব্রুনো। মচেনিগো খবর দিল ইনকুইজিশনে। ১৫৯২ সালের ২৩শে মে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রেপ্তার হলেন, আটটি ভয়ঙ্কর বছর কাটল কারাগারে।

যে কুঠরিতে তিনি বন্দী তার ঠিক ওপরে সীসের ছাদ। গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরম, শীতকালে স্যাঁৎসেঁতে আর ঠাণ্ডা। এ কারাগারে বন্দীর জীবন সুদীর্ঘ একটি যন্ত্রণা — তিলে তিলে মৃত্যুর সামিল।

হত্যাকারীরা ব্রুনোকে আট বছর কারাগারে বদ্ধ রাখে কেন? তাদের আশা, ব্রুনো নিজের মতামত প্রত্যাহার করবেন। প্রত্যাহার করলে তাদের বিরাট জয়। সারা ইউরোপে পরিচিত ও সম্মানিত ব্রুনো যদি ঘোষণা করেন যে তিনি ভ্রান্ত, চার্চই অভ্রান্ত, তাহলে বিশ্বজগতের গঠন সম্বন্ধে চার্চের উপকথায় আবার বিশ্বাস ফিরে আসত অনেক লোকের।

---

* ব্রুনোর রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রহ আছে মস্কোয়, লেনিন লাইব্রেরিতে।

ব্রুনোর কিন্তু অদম্য মনোবল। চার্চের বিচারকদের হুমকি ও অত্যাচারে তিনি মাথা নোয়ালেন না। নিজের মতামতের সত্যতা বিষয়ে নানা প্রমাণ তিনি দিলেন নাছোড়-বান্দাভাবে।

তাঁর প্রাণদণ্ড দিল ইনকুইজিশন। বিচারসভার রায় শুনে বিচারকদের শান্ত কণ্ঠে বললেন ব্রুনো:

'দণ্ডাজ্ঞা শুনে আমার যা ভয়, দয়াময় ঈশ্বরের নামে এ দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণে তার চেয়ে বেশি ভয় আপনাদের।'

বকধার্মিকের মতো বিচারকরা রায় দিতেন এ-ভাবে: 'বিনা রক্তপাতে অপরাধীর দণ্ড হউক এ অনুরোধ জানাইতেছে পুণ্য চার্চ।' এ দণ্ডাজ্ঞা আসলে ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর — এর অর্থ যে অভিযুক্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে!



অগ্নিকুণ্ডে জিওর্দানো ব্রুনোর মৃত্যু।

১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জিওর্দানো ব্রুনোকে রোমে পুড়িয়ে মারা হয়।

অত্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দণ্ডিত মানুষটিকে নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডস্থানে। সামনে রক্তলাল একটি পতাকা। সমস্ত গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল। পুরো পোষাকে শত শত যাজক মৃত্যুকালীন স্তব গাইতে লাগল। দণ্ডিতের গায়ে একটি হলুদ পোষাক, তার ওপরে শয়তানের কুৎসিৎ ছবি কালো রঙে আঁকা। মাথায় উঁচু একটা মোচার মতো টুপি, টুপিতে অগ্নিশিখার মধ্যে শিঁটিয়ে থাকা একটি মানুষের ছবি। হাঁটার সময়ে ব্রুনোর হাতে পায়ের ভারি শেকলের ঝনঝনানি। হত্যাকারীদের ভয় ছিল, পাছে জনগণকে সত্য জানাবার শেষ একটা চেষ্টা করেন ব্রুনো, তাই তাঁর জিভ ফেড়ে দেয় তারা।

ব্রুনোর পিছনে বিশপ ও যাজক, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী এবং অভিজাতদের একটা মিছিল, প্রত্যেকে সুসজ্জিত।

যে চত্বরে দণ্ডস্থান সেখানে হাজার হাজার রোমান নাগরিক জমায়েত হয়েছে। মিছিলের পথে লোকে লোকারণ্য। তামাসার জন্য ব্যাকুল সবাই, সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে উৎসবের দিনের একটা অঙ্গ; সাহসী বিজ্ঞানীর প্রতি অসম্ভব পাশবিক ব্যবহারে বিচলিত, এমন লোক মুষ্টিমেয় মাত্র।

খুঁটিতে বাঁধার আগে ক্ষমালাভের বিনিময়ে নিজের মতামত প্রত্যাহারের আর একটি সুযোগ দেওয়া হল ব্রুনোকে। ঘৃণার সঙ্গে সে-ডাক অগ্রাহ্য করে দৃঢ় পদে এগিয়ে গেলেন মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আগুনে দগ্ধে মরার সময়ে একবারও কাতরোক্তি করেননি তিনি।

ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হল বটে কিন্তু বিজ্ঞানের বিকাশ রুধতে পারল না চার্চের কর্তৃপক্ষরা।

সংগ্রামে নিহত এক একটি বিজ্ঞানী-সৈন্যের জায়গা নিল আরো দশটি বিজ্ঞানী।

রোমে যে চত্বরে ব্রুনো মৃত্যু বরণ করেন সেখানে ১৮৮৯ সালে তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ বসানো হয়।

গালিলিও গালিলেই

জিওর্দানো ব্রুনোর প্রাণদণ্ডের বছরে গালিলিও গালিলেই ছত্রিশে পা দেন। কোপের্নিকীয় দর্শন ঠিক বলে তিনি মানতেন, কিন্তু ব্রুনোর ভয়ঙ্কর পরিণামে তিনি এত বিচলিত হন যে প্রত্যক্ষভাবে সে দর্শন সমর্থন করার ঝুঁকি নিতে তিনি চাননি।

ঠিক এ সময়ে ঘটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা: দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। নতুন যন্ত্রটি দিয়ে তারা দেখেন প্রথম গালিলিও। ইতালির এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশে যা দেখলেন তাতে মোক্ষম বোঝা গেল যে কোপের্নিকীয় দর্শন সত্য। চাঁদে গালিলিও দেখলেন

পাহাড়, আর দেখা গেল চাঁদ বেশ বড়ো একটা জগৎ, আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে অনেক আদল আছে।

চাঁদের মতোই একটা কাস্তের রূপে শুক্রগ্রহকে দেখেন গালিলিও, গ্রহটি আকাশে একটি উজ্জ্বল বিন্দু মাত্র নয়।

সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হল বৃহস্পতির পর্যবেক্ষণ, যেটা গালিলিও আরম্ভ করেন ১৬১০ সালের ৭ই জানুয়ারি। তিনি দেখলেন বৃহস্পতি আলোর একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র নয়, বেশ বড়ো একটা বৃত্ত। বৃত্তের কাছাকাছি তিনটে ছোট দাগ। ১৩ই জানুয়ারি আর একটি দাগ চোখে পড়ল গালিলিও-র।



গালিলিও গালিলেই (১৫৬৪—১৬৪২)।

নিচের ছবিটা দেখ। দেখে হয়ত অবাক হবে এই ভেবে যে, গালিলিও কেন সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারটে বিন্দু দেখেননি—ওদের ফটোগ্রাফ কত ভালো ওঠে! কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল অতি দুর্বল শক্তির, এবং পরে তাঁর তৈরি দূরবীক্ষণগুলির মধ্যে যেটি সেরা তার বিবর্ধনশক্তি ছিল মাত্র ৩০ গুণ। গালিলিও আবিষ্কার করলেন যে বৃহস্পতির গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোর চারটি বিন্দু বিরাট গ্রহটিকে শুধু অনুসরণ নয়, প্রদক্ষিণও করে। এ ভাবে ধরা পড়ল যে বৃহস্পতির চারটে চাঁদ আছে।

বিজ্ঞান জগত গালিলিও-র আবিষ্কারকে অবজ্ঞার সঙ্গে পাত্তা দিল না। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্রেমোনিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে রাজী হলেন না।



বৃহস্পতির দিকে টেলিস্কোপ ফিরিয়ে কী দেখেন গালিলিও।

'আমি যখন জানি যে বৃহস্পতির কোনো উপগ্রহ নেই, থাকতে পারে না তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দেবার দরকারটা কী?'

এ নির্বোধোক্তিতে নিজের নামকে 'বিখ্যাত' করেন ক্রেমোনিনি।

অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন বৃহস্পতির কোনো উপগ্রহ থাকা উচিত নয়, কেননা সেগুলো মানুষের কোনো কাজে লাগবে না।

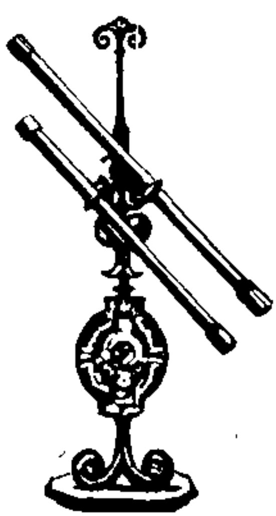
একজন বিশপ বললেন:

'সপ্তাহে সাতটা করে দিন; মানুষের মুণ্ডুতে সাতটা খোলা দ্বার—দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাসারন্ধ্র আর একটা মুখ; আকাশে সাতটা গ্রহ — চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র, সূর্য এবং শনি। গালিলিও আরো চারটে গ্রহ আবিষ্কার করেছেন এটা মানলে গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াবে এগারো — সেটা সম্ভব নয়!'

ইনিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ দিতে রাজী হলেন না।

এঁদের সমস্ত আপত্তি সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে বৃহস্পতির উপগ্রহ আছে বাস্তবিক।

মহাশূন্যচারীদের মধ্যে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে সহজ। চাঁদিনী রাতে আকাশের আমাদের এই বন্ধুটিকে অতি দুর্বল দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, দেখে মানুষ কত তৃপ্তি পায়।



গালিলিওর দূরবীক্ষণ।

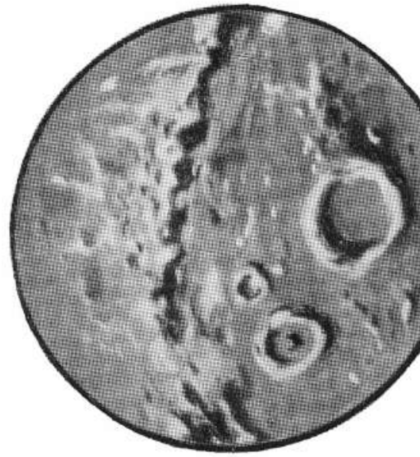
তাঁর কথায় অবিশ্বাসী যারা তাদের সবাইকে গালিলিও বলতেন, 'এসে দেখুন না একবার!'

তিনি বুঝেছিলেন যে আকাশের বিষয়ে সত্যকার জ্ঞান বিস্তারের সবচেয়ে ভালো উপায় হল যত সম্ভব বেশি লোককে চোখে দেখানো। প্রতি রাত্রে কয়েকজন জমায়েত হতেন গালিলিও-র চারিপাশে — তাঁর বন্ধু বান্ধব, পরিচিত ব্যক্তি, এমন কি একেবারে অপরিচিতরাও। সবাই নিজের চোখে দেখতে চাইত চাঁদকে। আর দেখে তাদের মনের অবস্থা কেমন হত!

চাঁদের উপরিভাগে তারা দেখত প্রকাণ্ড কালো কালো ছোপ, যেগুলোকে গালিলিও ভুল করে ভাবতেন সমুদ্র ও মহাসাগর; দীর্ঘ পর্বতমালা; ছায়ার দীর্ঘতা বিচার করে তাদের উচ্চতা হিসাব করতে শেখেন গালিলিও। চাঁদ আকাশমণ্ডলে আবদ্ধ একটি রূপালি চাকতি, পৃথিবীকে

আলো জোগানোর জন্য তার সৃষ্টি — এ কথা শুনলে তখনি লোকে হাসত।

অদ্ভুত এ-সব আবিষ্কারের পর গালিলিও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তখনো ক্যাথলিক চার্চ প্রকাশ্যভাবে কোপের্নিকাসের দর্শনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি; ১৬১০ সালে গালিলিও একটি বই লিখলেন যার নামটি চমৎকার — 'সিডেরিউস নানসিয়াস অর্থাৎ তারাদের অগ্রদূত'। বইতে কোপের্নিকীয় দর্শনের স্বপক্ষে লেখেন গালিলিও, কিন্তু লেখেন মহা সাবধানে।



টেলিস্কোপে দেখা চাঁদের পৃষ্ঠ।

চার্চ-পিতারা চিন্তিত হলেন: ব্রুনোকে হত্যা করা হয়েছে, তবু কোপের্নিকাসের মতামত লোপ পায়নি, বরং সে দর্শনের একজন নতুন সমর্থক দেখা দিয়েছে, লোকের মধ্যে মতবাদ ছড়ানোর জন্য।

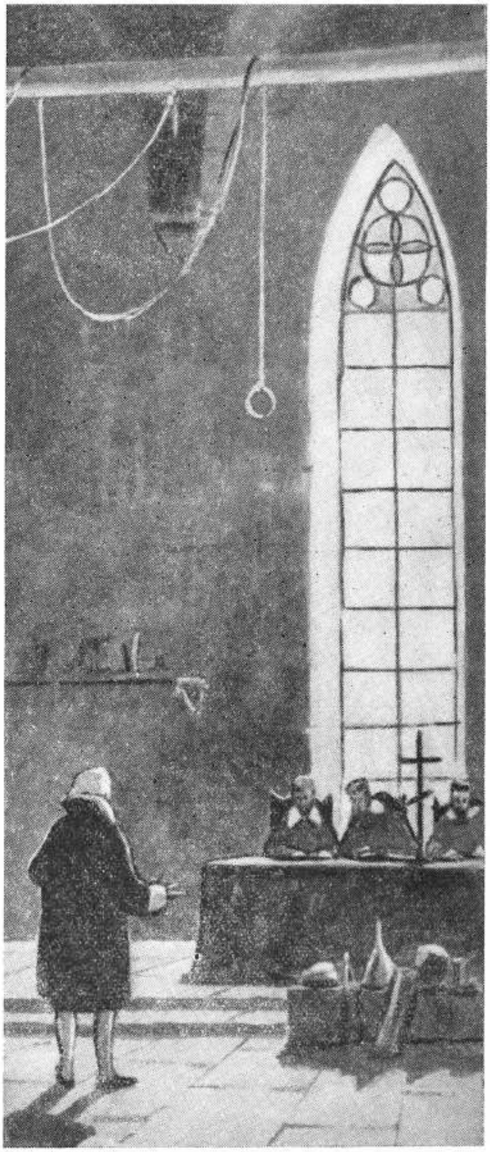
আর এই সমর্থক এবং সহজ-লিখিয়ে এমন একটি বিদ্বান ব্যক্তি যাঁর নাম সারা ইউরোপ জানে।

ক্যাথলিক চার্চের প্রধান, রোমের পোপ ১৬১৬ সালে একটি ডিক্রী বের করলেন। তাতে বলা হল যে কোপের্নিকীয় দর্শনকে সমর্থন করে বই ছাপালে গুরু দণ্ড দেওয়া হবে। তাছাড়া, এ ধরনের বই এমন কি কাছে রাখলে অপরাধ বলে মানা হবে।

কোপের্নিকাসের মতামতের প্রতি চার্চের ঘৃণা এত বিপুল যে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এর সমর্থন করে বই ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল।

তারপর চার্চ-পিতারা স্বয়ং গালিলিও-কে আক্রমণ করলেন। ১৬৩২ সালে 'দুই বিশ্বদর্শনের বিষয়ে কথোপকথন' নামে একটি বইতে তিনি কোপের্নিকীয় দর্শনকে সমর্থন করেন। অনেক কষ্টে বইটা তিনি ছাপাতে পারেন। মুদ্রাকররা তাঁর অর্ডার প্রত্যাখ্যান করে — কোপের্নিকীয় বিধর্ম প্রচারের অভিযোগে নির্যাতিত হবার ভয়ে। যা হোক, তবু বইটি ছাপা হয়ে বেরোল। চার্চ-পিতারা রেগে আগুন।

গালিলিও-র বই বিতরণ করা নিষিদ্ধ হল; বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে হুকুম করা হল রোমে যেতে, সেখানে তাঁর বিচার করবেন স্বয়ং পোপ।



বিচারসভায় গালিলিও।

মৃত্যুর ভয় দেখানো হল তাঁকে; জিজ্ঞাসাবাদ চলল নির্যাতনকক্ষে, সেখানে চোখের সামনে সেই ভয়াবহ যন্ত্রগুলি — চামড়ার ফানেল যাতে করে পেটে বিপুল পরিমাণে জল ঢোকানো হয়, পা দুমড়ে দেবার লোহার বুট, হাড় ভাঙার সাঁড়াশি ...

জীর্ণ বৃদ্ধ এ-সব হুমকি সইতে পারলেন না, নিজের মতামত প্রত্যাহার করলেন।

২২শে জুন বিরাট জনতার সামনে চার্চে নতজানু হয়ে বসে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর অনুশোচনা ব্যক্ত করলেন।

এমন কি তখনো চার্চ তাঁকে হাতের মুঠোছাড়া করল না। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইনকুইজিশনের বন্দী হয়ে রইলেন। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করা তাঁর বারণ। তবু গোপনে একটি বই লেখেন গালিলিও, যাতে পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কদের বিষয়ে সত্য কথাটি তিনি স্পষ্টভাবে বলেন।

নির্যাতন, যন্ত্রণা বা প্রাণদণ্ড, কিছুতেই নতুন মতামতের প্রসার রোখা গেল না। বিজ্ঞানের বীর ও শহীদদের মহতী কাজ সার্থক হতে লাগল।

দূরবীক্ষণ ও মানমন্দির



জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পেশার প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী হাতিয়ার হল দূরবীক্ষণ। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে দূরবীক্ষণের আবিষ্কার এত বড়ো ভূমিকা নেয় যে এর বিষয়ে অল্প কিছু অন্তত জানা দরকার।

কয়েকজনের হয়ত চোখ খারাপ, সামনের বা দূরের জিনিস দেখতে কষ্ট হয়। কেউ বা কাছের জিনিস দেখে, দূরের জিনিস ঠিকমত বুঝতে কষ্ট হয়। অন্যরা দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখে, কিন্তু ছুঁচে সুতো পরানো বা বইয়ের অক্ষরবিচার আসে না।

চশমার সাহায্যে চোখ খারাপ সারাতে শেখে লোকে দীর্ঘ দিন আগে। যারা দূরের জিনিস দেখে তাদের লেন্‌স্ দু দিকে উত্তল বা কনভেক্স, যারা কাছের জিনিস দেখে তাদের লেন্‌স্ অবতল বা কনকেভ।

প্রথম ধরনের লেন্‌সের দুটো দিকই উদ্‌গত, মধ্যিখানটা ধারের চেয়ে পুরু। আকারটা আতশী কাচের মতো। দু দিক কনভেক্স লেন্‌সের মধ্য দিয়ে বইয়ের অক্ষর বড়ো দেখায় — সেজন্য এর নাম ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস।

দু দিক কনকেভ লেন্‌স্ ঠিক তার উল্টো — ধারগুলো মধ্যিখানের চেয়ে পুরু। এতে জিনিস দেখায় ছোট।

সাড়ে তিন শ' বছর আগে আচমকা একটা আবিষ্কারের গল্প প্রচলিত আছে। একটি চশমাবানিয়ের ছেলে দু দিক কনভেক্স ও দু দিক কনকেভ লেন্‌স্ নিয়ে খেলছিল। এ-ভাবে ও-ভাবে চোখের সামনে সেগুলোকে রাখতে রাখতে অতর্কিতে একটা লেন্‌স্ রাখল অন্যটার সামনে — মনে হল দূর গির্জার গম্বুজটা হঠাৎ অতি কাছে এসে পড়েছে। বাপকে কথাটা বলাতে সে দুটো লেন্‌স্‌কে একটা টিউবের মধ্যে রাখে। এই ভাবে নাকি প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভব।



গল্পটা সত্যি কি মিথ্যে তাতে কিছু এসে যায় না। জরুরী কথাটা হল এই — ১৬০৫ সাল নাগাদ প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখা দিল ইউরোপে। একটা টিউবে তৈরি (এখনকার ফিল্ড বা অপেরা-গ্লাসের মতো দুটোতে নয়), এক চোখ বুজে অন্যটা দিয়ে দেখতে হত।

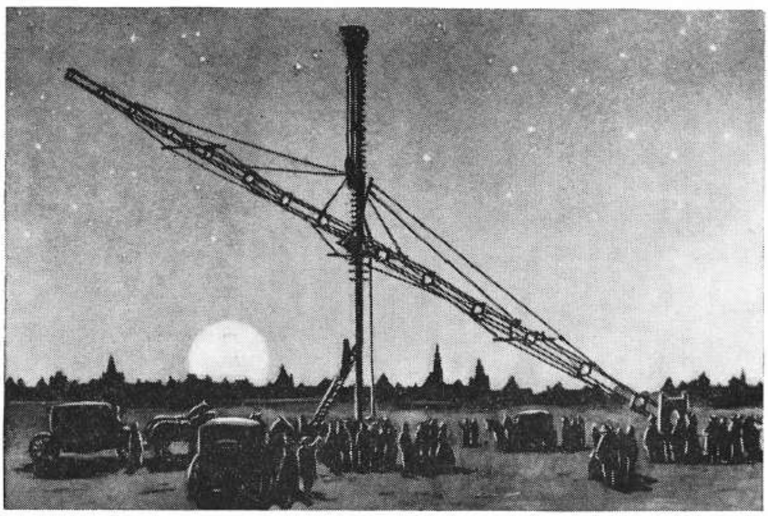
গালিলিও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আশ্চর্য কয়েকটি আবিষ্কার করেন সে কথা তোমরা জানো। কিন্তু তাঁর যন্ত্র নিখুঁত ছিল না।

দক্ষ কারিগররা দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে আরো ভালো এবং আরো বড়ো করতে লাগল। প্রথম দিককার ছোট ছোট যন্ত্রগুলিকে বলা হত স্পাই-গ্লাস, বড়ো যন্ত্রগুলিকে প্রথম বলা হল দূরবীক্ষণ বা টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপ কথাটা গ্রীক, এর মানে 'দূর থেকে দেখা'। অনেক দূরের জিনিস চোখে পড়ে বলে যন্ত্রটির নাম টেলিস্কোপ।

প্রথম দিককার বড়ো দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলি ছিল অসুবিধাজনক। পোলাণ্ডের গ্দান্স্ক সহরে জান হেভেলিউস কর্তৃক নির্মিত বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির ছবি আছে এই পাতায়। এটার টিউব পর্যন্ত নেই। দড়িতে করে ওঠাতে নামাতে হত, ব্যাপারটা অসুবিধাজনক।

বেশি দিন যেতে না যেতে প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভব হল। এর প্রধান অংশ হল ঝকঝকে পালিশ করা কনকেভ আয়না, এর দেহটি দেখতে আকাশমুখী প্রকাণ্ড কামানের মতো।

১৯৪১ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী দ. দ. মাকসুতভ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এবং আরো



হেভেলিউসের বিরাট টেলিস্কোপ।

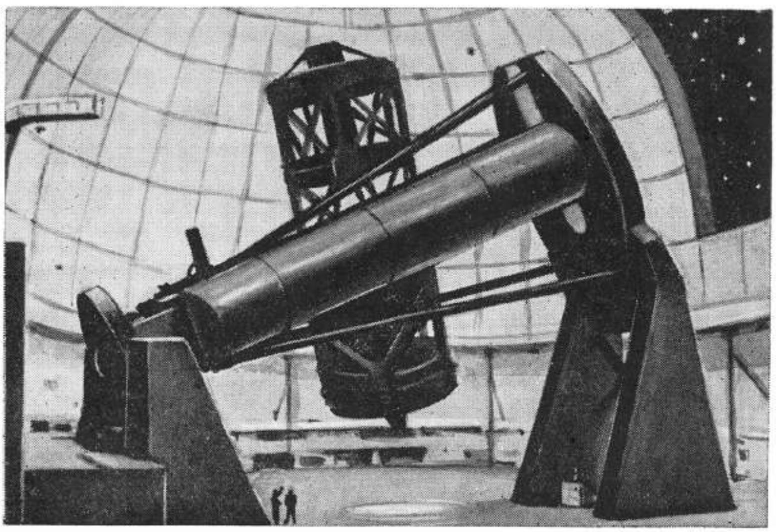
নিখুঁত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। তাঁর যন্ত্রের প্রধান অংশ হল একটি কনকেভ আয়না এবং একটি লেন্স্ যার একপিঠ কনকেভ ও অন্যটা কনভেক্স। এ লেন্স্ কাটলে দেখা যায় চাঁদের কাস্তের মতো একটি প্রস্থচ্ছেদ বা মেনিসকাস। নতুন যন্ত্রটির নাম লাটিন থেকে বিজ্ঞানীরা রেখেছেন মেনিসকাস টেলিস্কোপ।

এটিতে প্রতিরূপ বেশ ভালো আসে; এর দেহ বা টিউব পুরনো ধাঁচের দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলির চেয়ে অনেক ছোট। ফলে ব্যবহার করা অনেক সহজ।

পর্যবেক্ষণ চলে মানমন্দিরে। সাধারণত এগুলিকে বড়ো সহর থেকে দূরে তৈরি করা হয় পাহাড় বা এমন কি পর্বতের উপর যেখানে মেঘ কম, হাওয়া আরো স্বচ্ছ এবং শান্ত। অনেক উঁচুতে নিম্নভূমির মতো হাওয়া অত স্পন্দিত হয় না।

লেনিনগ্রাদের কাছে পুল্কোভো মানমন্দির দুনিয়ার একটা সেরা মানমন্দির। নানা আবিষ্কার এবং নিখুঁত পর্যবেক্ষণের জন্য এর প্রসিদ্ধি। বিদেশী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পুল্কোভোর নাম দিয়েছেন 'দুনিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় রাজধানী'। সুপরিচিত আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিউকোম্ব একবার বলেন, পুলকোভোতে একটা পর্যবেক্ষণ গ্রিনউইচে (লন্ডনের কাছে) চারটে পর্যবেক্ষণের সামিল।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে নাৎসি হামলাদাররা পুল্কোভো মানমন্দির ধ্বংস করে। পরে এটিকে আবার নির্মাণ করা হয়।



পাঁচ মিটারের রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ।

পৃথিবী কত বড়ো?

এ বইতে অনেক বড়ো সংখ্যার কথা পাবে — মিলিয়ন, হাজার মিলিয়ন ইত্যাদি। মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ তা তো জানো — কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয় — সংখ্যাটা কত বড়ো তার একটা উপলব্ধি চাই।

একজন বিজ্ঞানী একটা পদ্ধতি বাতলেছেন: মিলিয়নের চেহারাটা কেমন জানতে চাইলে এক শ' বড়ো পাতা নিয়ে প্রত্যেকটাতে দশ হাজার বিন্দু বসাও (এক শ' লাইন, প্রতি লাইনে এক শ' বিন্দু)। বড়ো একটা ঘরে সমস্ত পাতাগুলো টাঙিয়ে দিয়ে ঘুরে তাকালে দেখতে পাবে এক মিলিয়ন বিন্দু। চেষ্টা করে দেখবে নাকি? আগে থেকে তাহলে সাবধান করে দিই: প্রতি সেকেণ্ডে তিনটে করে বিন্দু বসিয়ে এক নাগাড়ে কাজ করে গেলেও তোমার লাগবে ৯২ ঘণ্টা।

যে কোনো ছেলে মেয়ের পক্ষে কাজটা বেজায় বেশি, কিন্তু ক্লাসের সবাই উঠে পড়ে লাগলে দু ঘণ্টার বেশি লাগবে না। তখন কাগজের পাতাগুলো ক্লাসঘরের দেয়ালে টাঙানো যাবে।

এ ভাবে সারা ক্লাস ভালো করে বুঝবে মিলিয়ন সংখ্যাটা কত বড়ো।

এখন ভেবে দেখ: যে কারখানায় তোমাদের স্কুলের খাতা তৈরি হয় তাকে বলা হল একটার উপর একটা করে এক মিলিয়ন খাতা রাখা হোক। গাদাটা কতখানি উঁচু হবে? দেড় হাজার মিটারের কম নয়! যা একটা পাহাড় হবে তাতে কাঁচা বয়সের পাহাড়-চড়িয়েরা বেশ তালিম নিতে পারবে। এখন একবার কল্পনা কর — এক মিলিয়ন সাধারণ পেন্সিল রাখা হয়েছে একটা অন্যটাকে ছুঁইয়ে — ১৮০ কিলোমিটার লম্বা একটা লাইন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যদি পেন্সিল-কারখানা এক মিলিয়ন পেন্সিলের মালমশলা দিয়ে একটা মাত্র বড়ো পেন্সিল তৈরি করে? জিনিসটা হবে লম্বায় ১৮ মিটার, ওজনে ৭ টন। শুধু রূপকথার দৈত্য, মাথা যার মেঘ ছোঁয়, শুধু সে এমন একটা পেন্সিলে লিখতে পারবে।

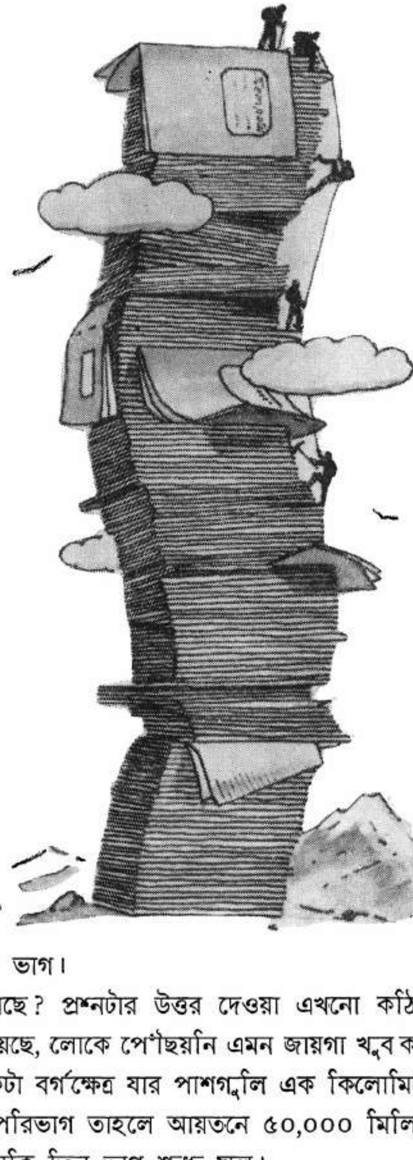
এবার কল্পনা করা যাক হাজার মিলিয়ন ব্যাপারটা কী (আমেরিকানরা একে বলে বিলিয়ন, কিন্তু ইংরাজীভাষী অন্যান্য দেশে বিলিয়নের মানে দশ লক্ষ মিলিয়ন)।

আশেপাশের ছোটখাটো জিনিসগুলোর আকার এক হাজার মিলিয়ন বাড়ালে সেগুলো প্রকাণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। এক হাজার মিলিয়নের স্কুলখাতার গাদা হবে ১,৫০০ কিলোমিটার উঁচু। এর চূড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবে, শুধু রকেট পৌঁছবে এর মাথায়।

পঞ্চাশজন ছাত্রের একটা ক্লাস যদি বিনা ছুটিতে দিনে ছ ঘণ্টা স্কুল খাতা গোনে আর প্রত্যেকে গোনে ঘণ্টায় তিন হাজার করে, তাহলে হাজার মিলিয়ন শেষ করতে লাগবে তিন বছরের বেশি।

সার বেঁধে হাজার মিলিয়ন পেন্সিল সাজালে লাইনটা চার বারের বেশি পৃথিবীকে বেড় দেবে। আর হাজার মিলিয়ন পেন্সিলের মালমশলা দিয়ে একটা পেন্সিল বানালে সেটা দৈর্ঘ্যে হবে ১৮০ মিটার, প্রস্থে সাড়ে ছয় মিটার এবং ওজনে ৭,০০০ টন। পাইপের মতো পেন্সিলের ভেতরটা ফাঁপা হলে সেখানে প্রায় পোনেরোটা একতলা বাড়ি বানানো চলবে, এক শ' জন লোকে থাকতে পারে সেখানে।

তারা বলবে সগর্বে: 'আমরা থাকি পেন্সিল-নগরে।'



এখন পৃথিবীর আকার নিয়ে পড়া যাক।

পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত কূয়ো খুঁড়লে সেটা হবে ৬,৩৮০ কিলোমিটার গভীর। সিঁড়ি বা মই বেয়ে ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে নামতে থাকলে, দিনে রাত্রে না থেমে তলায় পেঁছিতে লাগবে প্রায় দু মাস।

অবশ্য এমন কূয়ো খোঁড়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে গভীর খনিগুলো তো দু কিলোমিটারের বেশি গভীর নয় — আর এটা হল পৃথিবীর বুক থেকে তার কেন্দ্রের যতটা দূরত্ব তার তিন হাজার ভাগের এক ভাগ।

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের নিচে কী আছে? প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া এখনো কঠিন। এ-দিকে ভূপৃষ্ঠ বেশ খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে, লোকে পেঁছিয়নি এমন জায়গা খুব কম।

কিলোমিটারের উপরিভাগ হল এমন একটা বর্গক্ষেত্র যার পাশগুলি এক কিলোমিটার দীর্ঘ, ১০০ হেকটারের সমান। পৃথিবীর উপরিভাগ তাহলে আয়তনে ৫০,০০০ মিলিয়ন হেকটার। এর দশ ভাগের সাত ভাগ জল, বাকি তিন ভাগ শুধু স্থল।

পৃথিবীর ঘনমান কতোখানি?



কিউবিক কিলোমিটার কল্পনায় আনতে পারো? বাক্স হিসেবে ভাবলে এক কিলোমিটার উঁচু, এক কিলোমিটার চওড়া এবং এক কিলোমিটার লম্বা হবে জিনিসটা। এ বাক্সে মস্কোর সব বসতবাড়ি ও দালান ভরে দেওয়া যেতে পারে। আর পৃথিবীর ঘনমান হল এমন কিউবিক কিলোমিটারের চেয়ে দশ লক্ষ মিলিয়নেরও বেশি!

পৃথিবীর ভর, অর্থাৎ কী পরিমাণ উপাদানে এর গড়ন, তা কল্পনা করা অতি কঠিন। তাই একটা ছবি দেবার চেষ্টা করি।

ধরো, ঠিক করা হল বিশ্বজগতের অন্য একটা জায়গায় পৃথিবীকে সরানো হবে। পৃথিবীর ভর, অর্থাৎ যা দিয়ে তৈরি তার সবটা — পাথর ও ধাতু, বড়ো বড়ো পিপেতে জল, সিলিণ্ডার ভর্তি গ্যাস — সব যদি এক শ' টন ধরে এমন এক একটা মালগাড়িতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীকে বহন-করা ট্রেনে কত গাড়ি থাকবে?

বিরাট সংখ্যাটা বললে শব্দটা অচেনা ঠেকবে তোমাদের। তাই অন্য ভাবে বলা যাক: পৃথিবীর অবস্থান থেকে শেষ মালগাড়িটা যখন ছাড়বে তখন ইঞ্জিন পৌঁছিয়ে গিয়েছে দূর নক্ষত্রের এলাকায়।



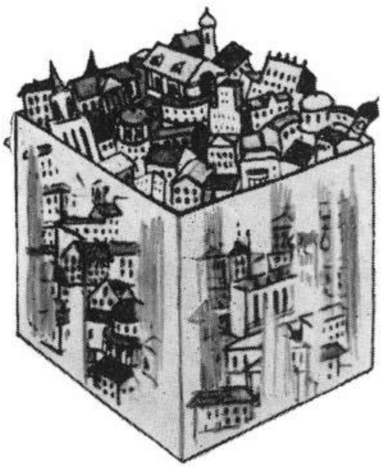
বিশ্বজগতে সবচেয়ে দ্রুত জিনিস হল আলোর গতিবেগ — এক সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

'কী সাংঘাতিক বেগ!' এ কথাটা বলার সময়ে আলোর রশ্মি পৃথিবীকে আট পাক ঘুরবে।

যদি বল: 'চাঁদ কত দূরে!' কথা শেষ করার আগেই আলোর রশ্মি পৌঁছিয়ে যাবে চাঁদে।

পৃথিবী-বাহী ট্রেনের পিছনে গার্ড লণ্ঠন তুলল ইঞ্জিন-চালককে সঙ্কেত জানাতে। কতক্ষণে সঙ্কেতটি পৌঁছবে চালকের কাছে? ষাট হাজার বছরের বেশি। তাহলে বোঝো, পৃথিবীর ভর ব্যাপারটা কী!

পৃথিবী-বাহী ট্রেনে গার্ড না রাখলে নয়। গাড়ির সংখ্যা অনেক, কিন্তু প্রতি বিশ হাজার মিলিয়ন ট্রাক পিছু এক একটি গার্ড রাখা ঠিক হয়েছে। তবু আশ্চর্য ট্রেনটির গার্ড জোগাতে লেগে যাবে পৃথিবীর সমস্ত লোক — ২৫০ কোটি লোক। দুজন গার্ডের মধ্যেকার ব্যবধান হবে ৩৬ কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় আড়াই গুণ। সবচেয়ে কাছের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জাগল একজন গার্ডের মনে — ট্রাকগুলির ছাদ হয়ে স্বাভাবিক হাঁটার গতিতে, ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার হিসেবে চললে তার লাগবে ৬,৯০০ বছর।



পুঁজিবাদী কয়েকটি দেশে এমন বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা বলেন যে, পৃথিবীতে বড্ডো বেশি লোক, কিছু দিনের মধ্যে সব অধিবাসীদের আহার্য জোগাতে আর পারবে না পৃথিবী।

কথাটা সত্যি নয়!

পৃথিবীর উপরিভাগকে সমস্ত লোকের মধ্যে সমানভাবে বিলি করলে প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও শিশু পাবে পাঁচ হেকটার শুকনো জমি আর বারো হেকটার জল। আর পাঁচ হেকটারে অপর্যাপ্ত শস্য, ফলমূল শাকসব্জি হতে পারে। প্রত্যেককে বিলি করা জমি থেকে খাবার জোগানো চলবে শত শত জনকে।

অবশ্য মরুভূমি আর তুষারাবৃত জায়গাগুলিকে চাষবাসের পক্ষে ঠিক করে নেবার জন্য অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু সেটা করার সামর্থ আছে মানুষের।

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, অবিলম্বে কয়লা, লোহা আর তেলের ঘাটতি দেখা দেবে। এটাও সত্যি নয়।

পৃথিবীর সম্পদের শেষ নেই। আজ জলবিদ্যুৎ, হাওয়ার শক্তি, সূর্যরশ্মির উত্তাপ এবং পারমাণবিক তেজ কয়লা ও তেলের জায়গা দখল করতে চলেছে।

পৃথিবীতে ধাতুর সরবরাহ অফুরন্ত। তবু কোনো কারণে কোনো ধাতুর ঘাটতি হলে ইঞ্জিনিয়ররা তার জায়গায় অন্য ধাতু বা প্লাস্টিক দিতে পারবেন।

কম্পাসের পয়েন্ট

বোনার পাতলা ছুঁচ একটা জোগাড় করে আপেলের মধ্যে এমন ভাবে ঢোকাও যাতে ঠিক মাধ্যখান হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো হল বৃন্তের কাছে ঢুকিয়ে দেওয়া। তাহলে আপেলের অক্ষ হবে ছুঁচটা, অক্ষদণ্ডের উপরে যেমন চাকা ঘোরে তেমন ভাবে এর উপর আপেলটাকে ঘোরানো যাবে। আপেল নড়বে, অক্ষ কিন্তু নিশ্চল।

যেখানে ছুঁচ ঢুকেছে এবং যেখান থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে সেগুলো হল মেরু। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। বৃন্তের পয়েন্টটাকে বলা যাক উত্তর মেরু। তাহলে দুটো মেরুর মধ্যে তফাৎটা স্পষ্ট থাকবে। এখন আপেলের মধ্যখান ঘিরে এমন ভাবে একটা লাইন টানো যাতে দুটো মেরু থেকে দূরত্ব সমান থাকে। এটা হল ভূবিষুবরেখা, এটি আপেলকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করেছে। উত্তর মেরুর গোলার্ধ উত্তর গোলার্ধ, অন্যটি দক্ষিণ গোলার্ধ।

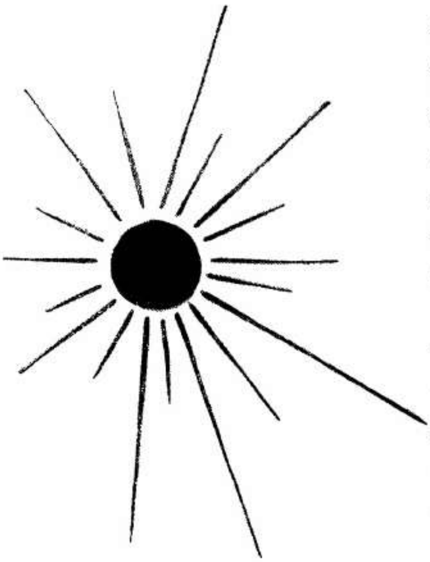
পিজবোর্ডের একটি ক্ষুদে মানুষ বানিয়ে ভূবিষুবরেখার উপরে রাখো উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে বা আরো সহজে বলতে গেলে, উত্তরমুখো করে। লোকটার ডান হাত পূবের দিকে থাকবে, বাঁ হাত পশ্চিমের দিকে।

এ-বার উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত একটা লাইন টানো। এটির নাম মেরিডিয়ান বা মধ্যরেখা, অর্থাৎ মধ্যদিনের রেখা। নামটা এল কোথা থেকে? আপেলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঘিরে একটা সুতো জড়ানো সহজ, কিন্তু পৃথিবীর বেলায় নয়। সেটা করতে গেলে বিশ হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা সুতো নিয়ে যেতে হবে উত্তুঙ্গ পাহাড়, সমুদ্র ও মরুভূমি পেরিয়ে। যা হোক, ছোট একটা মধ্যরেখা টানা চলে এ-ভাবে:



লম্বা একটা খুঁটি এমন ভাবে মাটিতে বসাও যাতে একেবারে খাড়া হয়ে থাকে। তারপর দরকার হল রোদের দিনে খুঁটিটির ছায়ার নড়ন দেখা। ভোর সকালে ছায়া হবে দীর্ঘ, তারপর সূর্য উঠলে ক্রমশ ছোট হতে থাকবে। মধ্যদিনে সবচেয়ে ছোট, তারপর আবার দীর্ঘ হবার পালা।

ছায়া যখন সবচেয়ে ছোট তখন একটা গজাল মাটিতে পোঁতো। গজাল থেকে খুঁটি পর্যন্ত লাইন টানলে সেটা হবে মধ্যরেখার একটা অংশ; উত্তর গোলার্ধে তোমার বাস হলে খুঁটিটা হবে তোমার লাইনের দক্ষিণ প্রান্ত আর গজালটা উত্তর প্রান্ত। লাইনটার নাম মধ্যরেখা বা মধ্যদিনের রেখা, কেননা মধ্যদিনে তুমি সেটা টেনেছো।



খুঁটির দিকে পিছন ফিরে আর গজালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তুমি দেখবে উত্তর দিক, দক্ষিণ দিক থাকবে তোমার পিছনে, পূব ডাইনে আর পশ্চিম বাঁয়ে। কম্পাসের চারটে প্রধান পয়েণ্ট বের করার উপায় হল এটা। এদের মধ্যখানে অন্যান্য পয়েণ্টও আছে — উত্তর-পূব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম।

স্থল ও জলপথের যে সব যাত্রীদের দিকনির্ণয় বিষয়ে আরো সঠিক হতে হয় তারা এদের মধ্যে আরো অনেক পয়েণ্ট বসায়, যেমন উত্তর-উত্তর-পূব, পূব-উত্তর-পূব ইত্যাদি। কথাগুলির অর্থ তোমাদের কাছে এখন সহজবোধ্য হয়েছে মনে হয়।

কিন্তু মেঘলা বা বাদলা দিনে দিকনির্ণয় চলে কেমন করে? তখন কম্পাসের চুম্বক কাঁটা ব্যবহার করতে হয় — এর একটা দিক উত্তরমুখী, অন্যটা দক্ষিণ। কম্পাসের ছোট গোল কার্ডে সব কটা পয়েণ্ট বসানো আছে — সেজন্য তাদের নাম কম্পাসের পয়েণ্ট।

নির্মেঘ রাত্রে ধ্রুবতারার দিকে তাকিয়ে কম্পাস বিনাই উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম বের করা চলে।

উত্তর গোলার্ধের বাসিন্দে সবায়ের কাছে একটি নক্ষত্রমণ্ডল পরিচিত, এর নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বড়ো ভাল্লুক। অবশ্য চেহারাটা মোটেই ভাল্লুকের মতো নয়, বরং হাতাওয়ালা বাটির মতো। আগেকার দিনে লোকে বলত বড়ো হাতা, সবচেয়ে যুতসই নাম বোধহয় সেটা।

হাতার শেষ দুটো তারার মাঝখান দিয়ে একটা লাইন যদি টানো এবং আরো পাঁচ গুণ এগিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সেটা প্রায় ধ্রুব বা উত্তর তারার মধ্য দিয়ে যাবে।



রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে দিকনির্ণয়।



সপ্তর্ষি ও ধ্রুবতারা।

ধ্রুবতারা কখনো স্থান পরিবর্তন করে না। আর সমস্ত তারা এটিকে প্রদক্ষিণ করে যেন তাদের কেন্দ্র এটি, কিন্তু ধ্রুবতারা নিজের জায়গায় অটল।

উত্তর দিক দেখিয়ে দেয় ধ্রুবতারা। এর মুখোমুখি দাঁড়ালে কম্পাসের অন্য সমস্ত পয়েণ্ট বের করা চলে।

অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জের — ছোট ভাল্লুক বা শিশুমারের শেষ তারা হল ধ্রুবতারা। শিশুমারের আকার অনেকটা সপ্তর্ষির মতো।

কাজাখরা মজার নাম দিয়েছে বড়ো ও ছোট ভাল্লুকের। আগে তারা ছিল রাখালিয়া লোক, ভেড়া, উট আর ঘোড়া পালন করে জীবিকা চালাত। ভাবত আকাশেও পশুপালক আছে। নিশ্চল ধ্রুবতারাকে তারা বলত খুঁটি, যে খুঁটিতে ছটা ঘোড়া অর্থাৎ ছোট ভাল্লুকের অন্য নক্ষত্রগুলি বাঁধা। সারা রাত তারা খুঁটির চারপাশে ঘোরে আর স্বর্গের ঘাস খায়। বড়ো ভাল্লুক বা সপ্তর্ষির যে সাতটি তারা সারা রাত খুঁটি আর ঘোড়ার চারপাশে চক্কর দেয় তাদের তারা বলত সাত ঘোড়াচোর — স্বর্গের ঘোড়া চুরির মতলব তাদের।

আকাশে ধ্রুবতারাকে বের করতে শিখলে পরে কাজ দেবে।

পৃথিবীতে দিন রাত্রি কেন হয়

স্টেশন থেকে মন্থর গতিতে বেরোনো ট্রেনে বসে মনে হয় অন্য লাইনের নিশ্চল ট্রেনটা পিছু দিকে হটছে। আসলে কিন্তু তোমার ট্রেনটাই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। গতি বাড়লেই ভ্রান্তি কেটে যায় ঝাঁকুনি, দোলানি আর খট খট শব্দে।

জাহাজ যখন বন্দর ছাড়ে তখন একই ভুল হয় আমাদের। ক্ষণেকের জন্য মনে হয় বন্দরটা জাহাজ থেকে সরে যাচ্ছে।

অতিকায় একটা লাটিমের মতো আমাদের পৃথিবী শূন্যে ঘূর্ণ্যমান।

একটা লাটিম ঘুরিয়ে তার উপরে কাগজের ছোট টুকরো বসিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে টুকরোটা পড়ে যাবে। যে শক্তিতে ওটা পড়ে তার নাম কেন্দ্রাতিগ শক্তি। অর্থাৎ যে শক্তি কেন্দ্র থেকে অন্যদিকে টানে। কোনো কিছু ঘুরতে থাকলেই দেখা দেয় এ শক্তি।

পার্কের চর্কিপাক-যন্ত্র জোরে, ক্রমশ জোরে ঘুরতে থাকলে ওপরকার লোকজন ছিটকে পড়ে।

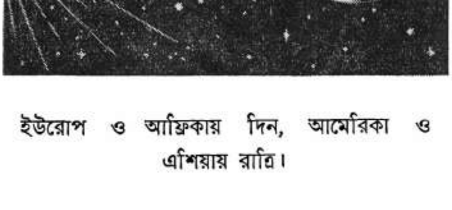
কিন্তু পৃথিবী তো ঘূর্ণ্যমান, তবু ওপরের লোকজন, পশু পক্ষী, পাথর বালি কেন পড়ে যায় না, কেন উপছে পড়ে না নদী আর সাগরের জল?

কারণটা সহজ: পৃথিবী যথেষ্ট জোরে ঘোরে না।

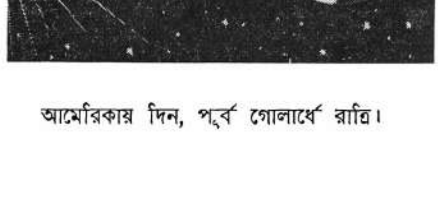
চর্কিপাক-যন্ত্র চলতে শুরু করলেই লোকে পড়ে যায় না, পড়ে তখনি যখন সেটা বেশ জোরে ঘোরে।

পশ্চিম থেকে পূবে পৃথিবীর ঘুরপাক, একটা পুরো পাক খেতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। পৃথিবীর তুলনায় মানুষ এত ক্ষুদ্র যে গতিটা বোঝে না, বিশেষ করে গতিটা অত্যন্ত মসৃণ বলে, কোনো বিরতি বা ঝাঁকুনি নেই। তাই আমাদের ভ্রান্তি হয় যে, পৃথিবী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অথচ আকাশ আর আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক — চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র — চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার আবর্তন করছে। মনে হয় আকাশ পূব থেকে পশ্চিমে বিপরীত মুখে চলেছে।

ছুঁচসুদ্ধ সেই আপেলটা তো রয়েছে। ছুঁচটা হল অক্ষ বা মেরুদণ্ড। পৃথিবীর মেরুদণ্ড



ইউরোপ ও আফ্রিকায় দিন, আমেরিকা ও এশিয়ায় রাত্রি।



আমেরিকায় দিন, পূর্ব গোলার্ধে রাত্রি।

ইস্পাতের ছুঁচ নয়, কল্পিত একটা লাইন যাকে ঘিরে পৃথিবীর চক্রগতি। লাইনটা দৈর্ঘ্যে ১২ হাজার কিলোমিটারের বেশি। পৃথিবীর বিষুবরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার।

সূর্যের দিকে শুধু একটা দিক করে পৃথিবী বরাবর ঘুরলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াত? সে দিকটায় তাহলে হত প্রচণ্ড তাপ, আর অন্য আলোহীন দিকটায় ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডা আর অন্ধকার।

তাহলে পৃথিবীতে প্রাণ থাকা অসম্ভব হত। কিন্তু রাত্রি আছে, দিন আছে, পৃথিবীর চক্রমণ এমন ভাবে চলে যে কোনো একটা দিকে অতি গরম বা অতি ঠাণ্ডা হয় না।

সময়ের হিসাব

গতিহীন পৃথিবীর মতো অসম্ভব জিনিস কল্পনা করতে পারো? এমন পৃথিবীতে তাহলে সময় গণনা হত কী করে?

অদ্ভুত বিচিত্র সে দেশে সূর্য আকাশে নিথর হয়ে আছে, গাছের পাতা বাতাসে কম্পিত নয়, বনে শিকারীর পাশে ক্ষীণ হলুদ অগ্নিশিখা একেবারে স্থির। শিকারী নিজে একেবারে না নড়েচড়ে বসে আছে আগুনের পাশে, তার ঘড়ির কাঁটা গতিহীন, ঝোপঝাড়ে ইঁদুর ধরার জন্য থাবা বাগিয়ে যেন জমে গিয়ে শেয়ালটা দাঁড়িয়ে আর গর্তের মধ্যে ইঁদুরটারও একই দশা... এটা কি রূপকথা? হ্যাঁ, তাই।

অনাদিকাল থেকে লোকে রূপকথা বানিয়েছে, এ-রকম কাহিনীতে নিদ্রিত পুরীর কথা আছে। দেশের রাজা ও রানী তিন শ' বছর ধরে নিশ্চল, প্রাসাদে মন্ত্রী আর ভৃত্য, প্রাসাদ তোরণে সান্ত্রী, প্রবেশদ্বারে ঘোড়ারা গতিহীন, ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে নিষ্কম্প। তারপর সাহসী রাজকুমার এসে নিদ্রিত পুরীর মন্ত্রাবিষ্ট ঘুম তাড়াল আর সবাই যে যার কাজে আবার লাগল, বুঝল না যে তিন শ' বছর তারা ঘুমিয়েছে। যেখানে গতি নেই, সেখানে সময় বলে কিছু নেই!

কোটি কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগে, ঘড়ি উদ্ভাবনের আগে, প্রকৃতি নিজে সময় নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সঠিক ঘড়ি দেয়। সেটা হল নিজের মেরুদণ্ডে মসৃণ আর নিয়মিতভাবে ঘোরা অতিকায় লাট্টুর মতো আমাদের পৃথিবী, যেটা সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবীর গতিতে চলা মহাকায় একটা ঘড়ি বানানো সম্ভব হলে তার দুটো কাঁটা থাকত — বছর-কাঁটা আর দিন-কাঁটা। প্রথমটা বছরে একবার ঘড়িতে চক্কর দিত, দ্বিতীয়টা দেখাত নিজের মেরুদণ্ডে পাক খেতে পৃথিবীর কতটা সময় লাগে।

সময়ের এই দুটো প্রধান মাপ আমাদের দিয়েছে প্রকৃতি। বাকি সবকিছু মানুষের উদ্ভাবন। সপ্তাহকে পাঁচ বা দশ দিন দীর্ঘ করার ক্ষমতা ধরে মানুষ, দিনকে সে দশ বা চল্লিশ ঘণ্টায় ভাগ করতে পারে, ঘণ্টাগুলো আজকের তুলনায় বড়ো বা ছোট হবে তাহলে। কিন্তু দিনকে এক সেকেণ্ডে বাড়ানো বা কমানো বা পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে আরো তাড়াতাড়ি ছোটানো মানুষের প্রয়োগবিদ্যার বাইরে।

বারো মাসে কেন বছরকে ভাগ করা হয়েছে? তার কারণ চাঁদ। 'মান্থ্' আর 'মুন' কথাটার উৎপত্তি এক শব্দ থেকে। বছরে বারো বারের একটু বেশি পৃথিবীকে চক্কর দেয় চাঁদ। তাই বারো মাসে বছর আমাদের হিসেবে।

মাস বিভক্ত হয়েছে সপ্তাহে।

প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, রীতি-আচার আর অনুষ্ঠানের স্মৃতি টিকে আছে সপ্তাহের দিনের নামকরণে। সব ভাষায় এটা ঘটেছে।

দিনকে ভাগ করা হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে আর মিনিটকে ষাট সেকেণ্ডে। আজকাল তো বেশির ভাগ লোক দশমিকে শতকে গণনা করতে অভ্যস্ত, তাহলে দিনকে দশ ঘণ্টার দুটো অংশে, ঘণ্টাকে এক শ মিনিটে আর মিনিটকে এক শ সেকেণ্ডে ভাগ করলেই হয়। তাহলে ঘণ্টা আজকের চেয়ে একটু দীর্ঘ আর মিনিট ও সেকেণ্ড সংক্ষিপ্ত হবে বটে, কিন্তু মেট্রিক পদ্ধতিতে সময় গণনা করার সুবিধা আছে।

এ পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু কখনো কাজে লাগানো হয়নি এটিকে, কেননা তাহলে সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি ঘড়ি বরবাদ করে নতুন ঘড়ি বানাতে হবে। কোটি কোটি বই আর পাঠ্যপুস্তক নতুন করে লিখে ছাপাতে হবে। তাই সময়-গণনার অসুবিধাজনক পদ্ধতিটা প্রাচীন ব্যাবিলন থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে রয়েছে: ব্যাবিলনের লোকেরা ডজন আর ষাটে গুণত।

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকে নানা ধরনের ঘড়ি ব্যবহার করে আসছে। আগেকার দিনের একটা ঘড়ি ছিল সূর্যঘড়ি। মাটিতে একটা খুঁটি খাড়াভাবে পোঁতা হত, সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে খুঁটিকে ঘুরত তার ছায়া — সকালে আর সন্ধ্যায়



সূর্য-ঘড়ি।

দীর্ঘ ছায়া, মধ্যাহ্নে ছোট। এতে অবশ্য মিনিট ও সেকেন্ড অনুমান করার কোনো উপায় ছিল না, আর মেঘলা সূর্যহীন দিনে এ ঘড়ি ছিল অকেজো।

বালি ও জলঘড়িও প্রচলিত। একটি পাত্র থেকে অন্য পাত্রে কতটা বালি বা জল ঝরল তা থেকে সময়ের মাপ। বড়োলোকের বাড়িতে এ ঘড়ি দেখার জন্য বিশেষ দাস থাকত। সব জল বা বালি উপরের পাত্র থেকে নিচের পাত্রে পড়লে, সে পাত্র বদলে হাঁক দিত — 'সকালের পর এতটা বেজেছে' — অনেকটা ঘণ্টাওয়ালা ঘড়ির মতো।

হাসপাতাল আর ক্লিনিকে বিভিন্ন চিকিৎসার সময় গণনার জন্য এখনো বালিঘড়ির চল আছে।

অনেক পরে উদ্ভব হল ভার ও পেণ্ডুলামওয়ালা ঘড়ির। সবশেষে এল স্প্রিঙে চলা পকেটঘড়ি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যত প্রখর তত সঠিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সময়-গণনা। সারা পৃথিবীতে সঠিক সময়-সঙ্কেত জানায় রেডিও।

এত সঠিক সময় কার দরকার? সমুদ্রে তার জাহাজ ঠিক কোথায় জানার জন্য সঠিক সময় দরকার জাহাজের ক্যাপ্টেনের; রাত্রে বা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় চলার সময় এটার দরকার পড়ে বিমানের দিগ্‌নির্ণকের; ইঞ্জিনিয়র ও ক্রীড়াবিদ, শিক্ষক ও ছাত্র — সবায়ের দরকার সঠিক সময়।

কিন্তু যেটাকে সঠিক সময় বলি সেটাও বিজ্ঞানীদের পক্ষে যথেষ্ট সঠিক নয়; তাঁদের আছে নিজস্ব উঁচু জাতের সঠিকতা, কেননা তাঁদের কারবার হল সেকেণ্ডের হাজার ভাগের, এমন কি মিলিয়ন ভাগের একাংশের সঙ্গে।

সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঠিক সময় জানায় মস্কোর স্তের্নবের্গ রাষ্ট্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইনস্টিটিউট আর লেনিনগ্রাদের পুল্‌কোভো মানমন্দির।

তারাদের অবস্থিতি হিসেবে সঠিক সময় বিচারের অতি নিখুঁত যন্ত্রপাতির ডিজাইন করেছেন সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়র আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।



দ্বিতীয় খণ্ড

তারা এবং গ্রহ কী জিনিস?

সূর্য একটি প্রকাণ্ড অগ্নিময় গোলক যাকে চক্রমণ করে আমাদের পৃথিবী। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পোনেরো কোটি কিলোমিটার, তবু চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল একটা চাকতির মতো তা আমাদের ঠেকে আর দু এক মিনিট তাকালে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু ভোর-সকালে বা সন্ধ্যের দিকে যখন দিকচক্রবালের কাছে সূর্য তখনি দেখাটা নিরাপদ। সে সময় ঘন বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে সূর্যরশ্মির জৌলুষ কিছুটা কমে।

পৃথিবী আরো দূরে সরে এলে সূর্যের বাহ্যিক চেহারাটা কেমন হবে? আরো ছোট দেখাবে নিশ্চয়ই। যদি আরো কয়েক হাজার কোটি কিলোমিটার দূর থেকে তাকাই তাহলে দেখাবে ক্ষুদ্র উজ্জ্বল একটা বৃত্তের মতো। যতক্ষণই তাকাই না কেন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগবে না।

সূর্য থেকে দূরে, আরো দূরে সরে গেলে সেটাকে দেখতে হবে নির্মেঘ আকাশে দৃশ্যমান আরো অনেক নক্ষত্রের মতো।

সূর্য হল নক্ষত্র। এত বিরাট দেখায় তার কারণ পৃথিবী অনেক কাছে। অন্য নক্ষত্রগুলি প্রত্যেকে এক একটি সূর্য, আমাদের পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব বিরাট।

হাজার হাজার ডিগ্রীর তাপযুক্ত অগ্নিময় জ্যোতিষ্ক হল নক্ষত্র। প্রত্যেকটি তপ্ত জিনিস আলো ছড়ায় — আলো ছড়ায় প্রদীপের অগ্নিশিখা, বিজলী বালবের গনগনে গরম সাদা তার; মেঘ থেকে চকিতে আসা বিদ্যুতের আলোয় আলো হয়ে ওঠে পৃথিবী। কিন্তু প্রদীপশিখা বা বিজলী বালবের সূত্রের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি তাপ ধরে যে কোনো নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার চেয়ে কতো বেশি দূরত্ব পৃথিবী থেকে অনেক নক্ষত্রের — লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোটি নিযুত গুণ বেশি — তবু সেগুলো আমাদের চোখে পড়ে। এতে প্রমাণ হয় কী ভীষণ উজ্জ্বল শূন্যের এই অগ্নিগোলকগুলি?

আকাশে অন্য সব দেহ আছে যেগুলি নিজেরা আলো দেয় না, বড়ো নক্ষত্রের আলো ধার করে ছড়ায়।

সূর্যের দিকে মুখ করালে আয়না পুড়ে যাবে না, উজ্জ্বল সূর্যালোক প্রতিফলিত করবে। সে প্রতিফলন এত তেজী যে তাকানো যায় না। আয়নায় সূর্যরশ্মির প্রতিফলন দেখা যায় বহু দূর থেকে, সঙ্কেত পাঠানোর জন্য একে ব্যবহার করে সৈন্যরা।

শুধু আয়নাই সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে না; সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় টেবিল থেকে, বই থেকে, কাচের জলাধার থেকে, দেয়ালের ছবি থেকে, গাছপালা পাহাড় পর্বত থেকে, ঘরে যা কিছু আছে আর রাস্তায়, সব থেকে।

সহজ একটা পরীক্ষা করতে পারো: জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে দাও বা পর্দা টেনে দাও — রোদে ঝকঝকে ঘরের জায়গায় অন্ধকার।

অন্ধকারটা কী? আশে পাশের জিনিস থেকে সূর্যরশ্মি অপ্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে না এলে আমরা বলি অন্ধকার। এবার একটা মোমবাতি ধরাও বা বিজলী বাতিটা জ্বালাও। আবার সবকিছু গোচর হল, অবশ্য সূর্যালোকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় তেমন নয়।

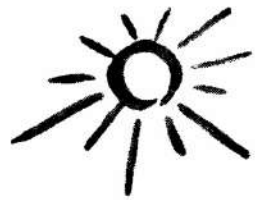
তাহলে আলো-না-ছড়ানো জিনিস আমরা শুধু দেখি এই কারণে যে তারা অন্য একটা উজ্জ্বল জিনিসের রশ্মি প্রতিফলিত করে চালান দেয় আমাদের কাছে।

আয়নায় সূর্যের প্রতিফলন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগায় কেন? কেনই বা একই রশ্মিতে আলোকিত অন্যান্য জিনিস — যেমন টেবিলে রাখা নোটবই বা বিছানার কম্বল — আমরা চেয়ে দেখতে পারি বিনা অস্বস্তিতে?

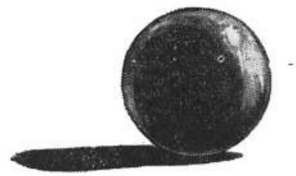
ঝকঝকে মসৃণ বুকওয়ালা উজ্জ্বল জিনিস সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে জোট বাঁধে, আর এই রশ্মির জটলা চোখে ধাঁধা লাগায়। অমসৃণ বুকওয়ালা জিনিস সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত করে। একসঙ্গে কয়েকটি মাত্র রশ্মি চোখে লাগলে ক্ষতি হয় না।

বহিশূন্যে অন্ধকার ও ঠান্ডা দেহ আছে। এদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছে হল চাঁদ। তাহলে চাঁদ চোখে পড়ে কেন? কারণ, চাঁদের পৃষ্ঠদেশে প্রতিফলিত হয় সূর্যরশ্মি।

চাঁদের উপরিভাগ অমসৃণ, সূর্যরশ্মির অনেকগুলোকে শুষে নেয়, অন্যগুলোকে করে বিক্ষিপ্ত, তাই কয়েকটি মাত্র রশ্মি আমাদের গোচর হয়।



চাঁদের উপরিভাগ যদি আয়নার মতো হত? তাহলে সূর্যের প্রতিফলন হত অসহনীয় উজ্জ্বল, তাকানো যেত না সে দিকে। আসলে অল্পমাত্র আলো প্রতিফলিত করে চাঁদ, এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের তুলনায় ৪,৩৭,০০০ গুণ কম।



তোমরা হয়ত বলবে, 'কিন্তু চাঁদ তো বেশ উজ্জ্বল, ঝকঝকে বৃত্ত বা কাস্তের মতো আমাদের কাছে দেখা দেয়। চাঁদের আলোয় অনেক কিছু দেখা যায় আর চাঁদিনী রাতে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।'

কথাটা সত্যি। তার ব্যাখ্যা: চাঁদ হল বড়ো একটা শূন্যচর। অনেক কোটি বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এর উপরিভাগ আর সূর্যরশ্মির খুব কম অংশ পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হলেও সে অংশটায় বেশ কয়েকটা রশ্মি আছে। তাই চাঁদের চাকতি উজ্জ্বল ঠেকে আমাদের কাছে।

ঝকঝকে চাঁদিনী রাতে আমাদের চোখে পৌঁছনো সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়েছে দুবার: প্রথমত, চাঁদ থেকে এবং দ্বিতীয়ত, চাঁদের আলো-পড়া জিনিস থেকে, অর্থাৎ যে সব জিনিস আমাদের কাছে দৃশ্যমান।

যে সব জ্যোতিষ্ক নিজেরা আলো দেয় না, সূর্যালোক প্রতিফলিত করে, তাদের নাম গ্রহ।

চাঁদ হল গ্রহ। কিন্তু পৃথিবীকে পাক দেয় বলে একে বলা হয় পৃথিবীর অনুচর বা উপগ্রহ।

আমাদের পৃথিবীও গ্রহ; চাঁদের চেয়ে ছ গুণ বেশি আলো প্রতিফলিত করে সে। চাঁদ থেকে দেখলে পৃথিবীকে চাঁদের চেয়ে পোনেরো গুণ বড়ো আর ৮০ গুণ উজ্জ্বল মনে হত।

কিন্তু পৃথিবী যে আলো প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য — তার মাপ কী ভাবে করলেন বিজ্ঞানীরা?



অমাবস্যার সময়ে যখন ছোট সরু একটা কাস্তের মতন চেহারা চাঁদের তখন তার অনালোকিত দিকটায় একটা প্রায় দেখা-না-যাওয়া রূপালী আভা থাকে। আভাটা হল চাঁদের উপর পৃথিবীর আলো, পৃথিবী থেকে আসা আলোক প্রতিফলিত

করে চাঁদ। চাঁদের রূপালী আভা হল দুবার প্রতিফলিত রশ্মির নমুনা — পৃথিবীর বুক থেকে চাঁদে, চাঁদ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে।

চন্দ্রকলার আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বল রশ্মি মৃদু রূপালী আভাকে ম্লান করে দেয়, আর আমরা দেখি না সেটা।

পৃথিবী থেকে পাঠানো রূপালী আভার ঔজ্জ্বল্য মেপে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য বিচার করতে পেরেছেন।

চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখলে মনে হবে ভারি সুন্দর ভাস্বর একটি দেহ।

সৌরমন্ডলের বিন্যাস হিসেবে, অর্থাৎ সূর্য থেকে দূরত্ব হিসেবে তার গ্রহগুলির তালিকা হল: বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল — এগুলির নাম অন্তর্গ্রহ; বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন এবং প্লুটো হল বহির্গ্রহ। বুধ, শুক্র এবং প্লুটো বাদে সবায়ের উপগ্রহ আছে।

এগুলি বড়ো গ্রহ। এ ছাড়া অনেক ক্ষুদে গ্রহ আছে যাদের নাম গ্রহাণুপুঞ্জ বা গ্রহিকা। অন্তর্গ্রহ ও বহির্গ্রহগুলির মধ্যে আছে গ্রহিকার একটা বেষ্টনী।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রহিকারা দলে ভারি হয়: সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তখন একটি কৃত্রিম বা মানুষের সৃষ্ট গ্রহ পাঠান পৃথিবী থেকে।

পৃথিবী থেকে চাঁদে

চুম্বক আর লোহার টুকরোর পরস্পর টান দেখেছ নিশ্চয়ই। এ টানের নাম চুম্বক শক্তি বা চৌম্বকত্ব।

শুধু চুম্বক আর লোহা নয়, বিশ্বজগতের সমস্ত কিছু পরস্পরকে টানে। এ শক্তির নাম মহাকর্ষ। ক্ষুদ্র জিনিসে এ টান দেখা বড়ো কঠিন — পরস্পর পরস্পরকে টানলেও মহাকর্ষ অত্যন্ত কম।

বস্তুর ভর যত বেশি তত বেশি পরস্পরের প্রতি তাদের টান।

শূন্যলোকের সমস্ত দেহের আকার অতি বিরাট, পরস্পরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও তাদের পারস্পরিক টান অতি প্রচন্ড। যে কোনো দূরত্বে মহাকর্ষের শক্তি অনুভব করা যায়; অবশ্য দূরত্ব বেশি হলে সে শক্তি স্বভাবতই কম।

পৃথিবী থেকে চাঁদ ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার দূরে, তবু মহাকর্ষের টানে চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি থাকে এমন শক্তভাবে যে কোটি কোটি ইস্পাতের তারও তেমন করে বেঁধে রাখতে পারত না। সেজন্যই চাঁদ ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে না মহাশূন্যে, তাকে ঘুরপাক দিতেই হবে পৃথিবীকে।

পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। তাকে নিয়েই আমাদের গ্রহনক্ষত্রের পরীক্ষা শুরু করা যাক।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব — ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার — সাংঘাতিক কিছু নয়। আজকের দিনে ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গতিসম্পন্ন যে সব যাত্রীবিমান আছে তাদের কাছে এ সফর অত্যন্ত সহজ।

ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গতিতে গেলে চাঁদে পৌঁছতে লাগবে ৩৮৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ষোলোটা দিন আর রাত্রি। দরকার হবে শুধু যথেষ্ট পরিমাণে খাবার আর জল এবং অবশ্যই পৌঁছনো আর ফিরে আসার মতো জ্বালানি।

তাহলে ওঠা যাক একটা বড়ো যাত্রীবিমানে। যা কিছু দরকার নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। বহিশূন্যের প্রথম অভিযাত্রী আমরা, কী দারুণ ব্যাপার!

ক্রমশ উচ্চলোকে উঠতে লাগল বিমান। উচ্চতা মাপের যন্ত্রে, অল্টিমিটারে, দেখা দিল ৫, ১০, ১৫ কিলোমিটার। পৃথিবীর বস্তুগুলি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে; নদীগুলো আঁকাবাঁকা সরু সুতোর মতো, কালো ছোপগুলো জঙ্গল।

কিন্তু কী ব্যাপার? আর উঁচুতে আমাদের বিমান উঠছে না। ইঞ্জিনগুলো ভীষণ গর্জিয়ে চলেছে কিন্তু একই উচ্চতায় বিমানটা থেকে যাচ্ছে।

'কী হল!' জিজ্ঞেস করলাম ক্যাপ্টেনকে।

'হাওয়া অত্যন্ত পাতলা,' বলল সে। 'ওঠবার মতো শক্তি পাচ্ছে না বিমান।'

আমরা তাকে বললাম, 'যত দূরে যাবো ততই খারাপ। কিছুক্ষণ পরেই হাওয়া বলে কিছু থাকবে না, শুধু ফাঁকা শূন্য, সেখানে বিমান উড়তে পারে না। আগে কথাটা মনে হয়নি কেন আমাদের? নামা যাক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামা যাক; আর এ অযাত্রার কথা কাউকে বলবেন না দোহাই!'

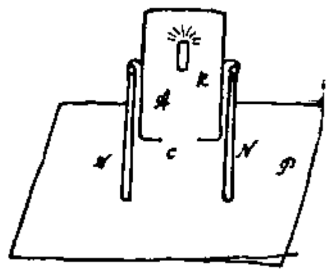
তোমরা হয়ত হো হো করে হেসে বলবে, 'কী ছাইভস্ম লিখছেন যে আপনি! চাঁদে বিমানে করে উড়ে যাবার কথা ভাবে এমন বোকা লোক আছে না কি!'

ঠিকই বলেছ। কী ধরনের যান চাঁদে উড়ে যেতে পারে, আশা করি সেটাও জানো। তার নাম রকেট! আর শুধু রকেটে করেই লোকে বহিশূন্যে যেতে পারবে কেননা একমাত্র রকেটই মহাকর্ষের শক্তি অতিক্রম করতে পারে।

যে মহাকর্ষ নিয়ে এতক্ষণ কথা চলেছে সেটা এখন বোঝালে হয়।

ঘরের ভেতর একটা লাফ দিলে মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসবে মেঝেতে। ক্রীড়াবিদ হাতুড়ি ছুঁড়ল, শূন্যে একটা আর্ক এঁকে কয়েক মিটার দূরে মাটিতে পড়ল সেটা। প্রকৃতির সবকিছুকে টানে পৃথিবী।

এক সময়ে লোকে ভাবত মহাকর্ষের শেকল ভাঙা কখনো চলবে না। প্রায় আশি বছর আগে সুপরিচিত ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্লামারিওন মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে লেখেন তিক্ত



জেলে বসে মৃত্যুর দিন গুনতে গুনতে রকেটযানের ড্রয়িংটি আঁকেন কিবালচিচ।

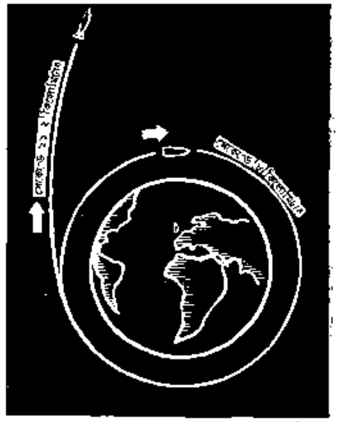
ভাবে: 'এটি এমন একটি নূতন পৃথিবী যেখানে কোনো কলম্বাস কখনো পাড়ি দিতে পারবে না।'

কিন্তু এমন কি তত দিন আগেও মানুষবাহী রকেট যানের কথা কল্পনা করেন রুশ বিপ্লবী নিকোলাই কিবালচিচ। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড দেয় জার সরকার। ফাঁসির আগে কারাগারে জীবনের শেষ কটি দিনে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান তিনি। তখনি রকেটযানের একটা নকসা এঁকে বর্ণনা দেন। রকেটযানের ছবিটা এখানে আছে। কিবালচিচের ফাঁসির পর জার কর্মচারীরা ছবিটা রাষ্ট্রীয় নথিশালায় রাখে, মহান অক্টোবর বিপ্লব ঘটা না পর্যন্ত সেটা থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কখনো কখনো লোকে ভাবে যে হাওয়ায় সোজাসুজি ধাক্কা দিয়ে রকেট এগোয়। এটা ঠিক নয়। উড়ন্ত বিমান ভর করে হাওয়ায়, কিন্তু রকেটের যাত্রায় হাওয়া বাঁধা দেয়। রকেটের ভেতর বারুদ বা অন্য কোনো জ্বালানি পুড়ে পুড়ে গ্যাস তৈরি করে, গ্যাস পেছনে ছুটে গিয়ে সামনে ধাক্কা দেয় রকেটকে। এটা হল জেটচালন নীতি, আর জানোই তো বর্তমান জেট-ইঞ্জিন চালিত অনেক বিমান আছে যেগুলো মহাবেগে চলে।

প্রখ্যাত একজন রুশ বিজ্ঞানী ছিলেন, নাম কনস্তান্তিন ত্সিওলকভস্কি। সারা জীবন তিনি আন্তঃগ্রহ যাত্রার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কি ১৯০৩ সালেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরগামী একটি রকেট-জাহাজের প্রথম ড্রয়িং আর অংক হিসেব ছাপান। পরে তিনি নকসা বানান এমন একটি বহুপর্যায়ী রকেটের যেটি পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করতে পারে। কয়েকটি অংশ বা পর্যায়ে এর গঠন। প্রথম পর্যায়ের জ্বালানি পুড়ে রকেটকে শূন্যে পাঠাবে কিন্তু সাংঘাতিক বেগে নয়। জ্বালানি সব পুড়ে গেলে এ পর্যায়টি খসে পৃথিবীতে পড়বে। তখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ, অনেকটা হালকা-হয়ে-যাওয়া রকেটের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে। এ পর্যায়টি খসে পৃথিবীতে পড়লে তৃতীয় পর্যায়টি চালু হবে, রকেটের গতিবেগ হবে অতি দ্রুত। শেষ পর্যায় যে গতিবেগ সঞ্চয় করবে তাতে আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। প্রমাণ হয়েছে যে অত্যন্ত উচ্চ বেগে পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করা যায়।

লাফিয়ে লোকে ফিরে আসে মেঝেতে, উৎক্ষিপ্ত হাতুড়ি পড়ে মাটিতে। কেন এমনটা হয়? বহিঃশূন্যে চলে যাবার মতো যথেষ্ট বেগ তাদের নেই বলে।



কিন্তু মনে রাখা দরকার যে লাফ-মারা লোকটি মাটি থেকে দু এক মিটার উঠেছিল, হাতুড়িটি দশ থেকে বিশ মিটার আর গোলাটি কয়েক কিলোমিটার। তার কারণ লাফ-মারা লোকটির চেয়ে হাতুড়ির গতিবেগ ছিল অনেক বেশি আর হাতুড়ির চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিল গোলার বেগ।

সবচেয়ে দূরপাল্লার কামানের গোলা সেকেণ্ডে প্রায় দু কিলোমিটার বেগে কামানের মুখ থেকে বেরোয়। বেগটা বেশ। এ গতিবেগে লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কোয় যাওয়া যায় মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। তবু পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যাবার পক্ষে এ বেগ যথেষ্ট নয়। গোলাটি শূন্যে বিরাট একটা আর্ক এঁকে আবার পৃথিবীতে নেমে আসবে।

হিসেব করে ত্সিওলকভস্কি দেখলেন যে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বেগ পেলে রকেট আর ফিরে মাটিতে পড়বে না, পৃথিবীকে আবর্তন করে পরিণত হবে উপগ্রহে বা মানুষের হাতে-গড়া চাঁদে। এই বেগেই প্রথম সোভিয়েত স্পুৎনিকগুলিকে ছাড়া হয়। এর নাম বৃত্তাকার বেগ, কেননা এতে উপগ্রহ পৃথিবীকে চক্রমণ করে, পৃথিবীকে ছেড়ে যায় না।

সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগ পেলে রকেট পৃথিবীর টান পেরিয়ে চাঁদ, মঙ্গল বা যে-কোনো গ্রহের দিকে যেতে পারে। এ বেগের নাম প্রয়াণ বেগ।

চন্দ্রপথের প্রথম পথিক হল ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উৎক্ষিপ্ত মহাশূন্য রকেট। চাঁদকে অতিক্রম করে এটি সূর্যের গ্রহে পরিণত হল — সৌরজগতের প্রথম কৃত্রিম গ্রহ। ব্যাপারটার গুরুত্ব এত বিরাট যে এ বিষয়ে আরো কিছু বলব পরে।

এখন কল্পনা করো চাঁদের দিকে মানুষের প্রথম যাত্রার দিন এসে পড়েছে। আন্তঃগ্রহ প্রথম রকেটযানের আরোহী আমরা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিসীমা অতিক্রম করে রকেটযান থামবে না। বরং বাধা দেবার মতো বাতাস নেই বলে এর গতি হবে দ্রুততর। রকেটযানের গতিবেগ বাড়াতে হবে ক্রমে, যাতে ঝাঁকুনি ঝাপ্টা না লাগে। ট্রামগাড়ি হঠাৎ এগোলে কী দশা হয় জানো তো — যাত্রীরা পেছনে ছিটকে পড়ে।

পৃথিবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতে পরিচালিত হবে আমাদের রকেট। রকেটের যন্ত্রপাতি সে-সব সঙ্কেত মেনে চলবে, গতিবেগ বাড়বে মসৃণ ও নিয়মিতভাবে, সঙ্কেত-নির্দিষ্ট পথে চলবে রকেট।

মহাশূন্যে ক্রমশ দ্রুত চলেছে আমাদের রকেট। পৃথিবী পড়ে আছে অনেক পিছনে, রকেটের গতিবেগ এখন ঘণ্টায় ২৫ হাজার কিলোমিটার। এতো সাংঘাতিক গতিবেগ, যাত্রীদের ক্ষতি হবে না তো? এতটুকু না। গতিবেগ যতই হোক না কেন সমান থাকলে মানুষ অনুভব করে না। শুধু হঠাৎ ঝাঁকুনি তার পক্ষে ক্ষতিকর।

অবশেষে প্রয়োজনীয় বেগ লাভ করল রকেট, থেমে গেল মোটর, কেননা জ্বালানি খরচা করতে হবে বুঝেসুঝে। এখন প্রায় সমান বেগে চলবে রকেটের যাত্রা, বরফের আয়নার মতো চকচকে বুকে ছোটো স্কেটারের মতো।

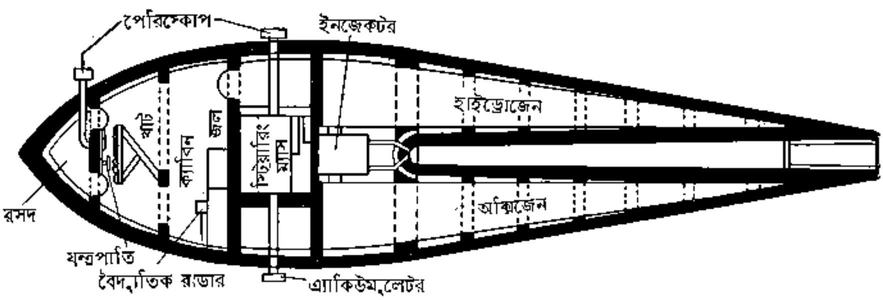
বরফ যতই মসৃণ হোক, হাওয়ার বাধা আর স্কেটের ঘষড়ানিতে স্কেটারের গতিবেগ কমে।

কিন্তু ফাঁকা মহাশূন্যে রকেটের বেগ কমাতে পারে এমন কী-ই বা আছে? পৃথিবীর মহাকর্ষ। পৃথিবী থেকে বহুদূরে গিয়েও পৃথিবীর টান অনুভব করছে রকেট আর এ টান চলতে থাকবে। অবশ্য পৃথিবী আর রকেটের দূরত্ব যত বাড়বে তত কমে যাবে সে টান। পৃথিবী ছাড়ার সময়কার টানের চেয়ে এখন অনেক কম, তবু রকেটের বেগ কমানোর পক্ষে যথেষ্ট।

পৃথিবী ও সূর্য থেকে রকেটটি যদি মহাকর্ষের আওতাবিহীন দূরে গিয়ে পড়ে তাহলে কোটি কোটি বছর ধরে মহাশূন্যে চলবে তার উদ্দাম নিরুদ্দেশ যাত্রা, যদি না আকর্ষণকারী কোনো দেহের কাছাকাছি এসে পড়ে।

আমাদের যাত্রা কিন্তু খুব দীর্ঘ হবে না। পৃথিবী ছাড়ার সময়ে আস্তে আস্তে বেগ বৃদ্ধি আর চাঁদের কাছাকাছি এসে ক্রমশ বেগ হ্রাস — সমস্ত নিয়ে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা লাগবে।

মহাশূন্য-রকেটের গলুই-এ ছোট ছোট গোল জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে পারে যাত্রীরা, জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে যেমন। বিশেষ ধাঁচের কাচে জানলাগুলো তৈরি,



আন্তঃগ্রহ রকেটের ডিজাইন।

খুব পুরু, ইস্পাতের চেয়ে শক্ত। চাঁদের সন্নিকটে এসে সবাই ভালো করে দেখার জন্য উদগ্রীব।

তুমি আমি চলো বসি খালি একটা জানলার ধারে। চাঁদের বহির্ভাগের মানচিত্র যেখানে টাঙানো তার পাশের জানলাটা চমৎকার। এখান থেকে চাঁদকে দেখে মানচিত্রে আঁকা নানা জায়গা মিলিয়ে নিতে পারি।

এখন তো চাঁদকে বেশ বড়ো দেখাচ্ছে, পৃথিবী থেকে অত বড়ো ঠেকে না। এ থেকে বোঝা গেল অর্ধেক পথ এরি মধ্যে অতিক্রম করেছি। এখনো চাঁদের চেহারাটা চেপটা একটা চাকতির মতো, অনেক কালো ছোপসুদ্ধ প্রকান্ড একটা রুপোর টাকা যেন। কিন্তু যত কাছে আসি তত বেশি চোখে পড়ে চাঁদের উত্তল চেহারা। মনে হয় কেন্দ্রটা ঝুঁকে এগিয়ে আসছে আর চাকতির কিনারাগুলো সরে যাচ্ছে। অচিরে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদ ফাঁকা কালো মহাশূন্যে স্বচ্ছন্দে ঝুলন্ত একটা বিরাট বল বা গোলক, আর আমাদের কাছ থেকে অসম্ভব দূরে হাজার হাজার তারার দীপ্তি।

আর একটা মজার আবিষ্কার করা গেল: তারাগুলো দপদপ করে জ্বলছে না, ওগুলো হল উজ্জ্বল আলোর ক্ষুদে ক্ষুদে ছোপ। এত ছোট যে তাদের ব্যাস মাপা যায় না। পৃথিবী থেকে দেখলে শুধু মনে হয় তারাগুলো দপদপ করছে।

গ্রীষ্মের গরম দিনে হাওয়ার কাঁপন আর ঝিলিমিলি দেখেছ নিশ্চয়ই। ঝিকঝিকে হাওয়ায় মনে হয় জিনিস সব কাঁপছে, তাদের বাহির-রেখা বিকৃত হয় একটু।

তারার দিকে যখন চাই তখন একই ব্যাপার, কেননা পৃথিবীর উপরকার বাতাস শান্ত থাকে কদাচিৎ। এতে তারার বাহ্য আকার বদলে যায়, মনে হয় ছড়িয়ে পড়ে তারা আরো বড়ো হচ্ছে, আর তত উজ্জ্বল নয়।

মহাশূন্য-রকেট থেকে নক্ষত্রখচিত আকাশ কী সুন্দর দেখায়। এ সৌন্দর্যের তুলনা নেই কোথাও। কিন্তু আপাতত আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ চাঁদে, ক্রমশ বড়ো হওয়া বিরাট গোলকটিতে।

অদ্ভুত এ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে কোনো ভুল করিনি — সমস্তক্ষণ নতুন কিছু না কিছু আমাদের চোখে পড়ছে।

পৃথিবী থেকে খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকালে কয়েকটা কালো ছোপ নজরে পড়ে। দূরবীক্ষণ উদ্ভাবনের আগে লোকে ঠিক জানত না এগুলো কী। নানা খেয়ালী কথা বলা হয়েছে; সবচেয়ে চলতি এই যে চাঁদ হল মানুষের মুখ, চাঁদ-মামা। খুব পুরনো মানচিত্রে নাক চোখ আর মুখসুদ্ধ চাঁদের ছবি আঁকা হয়েছে।

আমাদের পোর্টহোল থেকে দেখলাম চাঁদের বুকে পাহাড়ের শ্রেণী, চূড়াগুলো আলোকিত সূর্যালোকে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কয়েকটা অদ্ভুত পাহাড় দেখে হতবাক —



চাঁদের গিরিগহ্বর।

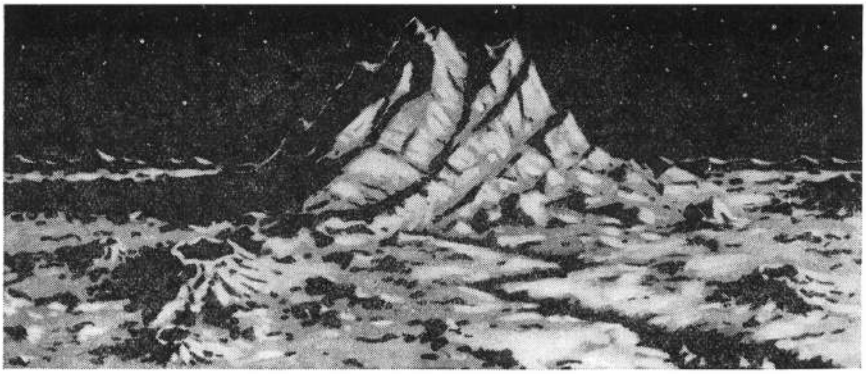
এগুলো হল আগ্নেয়গিরির মুখবিবর ও প্রাকৃতিক এ্যাম্ফিথিয়েটার। চান্দ্র আগ্নেয়গিরির আকার আমাদের আগ্নেয়গিরির মতোই কিন্তু আয়তনে তারা কয়েক ডজন গুণ বড়ো। চূড়া কেটে ফেলা পাহাড়ের মতন চেহারা, চূড়ার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোল ফাঁকা জায়গা, তার মাঝে কখনো কখনো দীর্ঘ ছুঁচলো টিলা।

আগ্নেয়গিরির মুখবিবরের চেয়েও প্রাকৃতিক এ্যাম্ফিথিয়েটারগুলো বড়ো; আঙটির মতো উঁচু প্রাকার ঘেরা বৃত্তাকার সমভূমি যেন। এদের কয়েকটা এত বিরাট যে সুইজারল্যাণ্ডের মতো ছোট একটা দেশ জায়গা পেতে পারে।

চান্দ্র আগ্নেয়গিরি আর এ্যাম্ফিথিয়েটারগুলির সংখ্যা গোণার চেষ্টা করি। এক, দুই. তিন ... দশ ... বিশ ... পঞ্চাশ ...

না, গোণা অসম্ভব, ওদের সংখ্যা হাজার হাজার। কিন্তু আমাদের তৈরি চাঁদের মানচিত্রে সবকটা আছে, প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা নাম: কোপের্নিকাসের আগ্নেয়গিরি, গালিলিওর আগ্নেয়গিরি, টলেমির এ্যাম্ফিথিয়েটার ... অধিকাংশের নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সম্মানার্থে।

কিন্তু এ কী? রকেটযানে আর নিঃসাড় স্তব্ধতা নেই: বিরস বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে জাহাজের খোল। একেবারে পায়ের নিচে তার শব্দ পেলাম। বলো তো কী ব্যাপার? গলুইতে রকেট মোটরগুলো চলতে শুরু করেছে, ব্রেক কষে রকেটের গতিবেগ কমানোর জন্য। চাঁদের কাছে যে গতিবেগে এসেছে, সেকেণ্ডে সেই ২·৪ কিলোমিটার বেগে চাঁদে নামলে রকেটটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।



চাঁদে মাউণ্ট পিকো।

গতি কমানোর হার বেড়ে যাওয়াতে সামনে অদম্য টান পড়ল আমাদের। দেয়ালে লাগানো শক্ত বেল্ট চেপে ধরলাম পড়ার ভয়ে।

চাঁদের জ্যোতি আর নেই, বিরাট কালো একটা মেঘ আকাশের প্রায় সমস্তটা জুড়ে যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

আমরা ত্রস্ত — প্রথম যাত্রীবাহী রকেটের চাঁদে অবতরণ ব্যাপারটা দাঁড়াবে কেমন?

চাঁদ কাছে এল আরো, কিন্তু ক্রমশ মন্থর গতিতে। এখন একেবারে পায়ের নিচে এসে পড়েছে, দেখতে হলে যেতে হবে রকেটযানের মধ্য ভাগে যেখানে ক্যাবিনের মেঝেতে পোর্টহোল আছে।

মনে হল চাঁদের পিঠে রকেট পড়ে যাচ্ছে।

এখন চাঁদ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার ঊর্ধ্বে আমরা। আমাদের নিচে বিরাট ফাটলে ইতস্তত দীর্ণ এবং দূরবর্তী পাহাড়ের ছোপ গায়ে মহায়তন একটা অন্ধকার সমভূমি।

হঠাৎ লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর:

'আমরা এখন ঝড়-মহাসমুদ্রের ঠিক ওপরে। ওখানে নামব। নামার জন্য সবাই তৈয়ার থাকুন। বেল্টগুলো শক্ত করে পাকড়ান!'

ঝড়-মহাসমুদ্র! তার মানে জলে নামব? দেখে তো তা মনে হয় না: কোথাও কোনো হ্রদ চোখে পড়ে না, ছোট নদী পর্যন্ত নয়।

যাত্রীদের একজন হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ককেশ প্রফেসর। নামটার ব্যাখ্যা তিনি দিলেন।

'চাঁদের দিকে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঘুরিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখেন, এটা একটা সমগ্র জগৎ, তাতে আছে পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরির মুখবিবর আর প্রকাণ্ড কালো কালো ছোপ। কালো ছোপগুলো চাঁদের সমভূমি কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবতেন ওগুলো সাগর ও মহাসাগর। তাই আমাদের তৈরি চাঁদের মানচিত্রে আছে ঝড়-মহাসাগর, বৃষ্টি-সাগর, স্বচ্ছতা-সাগর, পচা জলাভূমি ইত্যাদি ... ইংরেজি চান্দ্র মানচিত্রে নামগুলো সাধারণত ল্যাটিনে দেওয়া হয়েছে, যেমন *Oceanus Procellarum, Mare Imbrium* ইত্যাদি। আসলে কিন্তু চাঁদে ছিটেফোঁটা জল নেই। নিজের চোখেই দেখবে এখনি।'

ইতিমধ্যে চাঁদের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে আমাদের রকেট-জাহাজ। রকেটের দেহ থেকে প্রকাণ্ড কী সব বেরিয়ে এল, পায়ের মতো অবতরণের খুঁটি, ধাক্কার জোর কমাবার জন্য শক্তিশালী স্প্রিঙ শক-এ্যাবসর্বার তাতে লাগানো। অকস্মাৎ একটা ধাক্কা, বেল্ট ছেড়ে আমরা এ ওর ওপর গড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে... রকেট-জাহাজ থেমে দাঁড়িয়ে আছে।

আবার লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেনের উল্লসিত কণ্ঠস্বর: 'নিরাপদ অবতরণের জন্য প্রথম চান্দ্র অভিযানকে অভিনন্দন জানাই! জাহাজ থেকে নামার জন্য তৈয়ার হোন!'

অদ্ভুত বিজাতীয় এ দেশে কী দেখব আমরা?

চাঁদে

জাহাজ ছাড়ার জন্য তৈরি হতে বললেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু কী ধরনের প্রস্তুতি দরকার?

আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে চাঁদে বায়ু নেই। অল্প একটু বেড়িয়ে আসার জন্য আন্তঃগ্রহ যাত্রী কেউ রকেট-জাহাজ ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য। তার ভেতরকার বায়ু বেড়ে ফাঁকা মহাশূন্যে বেরিয়ে যাবে, ফুসফুস ও ভিতরকার অন্যান্য অঙ্গ যাবে ফেঁসে।

কিন্তু এমন বেপরোয়া কাজের কথা কেউ ভাবে না। বিশেষ একটি মহাশূন্য-পোষাক অভিযানের প্রত্যেকের মাপসই করে বানানো হয়েছে; দেখতে অনেকটা ডুবুরীদের পোষাকের মতো। আসলে সামনে কাঁচ লাগানো হেলমেটসুদ্ধ পোষাকগুলি ডুবুরী-পোষাকের চেয়ে অনেক ভালো। ডুবুরী যখন জলের নিচে নামে তার হেলমেটে লাগানো থাকে একটা দড়ি বা কেব্ল্, ডুবুরী তাই সর্বদা 'দড়ি বাঁধা'।

চমৎকার জিনিস আমাদের মহাশূন্য-পোষাক। এটা পরে যেখানে খুশি যাওয়া চলে, কেননা এতে নিশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ আর নিশ্বাসে নির্গত কার্বোনিক এ্যাসিড গ্যাস শোষণের জন্য নানা রাসায়নিক দ্রব্য আছে। হেলমেটের অভ্যন্তরের হাওয়া সর্বদা তাজা আর সহজ গ্রাহ্য।

হেলমেটের সামনের দিক অর্থাৎ মুখটা পাতলা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত কাচের, যে কাচ ভাঙে না। ভেতরে ক্ষুদে একটা রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের দৌলতে সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পারি; প্রত্যেকটা রেডিও একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বাঁধা। ক্ষুদে অথচ শক্তিশালী ব্যাটারি থেকে তার গিয়েছে পোষাকের বায়ু ও জলনিরোধী বস্ত্র উপাদানে, তাতে উত্তাপ টিকে থাকে, প্রচণ্ড শৈত্যকেও ভয় পাবার কারণ নেই। দরকার মতো তাপকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে।

চমৎকার পোষাক বটে! তবু আতঙ্কে একবার সেটার দিকে তাকালাম। কী বেঢপ দেখতে! এ পোষাকে খোলসের মধ্যে কচ্ছপের মতো হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরতে হবে।

আমাদের দ্বিধা দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর হেসে উঠলেন।

'ভয় পাবেন না, পোষাকটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। হাঁটা কেন, ওটা পরে গঙ্গাফড়িঙের মতন লাফাতে পারবেন।'

সবাই তৈয়ার হল, এবার নির্গমনের পালা। সত্যি, হাঁটতে একেবারে কষ্ট হচ্ছে না। সারা শরীরে একটা ঝরঝরে ভাব, মনে হল আমাদের পেশীগুলো আরো জোরালো হয়েছে।

দরজার কাছে এলাম। ট্রামগাড়ি, এমনকি যাত্রীবিমানের মতো মামুলি দরজা নয়। দরজাটা গোটা একটা ঘরের সামিল। ক্যাবিন থেকে সে ঘরে ঢুকলাম, ক্যাপ্টেন সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হ্যাঁ, ভাবলাম, রকেট থেকে হাওয়া ঝটকায় যাতে বেরিয়ে না যায় তাই এটা তিনি করলেন। তারপর পাম্পগুলো কাজ শুরু করল, আমাদের নির্গমনপথ থেকে মূল্যবান হাওয়া বের করে দিতে লাগল। দরজাটার নাম এয়ারলক বা বায়ুবন্ধ। এবার বাইরের দরজাটা খোলা হল, মই বেয়ে নেমে পা দিলাম চান্দ্র মাটিতে।

ওখানে ওটা কী? আমাদের আগেই কে যেন এখানে এসেছে, চাঁদে প্রথম মানুষ আমরা নই! দূরে ঠিক আমাদের রকেটযানের মতোই আর একটা পালিশ-করা জিনিস রোদে ঝকঝক করছে।

'ক্যাপ্টেন!' সবাই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আপনি না বলেছিলেন...'

হাত তুলে ক্যাপ্টেন থামালেন আমাদের, যেখানে আমরা অবতরণ করেছি ঠিক সেইখানেই চাঁদে আর একটা রকেটের উপস্থিতি ক্যাপ্টেন কী করে বোঝাবেন দেখা যাক।

'উত্তেজিত হবেন না,' বললেন তিনি। হেলমেটে স্পষ্ট শোনা গেল তাঁর গলা। 'সবকিছু ঠিক আছে। এটা একটা সোভিয়েত রকেট, এখানে রয়েছে মাস ছয়েক।'

'এত দিন? তবে লোকজন কোথায়?'

হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

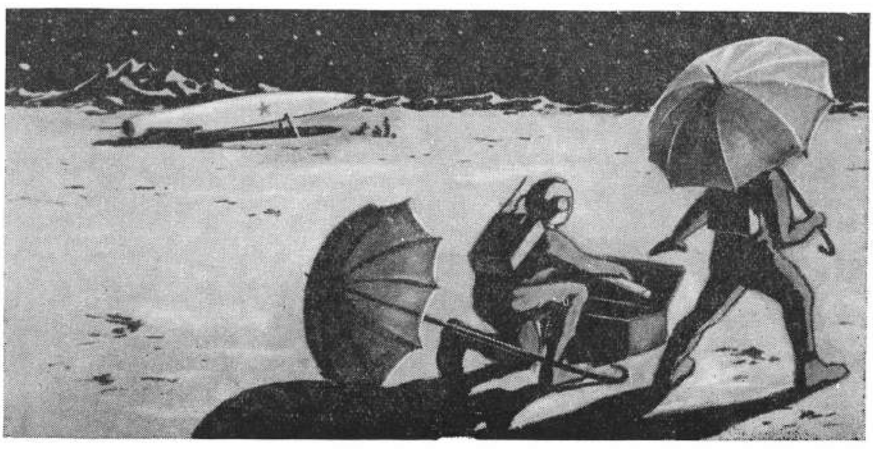
'লোকজন নেই। যে রেডিও-সঙ্কেত মেনে আমরা এসেছি, ঠিক সে-রকম সঙ্কেত অনুসারে মহাশূন্য হয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদে এসেছে স্বয়ংক্রিয় রকেটটা। এটা পাঠানো হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে, পথে ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো আপনা থেকে বেগ বাড়িয়েছে বা কমিয়েছে। ক্যাপ্টেন ছিলেন পৃথিবীতে বিশেষ পাইলটের একটা ক্যাবিনে। ক্যাবিনটা ঠিক আমাদের রকেটের ক্যাবিনের মতো।'

'আর তিনি কে?'

'আমিই। সত্যি বলছি আপনাদের, স্বয়ংচালিত রকেট নামার বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরীক্ষাটা খুব কড়া: অবতরণের সময়ে ভেঙে চৌচির হলে আমাদের অভিযান অনেক বছর পিছিয়ে যেত। চলত আরো গণনা, পরীক্ষা আর পরীক্ষামূলক ওড়া। মারা যাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে আমাদের সরকার চাঁদে লোক পাঠাতেন না। কিন্তু সব ঠিকমতো চলল, নামল রকেটটা — 'চন্দ্রগত হল' বলা চলে না — কিম্বা হয়ত বলা চলে, কী মনে করেন? 'চন্দ্রগত হল' নিরাপদে আর ঠিক এক সেকেণ্ড পরেই রকেটের সেল্ফ-রেকর্ডিং যন্ত্র থেকে এল সঙ্কেত।'

'কী মজার! আরো বলুন, ক্যাপ্টেন, বাধা দিয়েছি বলে লজ্জিত।'

'আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে হাতে দিলেন ডিপ্লোমা, মহাশূন্য-পোতের পাইলটের সার্টিফিকেট সেটা। আর তাই আমরা সবাই এখানে হাজির হয়েছি। যাক গে, শুনুন। আমার রেডিও নির্দেশ মেনে স্বয়ংচালিত রকেটটা, অটোরকেটটা, ক্ষুদে একটা ট্যাঙ্ক ছাড়ল। কয়েক শ ঘণ্টা চালানোর মতো জ্বালানি তাতে ছিল। ওটা আমার রেডিও নির্দেশে চলে চাঁদের এ অংশটাকে চক্কর মারল, তারপর তার



টেলিভিশন-ট্রান্সমিটার থেকে ঝড়-মহাসাগরের একটা নিখুঁত ছবি পেলাম। দেখা গেল অবতরণের পক্ষে জায়গাটা খাসা। ইচ্ছে করেই অটোরকেটের কাছে নেমেছি, ওর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জ্বালানি, খাবার আর জল আছে; আমাদের যাত্রীবাহী জাহাজটায় এতখানি মাল নেওয়া যেত না। সবচেয়ে বড়ো কথা হল — ট্যাঙ্কটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে, চাঁদের উপরিভাগে অনুসন্ধান চালানো যাবে ওটাকে দিয়ে।'

'হুররে!' একসঙ্গে আমরা সবাই হাঁক ছাড়লাম। 'আমাদের চান্দ্র সঙ্গীকে দেখা যাক, অনেক কাজ দিয়েছে জিনিসটা।'

'আর ভবিষ্যতেও অনেক কাজ দেবে,' যোগ করলেন ক্যাপ্টেন।

রওনা হলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ থামতে হল। কী মুস্কিল! বড়ো একটা ফাটল বা খাদ সামনে, যাবার উপায় নেই। প্রায় ত্রিশ মিটার গভীর, চওড়ায় সাত মিটার, যতদূর চোখ যায় ডাইনে আর বাঁয়ে তার বিস্তার। এটাকে পেরিয়ে বা ঘুরে যাবার সাধ্য নেই আমাদের। কিংকর্তব্য? ব্রিজ একটা বানাতে হবে না কি? কী দিয়ে বানাবো?

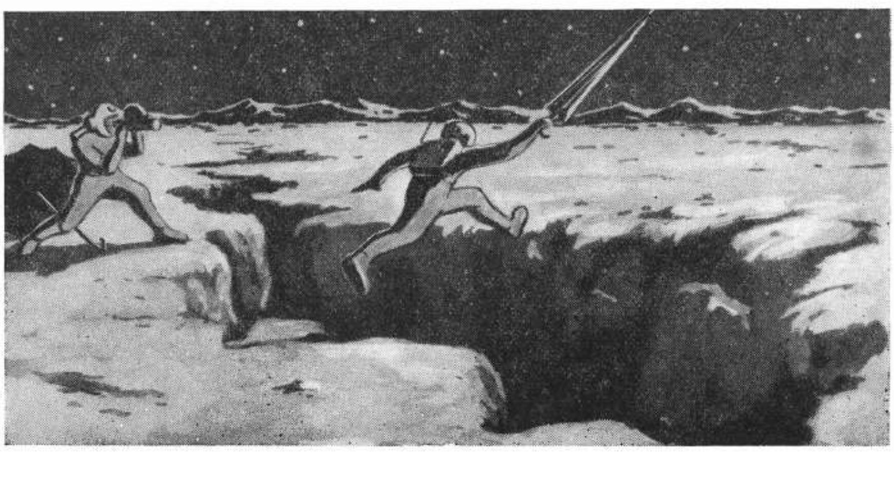
কিন্তু ব্যাপার দেখ তো! গভীর খাদটার দিকে বৃদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী চটপট দৌড়িয়েছেন, যেন লাফিয়ে পার হবার মতলব।

'মারা পড়বেন, মারা পড়বেন আপনি!' চেঁচিয়ে তাঁর দিকে হাত নাড়তে লাগলাম আমরা।

কিন্তু প্রফেসর একটা লাফ মারলেন, অনায়াসে খাদটা পার হয়ে খাড়া পাড়ের প্রায় পাঁচ মিটার দূরে নামলেন ধীরে।

তারপর আমাদের দিকে ঘুরে চেঁচালেন:

'আমার দেখাদেখি লাফ মারুন!'



ভড়কে গেলাম বটে, তবে লাফ মেরে খাদটা পার হলাম পাখির মতো। একটি খেলুড়ে লোক এমন লাফ দিলেন যে প্রথম খাদটা ছাড়িয়ে প্রায় আট মিটার দূরে আর একটা খাদে গিয়ে পড়লেন। কপাল ভালো, এ খাদটা তত গভীর নয়। কোনো চোট লাগল না তাঁর। কিছুক্ষণ পরেই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন, নিজের এ্যাডভেঞ্চার নিয়ে তাঁর কী হাসি!



চাঁদে মানুষের ওজন (স্প্রিঙের ওজন-যন্ত্রে)।

আমরা সবাই প্রফেসরের দিকে চাইলাম।

'ব্যাপারটা কী বলুন তো? এতখানি লাফিয়ে এলাম কী করে?'

'পৃথিবীর চেয়ে চাঁদ অনেকখানি ছোট, মহাকর্ষও কম,' প্রফেসর বললেন। 'পৃথিবীর তুলনায় এখানকার মহাকর্ষ শক্তি ছ গুণ কম, তার মানে সবকিছুর ওজন ছ গুণ কম। পৃথিবীতে আমার ওজন ষাট কিলোগ্রাম, এখানে মাত্র দশ। কিন্তু মাংসপেশীগুলো আছে ঠিক আগের মতো। তাই পৃথিবীতে যতখানি তার ছ গুণ বেশি লাফাতে পারি এখানে। তার ওপর, এখানে হাওয়া নেই, তাই বস্তুর গতিতে বাধা পড়ে না।'

ব্যাপার সাপার যা তাতে সবাই বেজায় খুশি। মালুম হল, একেবারে কিছু না করেই আমাদের শক্তি ছ গুণ বেড়ে গিয়েছে।

চান্দ্র মাটিতে খোশমেজাজে আর রোয়াবে পা দিয়ে কৌতূহলী চোখে চারদিকে তাকালাম। শুধু ধুধু বিরস সমভূমি, ধুলোয় ভরা। ধুলো ওড়ে, তারপর নেমে আস্তে আস্তে বসে যায়। ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করার হাওয়া নেই। সূর্যালোকে কালো-বাদামী মাটি এত চকচকে যে তাকালে কষ্ট হয়।

আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের চেনা সূর্যদেবকে। পৃথিবী থেকে দেখতে যেমন, হুবহু তাই। কেন তা বোঝা কঠিন নয়: সূর্য থেকে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব অত্যন্ত কম। এক হাজার মিটার এবং ৯৯৮ মিটার দূর থেকে একটা টেলিগ্রাফের খুঁটি দু জনের কাছে সমান আকারের মনে হবে।

আকাশের চেহারাটা কিন্তু বেশ আলাদা। আসার আগেই জানতাম যে চাঁদের আকাশ হল কালো, কিন্তু এখন দেখছি অনেক তারা, যেগুলো সূর্যালোকে অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

সবচেয়ে ছোট তারাগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান, এমন কি সূর্যগোলকের কাছের তারাগুলোও। পৃথিবীতে বায়ুকণা সূর্যের আলোয় দীপ্ত হয়ে তারাদের আলো ঝাপসা করে দেয় বলে দিনের বেলায় আমরা তাদের দেখি না। কিন্তু চাঁদে বাধা দেবার মতো কিছুই নেই, তাই সবচেয়ে অপ্রখর তারার রশ্মিও চোখে পড়ে।

দিগন্তে বেশ নিচুতে আলম্ব উজ্জ্বল বড়ো কাস্তেটা কী? পৃথিবী থেকে দেখা চাঁদের কাস্তের মতো চেহারা, কয়েক গুণ বড়ো এই যা।

কোনো একটা গ্রহ না কি?

গ্রহই বটে। ওটা হল আমাদের আপন পৃথিবী, যে পৃথিবী ছেড়ে এসেছি। কপালগুণে ছেড়ে এসেছি অল্প সময়ের জন্য। চাঁদ থেকে দেখছি পৃথিবীকে, নিজের উপরিভাগে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি পৃথিবী পাঠাচ্ছে আমাদের দিকে। নিজের চোখে দেখলাম, পৃথিবী হল একটি জ্যোতিষ্ক; চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং অন্যান্য গ্রহদের মতোই একটি জ্যোতিষ্ক।

পৃথিবীর কাস্তেকে প্রাণভরে তারিফ করা হয়েছে। এবার অটোরকেটকে দেখতে হবে।

পায়ের ওপর বেশ স্থিরভাবে অটোরকেট দাঁড়িয়ে। এক পায়ের একটা বোতাম টিপলেন ক্যাপ্টেন। এ্যালুমিনিয়ম এ্যালয়ের একটা হালকা সিঁড়ি সড়সড় করে নেমে এল, ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাবি দিয়ে দরজা খুললেন। পিছু পিছু আমরা ঢুকলাম রকেটে, মনে অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে।

ভেতরে নতুন কিছু চোখে পড়ল না। শুধু যেখানে যাত্রীরা বসে সেখানে জ্বালানি, খাবার আর জল রাখা হয়েছে। পাইলটের ক্যাবিন আমাদের রকেটে যেমন। সবকটা যন্ত্রপাতিতে বিশেষ রিলে আছে যেগুলো পৃথিবী থেকে পাঠানো রেডিও-সঙ্কেত ধরে বাড়িয়ে চালান করে রকেটের যন্ত্রে।

এবার বাড়ি গেলে হয়!' ক্যাপ্টেন বললেন। 'রাতের খাওয়া সেরে শোওয়া যাবে!'

'শোওয়া, মানে? সূর্য তো এখনো বেশ উঁচুতে!'

প্রফেসর কথাটা শুনে হেসে উঠলেন।

'সূর্যাস্তের জন্য সবুর করে থাকলে ঘুমোনো চলবে না অনেকক্ষণ। চান্দ্র দিনের মেয়াদ পৃথিবীর হিসেবে ৩৫০ ঘণ্টা। সূর্য দিগন্তের দিকে চলেছে বটে, তবু অস্ত যেতে যেতে কয়েকটি পার্থিব দিন কেটে যাবে।'

চাঁদের দিন এত দীর্ঘ কেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন রকেটে ফেরা না পর্যন্ত বলবেন না।

বিরাট রকেটযানের কাছে এলাম, বাইরের দরজা খুলে ক্যাপ্টেন আমাদের ঢোকালেন, ঢোকার সময়ে একে একে আমাদের গুণলেন, সবাই ফিরেছে কিনা জানার জন্য। তারপর বাইরের দরজা বন্ধ করে, লক-এ হাওয়া আনার জন্য পাম্প চালালেন। তখনি শুধু জাহাজের

ভিতর-দরজা খুলে দিলেন। মহাশূন্য-পোষাক খুলে মনে হল আড়মোড়া ভাঙাটা কী মধুর ব্যাপার — এ পোষাকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি অস্বচ্ছন্দ গতিতে।

রাতের খাবার খেয়ে আরামী কোল্যাপ্সিব্ল বাঙ্কে শুয়েছি, প্রফেসর চাঁদের বৃত্তান্ত শোনালেন।

'চাঁদ একটা দিক সর্বদা পৃথিবীর দিকে রাখে, সেটাকে আমরা বলি চাঁদের মুখ। কিন্তু চাঁদ শুধু পৃথিবীকে মুখটা সর্বদা দেখায় কেন? কারণ, দীর্ঘ কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় নিজের মেরুদণ্ডে মাত্র একটা পাক খায় চাঁদ। ব্যাপারটা যদি স্পষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। দু রঙের একটা বল নাও — এক দিক লাল, অন্য দিকটা নীল। টেবিলের ওপরের দোয়াতদানটা ধরো আমাদের পৃথিবী। এবার দোয়াতদানের চারদিকে বলটা এমন ভাবে ঘোরাও যাতে লাল গোলার্ধটা সব সময় তার দিকে থাকে। দেখবে যে, দোয়াতদানের চারদিকে ঘোরাবার সময় হাতে বলটা নিজের মেরুদণ্ডে পুরো একটা পাক খাবে। অন্য জিনিস দিয়েও পরীক্ষা করতে পারো। যেমন, দোয়াতদানের চারদিকে একটা ঘড়ি এমন ভাবে চালাও যাতে ছয়ের সংখ্যাটা সব সময়ে দোয়াতদানের দিকে থাকে। যে সময়টাকে আমরা পৃথিবীর মানুষেরা বলি চান্দ্র মাস সেটা চাঁদের মানুষ বলবে চান্দ্র দিন, অবশ্য চাঁদের মানুষ যদি থাকে। চাঁদের রাত্রি আর দিনের দৈর্ঘ্য সাড়ে উনত্রিশ পৃথিবী-দিনের সমান, আলোআঁধারে, রাত্রিদিনে সেটা সমান ভাবে বিভক্ত।'

'তাহলে এখানকার রাত মানে ৩৫৪ ঘণ্টা?'

'ঠিক তাই। নিজেরাই দেখবে।'

পাটিগণিতের সহজ একটা গুণফলে অবিলম্বে আমরা বুঝলাম যে গোটা একটি পৃথিবী-বর্ষে আছে প্রায় তেরোটা চান্দ্র দিন মাত্র। চাঁদে লোক থাকলে তারা গোটা বছরে দেখত তেরোটা সূর্যোদয় আর তেরোটা সূর্যাস্ত মাত্র।

আজকে যা-সব দেখেছি তা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ঘুম এল না চোখে।

চাঁদে অনুসন্ধান

অভিযানের সকলের জন্য ক্যাপ্টেন কড়া একটা সময়সূচী ঠিক করে দিয়েছেন: ষোলো ঘণ্টা জাগরূন, আট ঘণ্টা নিদ্রা।

শুরু হল চাঁদে আমাদের অনুসন্ধান। ভূতত্ত্ববিদরা লাগলেন খনিজ পদার্থের খোঁজে, নক্ষত্র আর পৃথিবী নিয়ে পড়লেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর ক্যাপ্টেন নিজের লোকদের একজনকে নিয়ে গভীর খাদ আর আগ্নেয়মুখ বিবরে দুঃসাধ্য কয়েকটা অবতরণ সারলেন।

১৯৪৮ সালে সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউ. লিপ্‌স্কি আবিষ্কার করেন যে চাঁদে আবহমণ্ডল বর্তমান। তাঁর হিসেবে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের চেয়ে এটা প্রায় দু হাজার গুণ অনিবিড়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এমন কি এত বিচ্ছুরিত গ্যাসও ধরা সম্ভব।

কিন্তু চান্দ্র গ্যাসের আস্তানা কোথায়? এক গেলাস জলে কয়েক বিন্দু পারা ফেললে পারাগুলো সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের তলায় চলে যাবে, কেননা পারা জলের চেয়ে ভারি।

গ্যাসগুলিরও যাবার কথা চাঁদের সবচেয়ে নিচু ভাগে অর্থাৎ খাদ আর আগ্নেয়গিরির মুখবিবরে। ক্যাপ্টেন বের করলেন যে গভীর ফাটলগুলোতে সত্যি সত্যি গ্যাস আছে।

প্রতিদিন পৃথিবীতে পাঠানো টেলিগ্রামের একটিতে খবরটা দেওয়া হল।

শেষ হয়ে আসছে চান্দ্র দিন। অস্তাচলে চলেছে সূর্য। বাঁকা হয়ে পড়ছে সূর্যরশ্মি, আগেকার মতো আর তাপ জোগায় না। উপত্যকা আর খাদে অন্ধকার হয়ে আসছে, কিন্তু পাহাড়চূড়াগুলি এখনো সূর্যালোকে দীপ্ত।

আকাশে আলম্ব পৃথিবীর কাস্তেটা আকারে বাড়ছে, দীপ্তিটা প্রখরতর।

ক্ষুদে ট্যাঙ্কটা চেপে চাঁদের অনেকখানি ঘুরে বেরিয়েছি। ট্যাঙ্কটা নিশ্ছিদ্র, ভেতরে থেকে মহাশূন্যচারীদের পোষাক বের করে নিই।

প্রাণহীন বিষণ্ণ গম্ভীর একটা জগৎ। অত্যন্ত অনিবিড় আবহমণ্ডলে শব্দ নেই, সবকিছু নিস্তব্ধ, মৃত। ঘোরার সময়ে রেডিও না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা হত না। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিটা শুধু ততদূর রেডিও কাজ করে, কেননা চাঁদকে ঘিরে কোনো আয়নলোক নেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো যেখানে রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে, খুশিমতো ধরার জন্য।

চাঁদের কাছাকাছি রঙবেরঙের মেঘ নেই — সূর্যোদয়ে গোলাপি বেগুনি, সূর্যাস্তে ঘোর লাল মেঘ নেই। জল নেই, তাই নেই সবুজ ঘাস আর গাছপালা। বায়ুমণ্ডল নেই বলে দুটো মাত্র রঙের প্রাধান্য — কালো আর কটকটে সাদা। রোদে সবকিছু ঝকঝক করে, ছায়াগুলি মিশমিশে কালো।

আর চাঁদের সূর্যালোকিত দিকটায় কী গরম! আমাদের রকেটযানের খোল তাপ পরিবাহিত করে না বলে ক্যাবিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক, কিন্তু বাইরে গেলে কাঠ ফাটা রোদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রকাণ্ড ছাতা নিতে হয় সঙ্গে। পৃথিবীতে এমন ছাতা নিয়ে বেশি দূর যাওয়া চলে না, প্রথম দমকা হাওয়ায় হাত থেকে এক ঝটকায় পড়ে যাবে। চাঁদে কিন্তু অত্যন্ত অনিবিড় আবহমণ্ডলে বলতে গেলে কোনো প্রতিরোধ নেই। তাই হণ্টন বা লম্ফনের সময়ে ছাতাটা কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করে না। চান্দ্র মাটি দিনের বেলায় সেণ্টিগ্রেডের এক শ' ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, আমাদের তাপ-অপরিবাহী সোলসমেত



চাঁদের সঙ্গে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

জুতো পরতে হত। দিনের বেলায় চাঁদের বুকে বেড়াতে হলে আগে থেকে সবকিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

সূর্য অতি মন্থর গতিতে, যেন পা টিপে টিপে নেমে এল দিগন্তে। অস্তাচলে রইল ঘণ্টা কয়েক। সমভূমিতে নামল অন্ধকার, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত দূর পাহাড়গুলির চূড়া আলোয় ঝকঝকে হয়ে রইল। সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের চেয়েও বেশি তাদের জৌলুষ। অবশেষে তাদের আলোও মিলিয়ে গেল। তাপমাত্রা নামতে নামতে পৌঁছল শূন্যাঙ্কের ১৫০ ডিগ্রি নিচে। আমাদের রকেট শক্তিশালী হিটারে তপ্ত, বাইরে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যচারীর পোষাকের ভিতরকার হিটার চালিয়ে দিতে হত, না হলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মৃত্যু হত অবিলম্বে।

এক একটা ঘণ্টা কাটছে আর পৃথিবীর কাস্তে ক্রমশ বড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ একটা বৃত্তে পরিণত হল। 'পূর্ণপৃথিবী'র সময় উপস্থিত। 'পূর্ণপৃথিবী' পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে ৮০ গুণ উজ্জ্বল। এত উজ্জ্বল যে পৃথিবী-আলোকিত চাঁদের বুকে অনেক দীর্ঘ সফর আমরা চালালাম; শৈত্যের ভয় আমাদের ছিল না।

চাঁদের অগোচর দিকে লোক থাকলে একটা জিনিস নিয়ে তাদের অনুশোচনার অন্ত থাকত না: অগণিত নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের গায়ে মৃদু নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল 'পূর্ণপৃথিবী'র সেই অপরূপ দৃশ্য তারা কখনো দেখেনি।

কল্পবিজ্ঞানের নানা কাহিনীতে বহিশূর্ন্য থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে তার ছবিতে আছে মহাদেশ ও মহাসাগর, গ্লোবে যেমনভাবে আঁকা হয় ঠিক তেমনিভাবে।

কিন্তু স্বচক্ষে দেখলাম ছবিগুলো ঠিক নয়। বহিশূর্ন্য থেকে পৃথিবীকে দেখায় উজ্জ্বল নীলাভ একটা চাকতির মতো, মহাদেশ ও মহাসাগর চোখে পড়ে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন এর কারণ এই যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত নিবিড় ও

ঘন, তাতে আছে মেঘ আর অগণিত ধূলিকণা। পৃথিবীর বুক থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির অন্তরায় এটা, তাই বহিশূন্যে থেকে মহাদেশ বা মহাসাগর ঠাহর করা চলে না।

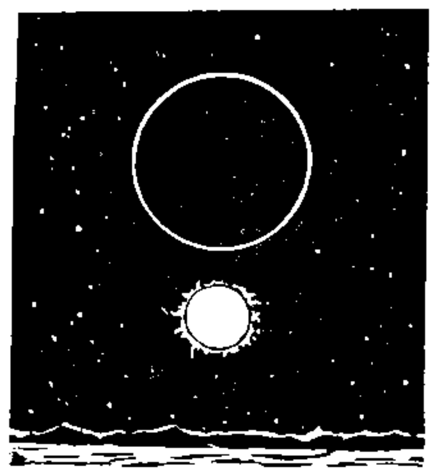
চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে ভালো করে দেখে সহজে বুঝলাম চাঁদের চেহারা কেন বদলে যায়, বুঝলাম তথাকথিত চন্দ্রকলা ব্যাপারটা কেন হয়। পৃথিবীর দিকে ফেরানো চাঁদের মুখ যখন সূর্যালোকিত নয় তখন বলা হয় অমাবস্যার চাঁদ। এ সময়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি পাঠায় না বলে চাঁদ আমাদের অগোচর থাকে। তারপর একটা কিনারা ক্রমশ আলো হয়ে ওঠে সূর্যের রশ্মিতে, আকাশে দেখি সরু একটা কাস্তে। সূর্যের দিকে মুখ ঘুরোয় চাঁদ, কাস্তেটা ক্রমশ বাড়ে। চাঁদের যে দিকটার অর্ধেকটা আমরা দেখি সেটা সূর্যালোকিত, আমরা বলি চাঁদের প্রথম পাদ। অবশেষে চাঁদের সব মুখটা আলো হয়ে ওঠে, দর্শন দেয় পূর্ণচন্দ্র। এরপর ক্রমশ সূর্যের দিক থেকে সরে যায় চাঁদের মুখ, তখন আবার নজরে পড়ে তার অর্ধেকটা — শেষ পাদ। তারপর একেবারে অদৃশ্য হয় চাঁদ — তখন আমাদের অগোচর গোলার্ধে সূর্যের আলো। পৃথিবীর লোকের কাছে তখন আবার অমাবস্যা। গোটা একটা চান্দ্র মাস অতিবাহিত, পরের মাসে আবার পুনরাবৃত্তি।

চাঁদ থেকে দেখা পৃথিবীকলা চন্দ্রকলার ঠিক উল্টো। পৃথিবীতে যখন পূর্ণচন্দ্র তখন চাঁদে পৃথিবীর অমাবস্যা আর পৃথিবীতে যখন চাঁদের অমাবস্যা তখন চাঁদে পৃথিবীর শুক্লপক্ষ।

চান্দ্র রাত্রির অর্ধেকটা অতিবাহিত হলে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের তোড়জোড় শুরু করল মহাশূন্যপোতের কর্মীরা। রকেটে আনা হল জ্বালানি, ফিরতি পথে অদরকারী জিনিসপত্র রাখা হল অটোরকেটে।

পৃথিবী ছাড়ার চেয়ে চাঁদ থেকে ছাড়াটা রকেটের পক্ষে অনেক সহজ। পৃথিবীতে যা ওজন তার ছ গুণ কম এখন রকেটটার, তাই চাঁদ ছেড়ে বহিশূন্যে পেঁছতে সেকেন্ডে ২·৪ কিলোমিটার মাত্র বেগ দরকার।

সেকেন্ডে দু কিলোমিটার বেগে যে কামান থেকে গোলা বেরোয় সে কামান চাঁদে কাজ দেবে না একেবারে। গোলাটা চাঁদে না ফিরে চাঁদের উপগ্রহে পরিণত হয়ে ঘুরপাক খাবে।



চাঁদ থেকে অমাবস্যার পৃথিবী।

উত্তরণের মুহূর্ত এসে পড়ল। প্রধান ক্যাবিনে সবাই গিয়ে বসেছি, ক্যাপ্টেন পৃথিবীতে তখন একটা রেডিও-টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে রকেটের খোল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চাঁদের অন্ধকার সমভূমি অনেক পিছনে ফেলে এলাম।

আসি তাহলে, চাঁদমামা! আবার আসব, তোমার ধূলোভরা সমভূমিতে ঘুরব, উঠব তোমার সব পাহাড়ে, নামব তোমার সবচেয়ে গভীর খাদে।

কিন্তু এখন আমরা ঘরমুখো। প্রতি ঘণ্টায় আকারে বেড়ে চলল পৃথিবী কিন্তু সেই সঙ্গে কমতে লাগল তার দীপ্তি।

অবশেষে পৃথিবীর প্রকাণ্ড আয়তনে ঢাকা পড়ল সমস্ত আকাশ। রকেটের বেগ এরি মধ্যে কমানো হয়েছে তবু এখনো বড্ড বেশি। এত বেগে পৃথিবীতে নামা চলবে না। পৃথিবীতে অবশ্য অদ্ভুত একটা ব্রেক আছে — ঘন বায়ুমণ্ডল — যেটা নেই চাঁদে।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে ঢুকল আন্তঃগ্রহ রকেটযান। নামতে লাগল আড়াআড়িভাবে, বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ শক্তিশালী ব্রেকের মতো কাজ করাতে উচ্চতা হ্রাস হতে লাগল আস্তে আস্তে। যত নিচে নামি তত ঘন বায়ুমণ্ডল, রকেটের বেগ অনেক কমে গেল। সাধারণ বিমানের বেগে যখন এসে পড়ল তখন আমাদের ক্যাপ্টেন কুইবিশেভ সাগরের দিকে রকেটযানকে চালিয়ে সাগরের ঠিক মধ্যিখানে নামালেন, প্রকাণ্ড একটা বঁড়শির টোপের মতো দুলতে লাগল সেটা ঢেউ-এর উপর।

চাঁদে সেই অদ্ভুত যাত্রা শেষ। কল্পনাযোগে নয়, বাস্তবে এ যাত্রা সারতে পারলে চমৎকার হত, না?

একটা জিনিস সুনিশ্চিত: এ-রকম যাত্রা চালু হতে বেশি দিন লাগবে না। কঠোর শ্রমে এবং বহিঃশূন্যে গবেষণার দ্বারা সে-দিন এগিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী পরিষদ আন্তঃগ্রহ যাত্রার সম্পর্কে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করে। এতে আছেন পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রে কার্যরত অগ্রণী সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

কমিশনের প্রধান কাজ হল একটি মহাশূন্য গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের গবেষণাগারের কথা অনেক বছর আগে ভেবেছিলেন কনস্তান্তিন ত্সিওলকভস্কি।

মহাশূন্য গবেষণাগারটি হবে পৃথিবীর নতুন একটি উপগ্রহ; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীকে এটি প্রদক্ষিণ করবে। এর চারদিকে ফাঁকা মহাশূন্য, বিজ্ঞানীরা এতে থেকে সেই সব পর্যবেক্ষণ চালাবেন যেগুলি

পৃথিবী থেকে করা যায় না। বর্তমানে যা তার চেয়ে অনেক ভালো করে চলবে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের অধ্যয়ন।

দ্যুলোক স্টেশনটি আন্তঃগ্রহ একটি মঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে, এখান থেকে চাঁদ শুক্র মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে রকেট ছোঁড়া হবে। পৃথিবী থেকে ছাড়লে যতটা তার অনেক কম বেগ লাগবে এদের।

চাঁদে সোভিয়েত প্রতীক

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত ভাবতেন যে চন্দ্র পরিক্রমা ব্যাপারটা সুদূর ভবিষ্যতের কথা। এ-রকম একটা যাত্রার কথা কল্পনার সাহায্যে এই তো বর্ণনা করেছি। যাহোক, হালের বছরগুলিতে সোভিয়েত বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়রিং এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়েছে যে বলা চলে, আরো অনেক আগে মানুষ পেঁছিবে চাঁদে।

১৯৫৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে একটি মহাশূন্য-যান উৎক্ষেপ করা হয় চাঁদের দিকে। ১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কো সময় রাত্রি বারোটা বেজে ০২ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে এটি পেঁছিল চাঁদে। ইতিহাসে এই প্রথম একটি জ্যোতিষ্ক থেকে অন্য জ্যোতিষ্কে যাত্রা সমাধিত হল বাস্তবে, জুল ভার্ন এবং এচ. জি. ওয়েলসের কল্পনাপ্রসূত উপন্যাসে নয়।

সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা নতুন সোভিয়েত কীর্তিতে বিচলিত হলেন। জড্রেল ব্যাঙ্কে ব্রিটেনের রেডিও-টেলিস্কোপ স্টেশনের ডিরেক্টর, প্রফেসর লভেল বললেন, চাঁদে এই রকেট যাত্রা 'সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনলজির অগ্রগতির চমৎকার একটা নিদর্শন বটে... আড়াই লক্ষ মাইল ধরে এ ধরনের জিনিসের পরিচালনা এমন একটা ব্যাপার যে মানুষের মন স্তম্ভিত হয়।'

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সংঘের সদস্য, ফরাসী প্রফেসর আনানফ, চন্দ্র গবেষণা যাঁর কাজ, বললেন: 'রুশদের সম্ভাব্য শক্তির কথা যতটা জানা আছে তাতে মনে হয় তারা আরো বেশি কিছু করতে পারে, রকেটকে আরো বিস্ময়কর করার ইচ্ছে থাকলে তাতে তারা মানুষ বসাতে পারে।'

পশ্চিম জার্মানির বখুম মানমন্দিরের ডিরেক্টর হাইন্ৎস্ কামিনস্কি-র মতে, '১০ কিলোমিটার দূরে মাছির চক্ষুভেদকারী লক্ষ্যবেদ্ধার সঙ্গে তুলনা করা যায় রুশদের ...'

তুলনাটা বেশ জুতসই, অত্যুক্তি নয় মোটেই। নিজে পরখ করার জন্য এক টুকরো কাগজ কেটে দশ সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটা বৃত্ত বানিয়ে দেয়ালে টাঙাও, তারপর এগারো মিটার দূর থেকে দেখ। যে ছোপটা চোখে পড়বে আয়তনে সেটা আকাশে দেখা চাঁদের মতো।



চাঁদে প্রেরিত সোভিয়েত প্রতীক।

৪৩ ঘণ্টায় ৩,৮০,০০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে এ লক্ষ্যভেদ করতে হয় মহাশূন্য-রকেটটিকে। আর টিপটা একটু 'এগিয়ে' করতে হয়, কেননা রকেট উৎক্ষেপের মুহূর্তটিতে স্বয়ং চলমান চাঁদ ছিল লক্ষ্যভেদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দেড় লক্ষ কিলোমিটার দূরে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নির্ভুল গণনা এবং রকেট পরিচালক যন্ত্রপাতিগুলোর সঠিকতা সত্যিই আশ্চর্য: নির্দিষ্ট লক্ষ্য-এলাকায় চাঁদকে আঘাত করে রকেটটি, পৌঁছয় প্রায় দু মিনিট আগে। লক্ষ্যবেদ্ধার মতোই টিপ বটে।

পথ থেকে চুলমাত্র সরে গেলে রকেটটি হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে কখনো পৌঁছত না চাঁদে। রকেটের বেগকেও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রাখতে হয়, সেকেন্ডে কয়েক মিটার বেগ বাড়লেই রকেট গিয়ে পড়ত সৌরজগতের বিরাট শূন্যে, পরিণত হত সূর্যের আর একটি গ্রহে, ১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারিতে উৎক্ষিপ্ত প্রথম সোভিয়েত কৃত্রিম গ্রহের মতো (এ বিষয়ে পরে আরো বলব)। যদি একটু আস্তে চলত তাহলে চাঁদ পর্যন্ত যেত না, পৃথিবীতে ফিরে আসত আমেরিকার প্রথম ও দ্বিতীয় 'পথদ্রষ্টা'র মতো।

জ্বালানি পুড়ে যাবার পর বহুপর্যায়ী রকেটটির শেষ পর্যায়টির ওজন ছিল ১,৫১১ কিলোগ্রাম; ৩৯০·২ কিলোগ্রাম ওজনের একটি যন্ত্রপাতি-আধার বাহক-রকেট কক্ষপথে প্রবেশ করলে বিচ্ছিন্ন হয় তা থেকে। আধারটি চাঁদে পৌঁছনোর মুহূর্ত পর্যন্ত যন্ত্রপাতিতে পাওয়া নানা মাপজোক পৃথিবীতে আসে রেডিওযোগে।

রকেটটি চাঁদে পৌঁছয় স্বচ্ছতা-সাগর ও স্থির সাগরের মাঝখানের একটা জায়গায়। চাঁদে ধাক্কা লাগার সময়ে ধুলোর মেঘ কয়েকটি পর্যবেক্ষক দেখতে পান।

রকেটে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় চিহ্ন এবং 'সোভিয়েত ইউনিয়ন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯' এই কথাগুলি উৎকীর্ণ একটি ধাতু-গোলক। মনে হয় চাঁদে প্রথম অভিযাত্রীরা গোলকটির খোঁজ করবেন, মহান সোভিয়েত কীর্তির কথা উত্তরপুরুষদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এটিকে রাখবেন স্মৃতিস্তম্ভের উপর।



পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

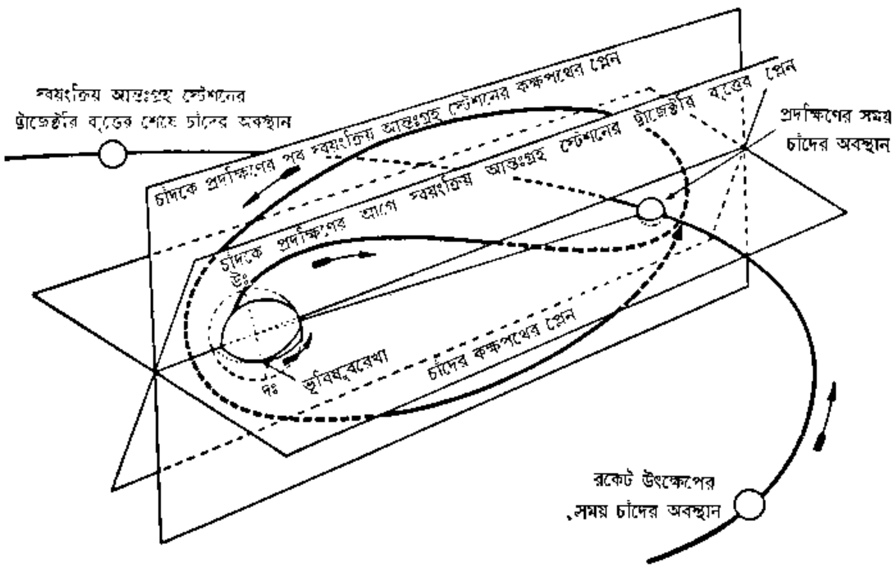
পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম সোভিয়েত উপগ্রহ

এ বইতে কয়েকবার উল্লেখ করেছি স্পুৎনিকের, পৃথিবীর কৃত্রিম সোভিয়েত উপগ্রহগুলির। সোভিয়েত বিজ্ঞানের এই অপরূপ অবদান বিষয়ে আরো কিছু বলা যাক।

দ্যুলোকে একটি স্টেশন বানানোর মতলব থাকলে আমাদের শত শত রকেট পাঠাতে হবে, প্রত্যেকটিতে থাকবে আলাদা আলাদা অংশ; তারপর সেগুলোকে জড়ো করে জোড় লাগাতে (এ্যাসেম্বল্ করা) হবে বহিশূর্ন্যে। অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত জটিল এ কাজ, দীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা রকেট ছোড়ার বিদ্যা প্রথমে শিখতে হবে। মানুষের তৈরি প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম উপগ্রহ পাঠানো হয়; বিদ্যুদগতিতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। শিশুচন্দ্রের নাম সর্বত্র হল স্পুৎনিক, এই রুশ শব্দটির অর্থ উপগ্রহ বা সহযাত্রী। পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবনিতার ঘরোয়া শব্দে পরিণত হল এটি অবিলম্বে।

নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটি অত্যন্ত ছোট। ব্যাস — ৫৮ সেণ্টিমিটার, ওজন — ৮৩ কিলোগ্রামের



চাঁদের অগোচর দিকের ছবি-তোলা কৃত্রিম আন্তঃগ্রহ স্টেশনটির যাত্রাপথ।

একটু বেশি। ছোট আধারটার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ররা দুটো ছোট সর্ট-ওয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটার বানাতে সমর্থ হন যাদের সঙ্কেতধ্বনি — ব্লিপ, ব্লিপ, ব্লিপ — অচিরে সারা দুনিয়ার রেডিও এ্যামেচারদের কাছে চেনা হয়ে গেল।

পৃথিবীর চমক আর তারিফ তখনো কাটেনি, আবার একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করল সোভিয়েত জনগণ। ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুৎনিক চড়ল মহাশূন্যে। এটি হল একটি রকেটের নাসিকা-ভাগ, ওজন ৫০৮ কিলোগ্রাম। এর অভ্যন্তরে ছিল মাপের অনেক যন্ত্রপাতি, বিশেষ আধারে ছিল একটি কুকুর। লাইকা বহিশূন্যের প্রচণ্ড ঊর্ধ্বে ওঠে। এতে প্রমাণ হল যে প্রাণীরা ঊর্ধ্বগামী রকেটের ভয়ঙ্কর ত্বরণবেগ সহ্য করতে পারে।

ছ মাসের একটু পরে, ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে, তৃতীয় স্পুৎনিক ছাড়লেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। বিদেশী সাংবাদিকেরা এর নাম দিলেন উড়ন্ত মোটরগাড়ি। এর ওজন ১,৩২৭ কিলোগ্রাম, এর মধ্যে মানুষ থাকতে পারে।

প্রথম স্পুৎনিকগুলির কী হল?

অতিঊর্ধ্বে হাওয়া অত্যন্ত অনিবিড় হলেও মানুষের তৈরি উপগ্রহগুলির গতিবেগে বাধা দেয়, ক্রমশ মন্থরগতি হয়ে এরা বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে পড়ে ধূমকেতুর মতন পুড়ে যায়। দুঃখের কারণ নেই অবশ্য; স্পুৎনিকগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্য অসামান্য। টেলিস্কোপে তাদের দেখে, রেডিওযোগে খবর পেয়ে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা।

প্রতিটি নতুন স্পুৎনিক আগের স্পুৎনিকের চেয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে। প্রথম স্পুৎনিকের উচ্চতা-সীমা ছিল ৯০০ কিলোমিটার, দ্বিতীয়টি ওঠে ১,৭০০ কিলোমিটার, আর তৃতীয়টি ১,৮৮০ কিলোমিটার। যত উঁচুতে ওঠে, তত বেশি আয়ু, কেননা হাওয়ার বাধা তত কম।

প্রথম স্পুৎনিক প্রায় ৯২ দিন টিকে থেকে পৃথিবীকে ১,৪০০ বার প্রদক্ষিণ করে — মোট যাত্রাপথ ছ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গলগ্রহের দিকে গেলে তাতে পৌঁছত সে সময়ে যখন মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। দ্বিতীয় স্পুৎনিক ১৬২ দিন কক্ষপথে থেকে প্রায় ১০ কোটি কিলোমিটার ঘোরে — পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ।

তৃতীয় স্পুৎনিক ৬৯১ দিন টিকে পৃথিবীকে ১০,০৩৬ বার ঘোরে, ৪০ কোটি ৪৮০ লক্ষ কিলোমিটার পরিক্রমণ করে — অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের তিন গুণ। এর দীর্ঘ কর্মজীবন শেষ হয় ১৯৬০ সালের ৬ই এপ্রিল।

কয়েক ডজন কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে এবং রকেটবিদ্যার টেকনিক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনার পর প্রথম দ্যুলোক স্টেশন বানানোর সময় এসে পড়বে — সৌরমণ্ডলের গ্রহে যাত্রার পথ তখন উন্মুক্ত হবে।

চাঁদের চারদিকে

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৯৫৯, ৪ঠা অক্টোবর তারিখটা লেখা থাকবে লাল হরফে। এ দিন, অর্থাৎ প্রথম স্পুৎনিক উৎক্ষেপের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে, তৃতীয় সোভিয়েত মহাশূন্য-রকেট যে যাত্রা শুরু করল তা চাঁদকে ঘিরে পৃথিবীমণ্ডলে ফিরে আসে।

কক্ষপথে রকেট পৌঁছনোর পর ২৭৮·৫ কিলোগ্রাম ওজনের একটি স্বয়ংচালিত আন্তঃগ্রহ স্টেশন তা থেকে বিচ্যুত হল। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ ধরনের স্টেশনের ডিজাইন করেছিলেন যিনি সেই ত্সিওলকভ্স্কির স্বপ্ন এত দিনে সত্য হল।

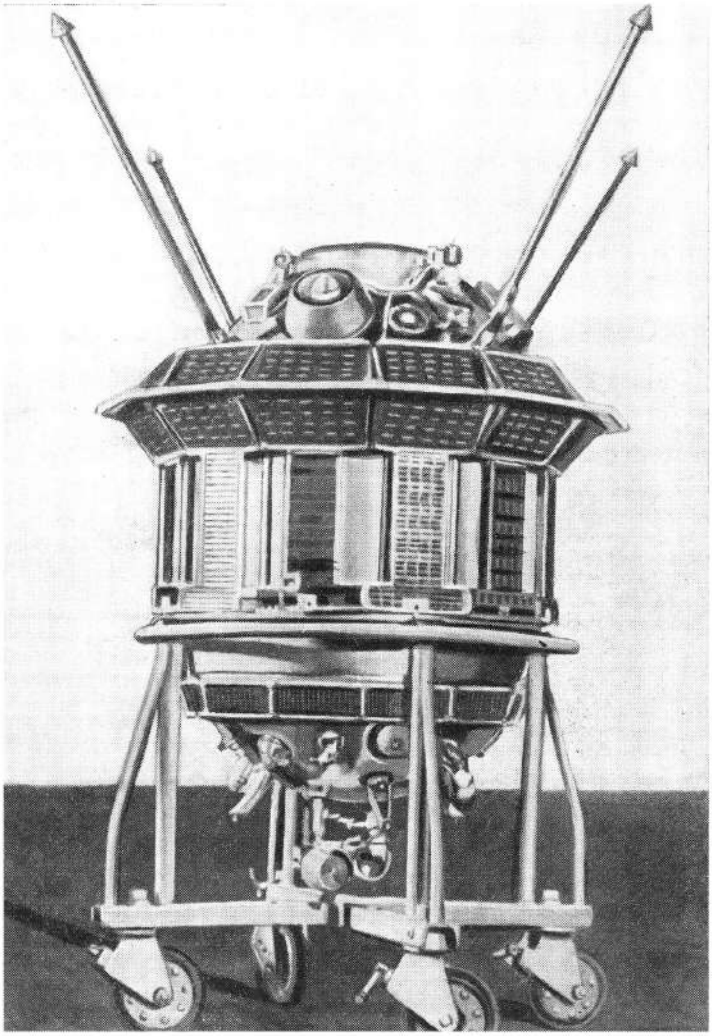
স্টেশনে ছিল অত্যন্ত জটিল ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি, তাদের এবং রেডিও ট্রান্সমিটারগুলিকে প্রবাহ সরবরাহের ব্যাটারি। রাসায়নিক ব্যাটারি ছাড়া ছিল সৌর ব্যাটারি, সূর্যের তেজকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করে বহুক্ষণ চালু থাকে এগুলি — বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এরা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তঃগ্রহ স্টেশনটি স্পুৎনিকগুলি থেকে আলাদা। স্পুৎনিকের রেডিও ট্রান্সমিটার ক্রমান্বয়ে অবিরাম সঙ্কেত পাঠাত পৃথিবীতে। স্বয়ংচালিত আন্তঃগ্রহ স্টেশনটি কিন্তু এ ব্যাপারে আলাদা। ডিজাইন এমন যে পৃথিবী থেকে নির্দেশ এলে তবে চলত এর সরঞ্জাম।

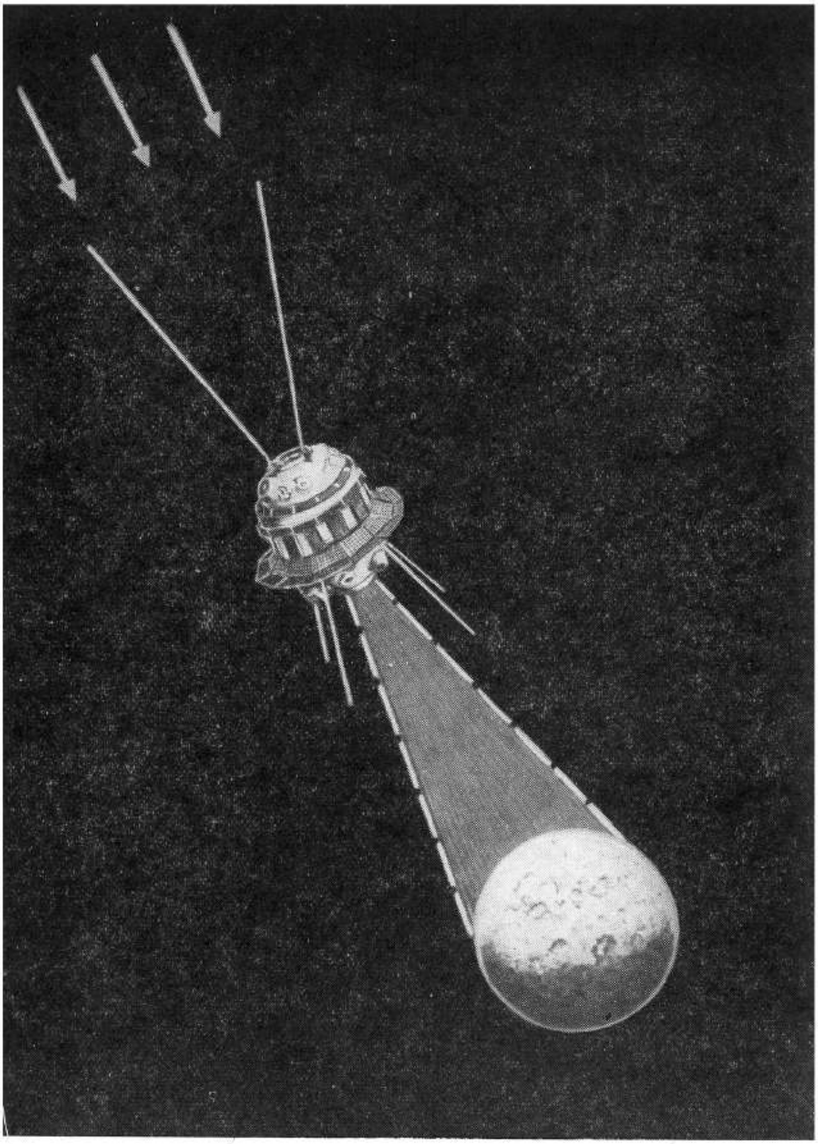
নির্দেশ পেলে সরঞ্জাম চালু হত, শুরু হত 'রেডিও অনুষ্ঠান', যন্ত্রপাতিতে পাওয়া মাপ ও অন্যান্য খবর রেডিওযোগে যেত পৃথিবীতে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলত দু এক ঘণ্টা বা যতক্ষণ পৃথিবী থেকে নির্দেশ না আসে ততক্ষণ। তারপর নতুন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করা কয়েক দিনের জন্য।

চাঁদে প্রথম রকেট পাঠানোর জন্য কত নির্ভুলতার দরকার পড়ে তা আগেই তোমাদের বলেছি। আন্তঃগ্রহ রকেটটিকে পাঠাতে আরো নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন হয়; বিদেশের কয়েকটি খবরের কাগজ তো বলে 'আজব নির্ভুলতা'।

আগেকার রকেটগুলির চেয়ে আরো অনেক সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল আন্তঃগ্রহ স্টেশনটির। শুধু চাঁদে পৌঁছিয়ে নামা নয় — চাঁদকে ঘুরপাক দিয়ে পৃথিবীমণ্ডলে ফিরে আসা। কাজটা অত্যন্ত কঠিন হলেও সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৯ সালের ১৮ই অক্টোবর ঠিক পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে এটি কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যে সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে (মস্কো সময়) পৃথিবী ও চাঁদকে প্রদক্ষিণের প্রথম পালা শেষ করে। প্রায় একপক্ষ লাগে এ যাত্রায়।



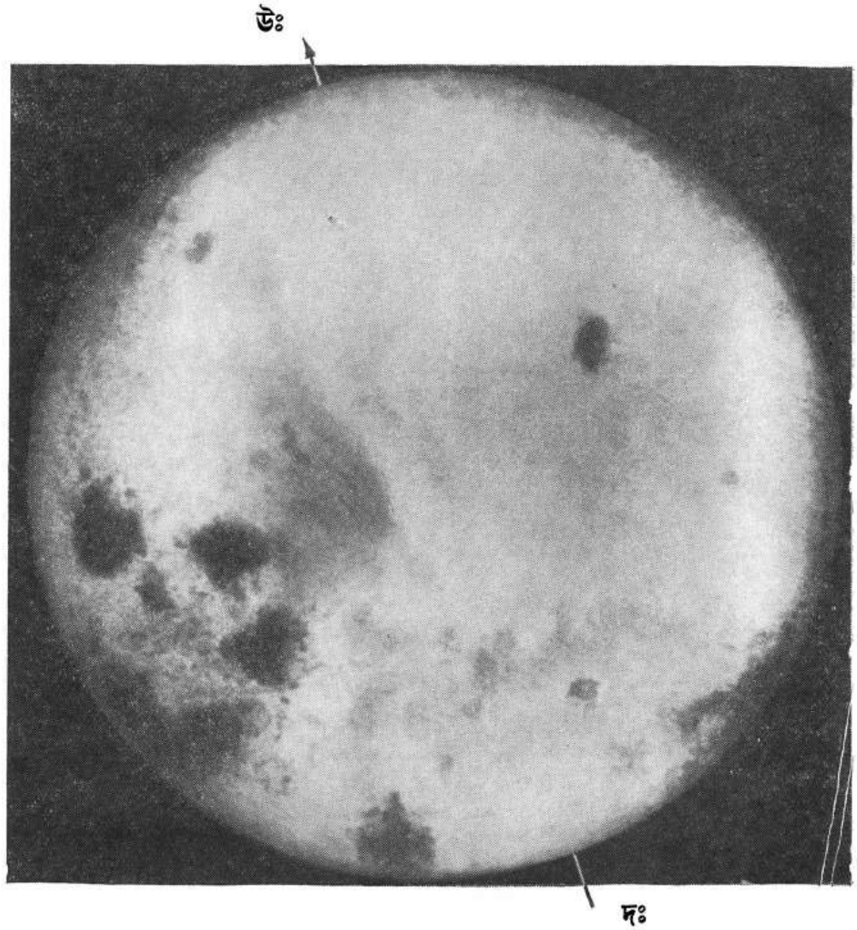
উৎক্ষেপণ স্থানে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশন।



চাঁদের অপর পিঠের ছবি তোলা হয় ৪০ মিনিট ধরে।

স্টেশনটির জন্য আর একটি অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। চাঁদকে ঘোরার সময়ে এটি আমাদের উপগ্রহের মানুষের চোখে কখনো-না-দেখা দিকটির ছবি তুলে রেডিওতে পাঠায় পৃথিবীতে।

অনেক সমস্যার সমাধান করতে হয় তার আগে। চাঁদের অগোচর দিকটিকে অতিক্রম করার মুহূর্তে ভিডিও ক্যামেরাগুলিকে চালু করতে হল। 'মুক্ত পতন' অর্থাৎ ভারহীন অবস্থায় রাখতে হল সমস্ত সরঞ্জামকে, ক্ষতিকর মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে আগলানো



চাঁদের অগোচর দিকের ছবি।

হয়। তারপর ফিল্ম ডেভেলপ করা, বসানো, শুকোনো, অন্য রোলারে ঘোরানো। এ অবস্থায় দিনকয়েক রেখে তারপর রেডিওযোগে পৃথিবীতে পাঠানো।

একেবারে নিখুঁতভাবে চলে সমগ্র প্রক্রিয়াটি। রকেটটির মেরুদণ্ড যখন সূর্য থেকে চাঁদে টানা একটি লাইন বরাবর, তখন পৃথিবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতের নির্দেশে বিশেষ সরঞ্জাম তার আবর্তন বন্ধ করে দেয়, আর চল্লিশ মিনিট ধরে চাঁদের যে দিকটা আমাদের অগোচর তার ছবি তোলে ক্যামেরাগুলি। দুটো স্কেলে ছবি তোলা হয়, সমস্ত চাকতিটিকে দেখানোর জন্য ছোট স্কেলে আর উপরিভাগের খুঁটিনাটি ধরার জন্য বড়ো স্কেলে।

আন্তঃগ্রহ স্টেশনে স্থাপিত রেডিও টিভি ট্রান্সমিটারগুলি যে ছবি পাঠায় সেগুলি এল পৃথিবীর স্টেশনে। প্রসঙ্গত, এ সব ট্রান্সমিটার যে শক্তি ব্যবহার করে তা পৃথিবীতে সাধারণত ব্যবহৃত শক্তির দশ কোটি গুণ কম। বিজ্ঞানীদের সামনে অনাবৃত হল চাঁদের অপর দিকের একটি মানচিত্র, কখনো-না-দেখা দিকটার রহস্য ধরা পড়ল সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়রদের প্রতিভাগুণে।

ফোটো-নেওয়া বস্তুগুলির কয়েকটির নাম দিলেন বিজ্ঞান আকাদমীর একটি কমিশন। এখন চাঁদের মানচিত্রে আছে স্বপ্ন সাগর (মানুষ-সৃষ্ট প্রথম গ্রহ, সোভিয়েত সৌর গ্রহের উৎক্ষেপের দিনে যে স্বপ্ন সত্য হয় তার স্মরণার্থে); আছে মস্কো সাগর, যে সহর শান্তির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার সম্মানে। সোভিয়েত পাহাড়গুলি বহিঃশূন্যের প্রথম বিজেতাদের কথা চিরকাল মনে করিয়ে দেবে। আগ্নেয় গিরিবিবরগুলির নামকরণ করা হয়েছে ত্সিওলকভ্‌স্কি, লমোনোসভ, জোলিও-কুরি এবং অন্যান্য বিদেশী বিজ্ঞানীদের নামে; জ্ঞানের উচ্চ শিখায় মানবজাতিকে যে মহাপুরুষেরা নিয়ে গেছেন তাঁদের স্মৃতি জাগাবে এরা চিরকাল।

১৯৫৯ সালের অক্টোবরের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে চান্দ্র ভূগোলের বিকাশ খরগতিতে এগিয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদের অপর দিকে স্বয়ং মানুষ পৌঁছবে। তাঁদের সঙ্গে থাকবে একটি নিখুঁত মানচিত্র, যে মানচিত্র প্রস্তুত করে প্রথম আন্তঃগ্রহ স্টেশন, যার সংশোধন করে অন্যান্য স্টেশন — পরে যে এমন স্টেশন উড্ডীয়মান হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সোভিয়েত মহাশূন্যযান

বহিঃশূন্যের বিজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছে, কক্ষপথে প্রবিষ্ট প্রতিটি রকেট হল আর একটি পদক্ষেপ।

১৯৬০ সালের ১৫ই মে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ওজনে সাড়ে চার টনের একটু বেশি (শেষ পর্যায়টা বাদ দিয়ে) একটি মহাশূন্যযান ছাড়েন। মানুষ থাকতে পারে, আড়াই টনের

এমন একটি ক্যাবিন ছিল এটিতে; ঠিক ছিল যান থেকে আলাদা হয়ে ক্যাবিনটি আপন পথে চলবে। অবশ্য কোনো জীবন্ত মহাশূন্যচারী ছিল না ক্যাবিনে, কিন্তু মালের ভার মানুষের সমান, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতিই ছিল। অতি সূক্ষ্ম রেকর্ডিং যন্ত্রে দেখা গেল ক্যাবিনের ভিতরকার অবস্থা — তাপ, বায়ু সরবরাহ ইত্যাদি — স্বাভাবিক, মহাশূন্যচারী মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

পৃথিবীর উপরে বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার উচ্চতায় মহাকাশযানটি চলে। সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ারিঙের এটি আর একটি কীর্তি — কেননা উপবৃত্তাকার কক্ষপথের চেয়ে বৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো অনেক কঠিন — রকেটের যাত্রা নিয়ন্ত্রণী যন্ত্রপাতি হওয়া দরকার আরো অনেক নির্ভুল। মনে আছে তো, প্রথম স্পুৎনিকগুলি ছিল যে কক্ষপথে তার আকার অতি দ্রাঘিত উপবৃত্তের মতো।

প্রথমে পৃথিবীকে মহাকাশযানটি পরিক্রমণ করে ৯১ মিনিটে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ষোলো বার।

আগেকার স্পুৎনিকগুলি যতদিন অত্যন্ত উচ্চলোকে বায়ুর প্রতিবন্ধ সামলাতে পারে ততদিন চলে। তৃতীয় স্পুৎনিক তো প্রায় দু বছর চলে (৬৯১ দিন)। এত দীর্ঘকালব্যাপী যাত্রার জন্য মহাশূন্যযানটিকে বানানো হয়নি। মহাশূন্যচারী প্রথম মানুষ অবশ্য মাত্র কয়েকদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জল এবং বায়ু নিতে পারবে; আমাদের মহাকাশযানটিকে এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে পৃথিবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতে ক্যাবিনটি আলাদা করা যায়।

তিন মাস পরে, ১৯শে আগস্ট, বৃত্তাকার কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হল দ্বিতীয় মহাশূন্যযান। এবারে যাত্রী ছিল — বিয়েলকা ও স্ত্রিয়েলকা নামের দুটি কুকুর, বড়ো ও ছোট ইঁদুর, পোকামাকড়, উদ্ভিদ, শস্যকণা ও কয়েকটি জীবাণু। প্রাণী ব্যবহার দেখার জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম ছাড়া মহাশূন্যযানে ছিল টেলিভিশন ক্যামেরা।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ৪,৬০০ কিলোগ্রাম ওজনের মহাশূন্যযানটি পৃথিবীকে ১৮ বার চক্কর দেয়। এর পর পৃথিবী থেকে রেডিও-সঙ্কেতে আদেশ পাঠানো হল প্রত্যাবর্তনের। প্রত্যাবর্তনের সমস্ত সরঞ্জাম অত্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করে। গতিবেগ কমিয়ে, তাপনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামে সুসজ্জিত যানটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তর অতিক্রম করে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে নামল। অবতরণের আগে প্রাণীবাহী ক্যাপসিউলটি আলাদা করা হয়, পারাসুটের সাহায্যে সেটি নিরাপদে নেমে আসে।

ইতিহাসে এই প্রথম জীবন্ত প্রাণী মহাশূন্য থেকে ফিরে এল পৃথিবীতে।

কিছুদিন বাদেই আরো তিনটি মহাব্যোমযান উৎক্ষিপ্ত হল, অনেক নতুন তথ্য পেলেন বিজ্ঞানীরা। মহাশূন্যে মানুষের সম্পূর্ণ নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা নিখুঁত করা হল।

চন্দ্রগ্রহণ

অনাদি কাল থেকে খলোকের সমস্ত ঘটনার মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভীত করেছে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ।

আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ, আশেপাশে কোথাও এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই। হঠাৎ চাঁদের মুখে অগ্রসর হল কালো ছায়া, কোথা থেকে তার আগমন কেউ জানে না… ক্রমশ বড়ো হতে লাগল ছায়াটি… অদৃশ্য হয়ে গেল চাঁদের বেশির ভাগ, তারপর একেবারে নিশ্চিহ্ন চাঁদ। অবশ্য চাঁদ তখনো আছে, দেখতে ঘোর লাল চক্রফলকের মতো, কিন্তু দীপ্তি নেই।

পৃথিবীর ছায়া পড়ে বলে চন্দ্রগ্রহণ। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের সমস্ত মুখকে আবৃত করলে বলা হয় পূর্ণগ্রাস, আর কিছুটা অংশ ঢাকলে খণ্ডগ্রাস।

খণ্ডগ্রাস লোকের মনে পূর্ণগ্রাসের মতো দাগ কাটে না। চাঁদ তো সরু কাস্তের মতো প্রায়ই দর্শন দেয়, তাই খণ্ডগ্রাসে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

আগেকার দিনে লোকে ভাবত ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস, একটা ড্র্যাগন, গ্রহণের সময়ে চাঁদকে গিলে ফেলে। ড্র্যাগনে কয়েকটি জাতির বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে ঢাক পিটে, খটখটি বাজিয়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করত তারা। আকাশে চাঁদ আবার দেখা দিলে কী তাদের উল্লাস — ভাবত শব্দের তাড়নায় চাঁদকে ছেড়ে ড্র্যাগন পিটটান দিয়েছে।

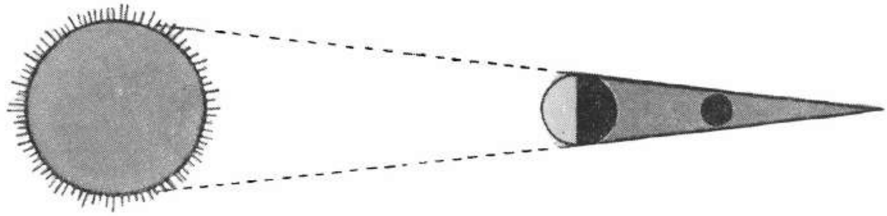


আগেকার রাশিয়ায় চন্দ্রগ্রহণকে ভাবা হত দারুণ একটা দুর্লক্ষণ বলে।

১২৪৮ সালে একটি ইতিবৃত্তলেখক লেখেন: 'চাঁদে একটি দুর্লক্ষণ দৃশ্যমান হয়। ঘোর লাল হইয়া সেটা মুছিয়া যায়… আর সেবারের গ্রীষ্মকালেই খাঁ বাতি তাঁহার সৈন্যবাহিনী সমেত উপস্থিত হইলেন…'

তেরো শতকের রুশেরা তাহলে ভাবত যে, তাতার খাঁ বাতির আক্রমণের পূর্বাভাস মেলে চন্দ্রগ্রহণ থেকে।

১৪৭১ সালের ইতিবৃত্ত বলে: 'মধ্যরাত্রি বিষণ্ণ গম্ভীর, চাঁদের বক্ষে যেন রক্তের ছোপ, বহুক্ষণ ধরিয়া অন্ধকার বর্তমান থাকে, তাহার পর ধীরে ধীরে আলোকের সঞ্চার…'



কী ভাবে চন্দ্রগ্রহণ ঘটে।

সরকারী ইতিহাসে প্রত্যেকটি চন্দ্রগ্রহণ জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে নথিবদ্ধ হয়।

চন্দ্রগ্রহণের জন্য সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদকে একটি সমরেখায় থাকতে হবে, পৃথিবীর অবস্থিতি হবে সূর্য ও চাঁদের মধ্যে। জ্যোতিষ্কগুলির এই বিন্যাস পালাক্রমে ঘটে নিয়মিতভাবে।

এমন কি পুরাকালেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে চন্দ্রগ্রহণ পালাক্রমে ঘটে ১৮ বছর ১১ দিন ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর। গ্রহণগুলির তারিখ মনে রাখলে ভবিষ্যৎ গ্রহণের কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যেত।

আজ অত্যন্ত নির্ভুলভাবে গ্রহণের দিনক্ষণ আগে থেকে বলা যায়, আগামী অনেক বছরের জন্য চন্দ্রগ্রহণের একটি সময়সূচী তৈরি আছে।

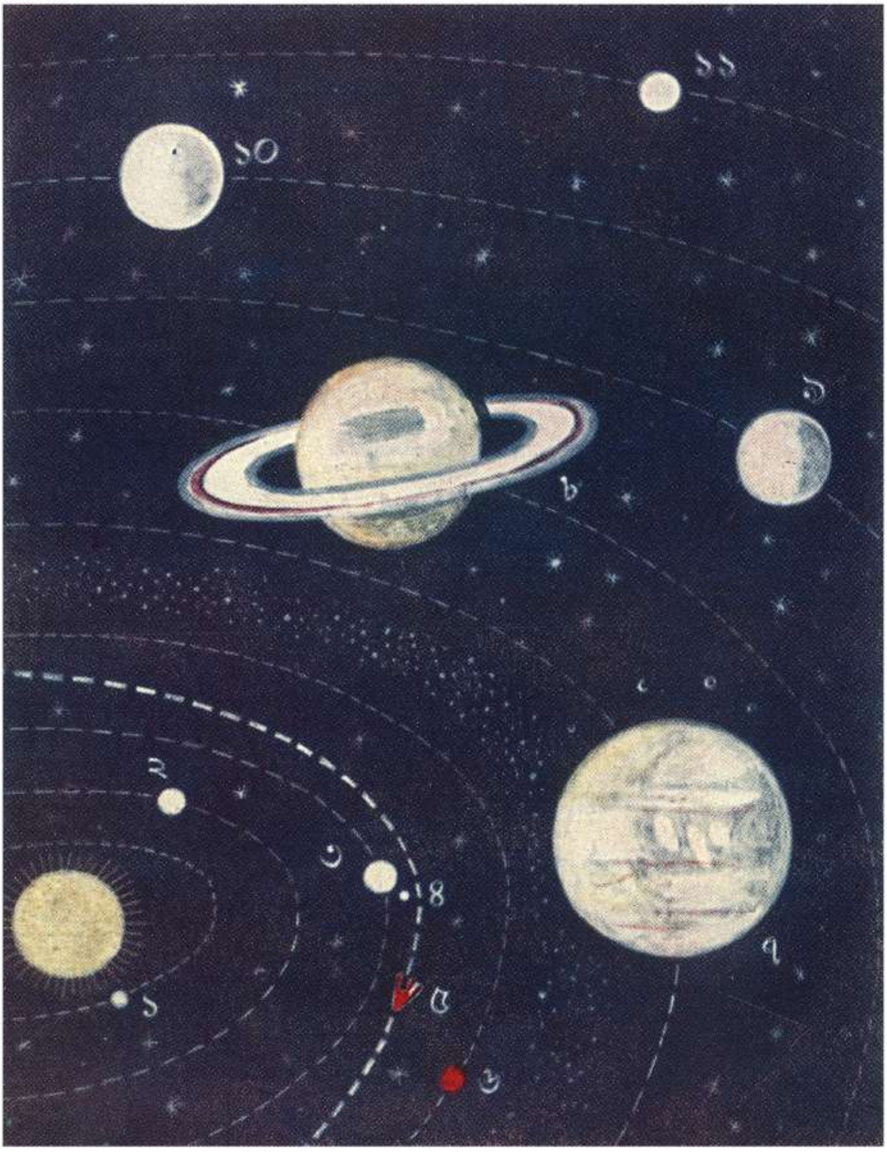
সৌরজগৎ

আমাদের পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা একটি জ্যোতিষ্ক। সূর্য এবং তাকে পরিক্রমণ-করা সমস্ত জ্যোতিষ্ক নিয়ে সৌরমণ্ডল।

পৃথিবী হল আমাদের বাসগৃহ, সৌরজগৎ হল আমাদের সহর।

আমাদের সহরে কয়েকটি বড়ো দালান — বৃহস্পতি ও শনি; পৃথিবী, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহের মতো কয়েকটি মাঝারি সাইজের দালানও আছে, আর আছে ছোট কুটির — গ্রহিকা বা গ্রহাণুপুঞ্জ, আর অতি ক্ষুদে কয়েকটা জিনিস — ধূমকেতু — যেগুলি খুব সম্ভব বিনষ্ট গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। আর সর্বশেষে আছে কৃত্রিম গ্রহ, কিন্তু এর বিষয়ে পরে বলব।

আমাদের সূর্য-সহরের বাড়িগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই; মধ্যমণি সূর্যকে ঘিরে শতাব্দীর পর শতাব্দী অদৃশ্য পথে তাদের দৌড়। আর স্বয়ং সূর্য ও তার গ্রহ সমেত গোটা



সৌরজগৎ (সূর্য ও গ্রহগুলির আয়তন ও তাদের মধ্যকার দূরত্বকে স্কেল হিসেবে দেখানো হয়নি)।

সূর্য-সহর অন্তহীন মহাশূন্যে প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য সমস্ত সূর্য-সহরের মতো আমাদের সূর্য-সহরও যাযাবর।

এবার সূর্য-সহরের কয়েকটি দালানের বিষয়ে কিছু শোনা যাক। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধকে নিয়ে শুরু করি।

বুধ

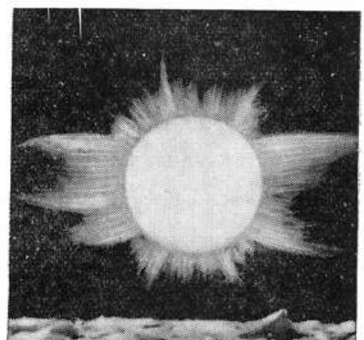
পুরাকালের রোমানরা ভাবতেন তাঁদের জীবন অনেক দেবতার হাতে। সমস্ত দেবতার পিতৃদেব ও অধিকর্তা হলেন জুপিটার, তাঁর স্ত্রীর নাম জুনো। সূর্যদেব তাঁদের সন্তান, তাঁর নাম ফিবাস বা এ্যাপোলো। জুপিটার ও জুনোর কন্যা ভেনাস ছিলেন সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবতাদের দূত হলেন ক্ষিপ্রগতি মার্কারি (বুধ), রোমানদের বর্ণনায় মার্কারির গায়ে একজোড়া ডানা।

এসব দেবতার যুগ কেটে গেছে অনেকদিন, তবু ভারিক্কি বিষয়ে লেখা বইতে এদের নাম এখনো আছে। প্রবীণ প্রফেসররা তাদের নামোচ্চারণ করেন অতি গম্ভীরভাবে।

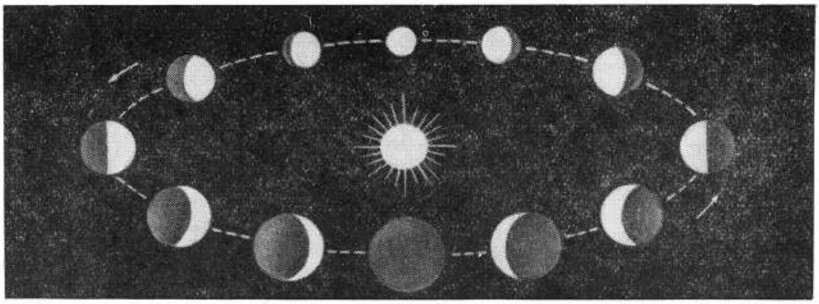
কেন এমনটা? কারণ, পুরাকালের লোকেরা দেবতাদের নামে ডাকতেন গ্রহনক্ষত্রগুলিকে। এখনো আকাশে জুপিটার (বৃহস্পতি), ভেনাস (শুক্র) এবং মার্কারি (বুধ) বর্তমান। দ্বিতীয় শ্রেণীর সবচেয়ে বাউণ্ডুলে দেবদেবীদেরও ভোলা হয়নি: তাদের নামে নব-আবিষ্কৃত গ্রহ এবং গ্রহিকার নামকরণ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

আগেকার দিনে জ্যোতিষ্কদের অধ্যয়ন একটি মিথ্যা শাস্ত্র, জ্যোতিষের দোসর ছিল। জ্যোতিষীরা বলত: 'শিশুর জন্মমুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান লিখে রাখা দরকার — তাদের পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে মানুষের অদৃষ্ট।' আর এ থেকে জ্যোতিষীরা নবজাতকের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ বলে দিতেন।

যেমন, 'মার্কারি রাশিতে', অর্থাৎ আকাশে মার্কারির একটি বিশেষ স্থানে থাকার সময়ে পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জ্যোতিষীরা বলতেন ছেলেটি সওদাগর হবে, কেননা মার্কারি হলেন বাণিজ্যদেবতা। 'মার্স রাশিতে' ভূমিষ্ঠ ছেলেরা নিষ্ঠুর হিংস্র যোদ্ধা। কারণ, মার্স ছিলেন রোমানদের যুদ্ধদেবতা।



বুধ থেকে দেখলে সূর্যকে মনে হয় আগুনের বিরাট একটি চক্রফলক।



পৃথিবী থেকে দৃষ্ট বুধ বা শুক্র কলা।

দেবতাদের ক্ষিপ্রগতি দূতের সম্মান কেন দেওয়া হয় মার্কারিকে?

সূর্যের সবচেয়ে কাছের এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অতি দ্রুতবেগে — মাত্র ৮৮টি পৃথিবী-দিনে। পৃথিবীর চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত মার্কারির কক্ষপথ, আর মার্কারি চলে অতি ক্ষিপ্রগতিতে।

পার্থিব বর্ষের চারভাগের একভাগেরও কম তাই মার্কারি-বর্ষ। দ্রুতগতির জন্য রোমানরা একে বলতেন 'মার্কারি'। 'স্বর্গলোকের দৌড়িয়ে' নামে পরিচিত ছিল ছোট গ্রহটি।

অতি ক্ষুদ্র গ্রহ বুধ, ব্যাস পাঁচ হাজার কিলোমিটার মাত্র। পৃথিবীর আয়তনের বিশভাগের একভাগ। তার মানে পৃথিবী থেকে বিশটা বুধগ্রহ তৈরি করা চলে। পৃথিবীর মহাকর্ষের চারভাগের একভাগ মাত্র বুধের, অর্থাৎ ষাট কিলোগ্রাম মানুষের ওজন বুধে হবে মাত্র পনেরো কিলোগ্রাম।

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়েছে যে, চাঁদ যেমন শুধু একটা দিক পৃথিবীমুখী করে থাকে ঠিক তেমন সূর্যের পানে একটা দিক মাত্র ফিরিয়ে রাখে বুধগ্রহ। এ অবস্থায় থাকলে পৃথিবীর দশা কী হত আমরা জানি। কিন্তু বুধের অবস্থা আরো অনেক খারাপ। সূর্যের আরো অনেক কাছে বলে পৃথিবীর চেয়ে সাতগুণ বেশী উত্তাপ পায় এর সূর্যাহত দিকটা।

এ দিকের তাপমাত্রা সেণ্টিগ্রেডের চার শ' ডিগ্রি। এ উত্তাপে টিন আর সীসে গলে যায়। বুধগ্রহে টিন বা সীসের পাহাড় থাকলে গলন্ত ধাতুর সাগরে পরিণত হত।

বুধের সূর্যাহত দিকে যা প্রচণ্ড গরম তার তুলনায় আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গায় সবচেয়ে গরম দিনগুলি অদ্ভুত ঠাণ্ডা।

বুধের যে দিকটা সূর্য কখনো দেখে না সেটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। এর তাপমাত্রা বহির্শূন্যের মতো প্রায়। বিজ্ঞানীদের হিসেবে, বুধের ঠাণ্ডা দিকটার তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের নিচে প্রায়

২০০ ডিগ্রি। বুধগ্রহে জল থাকলে সূর্যাহত দিকটার তাপে বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের প্রবল তাড়নায় যেত ঠান্ডা দিকটায়, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বরফ বনে যেত। মনে হয়, বুধে কখনো জল ছিল না, এত উচ্চ তাপে জল সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

মনে হয় বুধের কোনো বায়ুমন্ডল নেই। এ অবস্থায় বুধগ্রহে প্রাণী থাকা সম্ভব নয়।

বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

আমাদের চাঁদের মতো বুধকলা আছে, কিন্তু সেগুলি চোখে পড়ে শুধু দূরবীক্ষণের সাহায্যে।

পৃথিবী ও বুধ যখন সূর্যের একই দিকে তখন বুধের ঠান্ডা অন্ধকার পিঠ আমাদের দিকে ফেরে, কিন্তু অগোচর থাকে (১০০ পাতায় ছবি দেখো)।

পৃথিবী থেকে সূর্যের বিপরীত দিকে যখন তখন বুধগ্রহকে পুরো দেখা যায়। তবে সে-সময় আমাদের কাছ থেকে অতি দূরে। প্রথম বা শেষ পাদে, সূর্যের বাঁয়ে বা ডাইনে যখন বুধ, তখন সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা চলে তাকে। সাধারণত সূর্যের এত কাছে বলে বুধকে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন, সূর্যরশ্মিতে ঢাকা পড়ে।

শুক্র

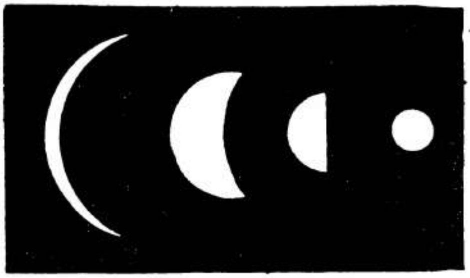
সূর্যাস্তের পর কখনো কখনো আকাশের পশ্চিমভাগে দেখা দেয় একটি অতি উজ্জ্বল তারা। এটি সন্ধ্যাতারা, অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অনেক আগেই এর আবির্ভাব। তারপর নিচের দিকে নেমে নেমে দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আকাশের পূবভাগে সূর্যোদয়ের আগে কখনো কখনো একটি অতি উজ্জ্বল তারার সাক্ষাৎ ঘটে। অন্য যে কোনো তারার চেয়ে বেশিক্ষণ থাকে এটি। আর সব তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু শুকতারা তখনো বর্তমান। দিগন্তে সূর্য দেখা দেবার পর এটি ঝাপসা হয়ে যায়।

সূর্যাস্তের আধ ঘণ্টাখানেক পরে বাইরে গিয়ে পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারার খোঁজ করো। খোঁজ পেলে পশ্চিম দিগন্তে এর মন্থর অধোগতি ভালো করে দেখ।

পশ্চিমে সন্ধ্যাতারার পাত্তা না মিললেও কাউকে বোলো যেন সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা আগে তোমাকে তুলে দেয়। বাইরে গিয়ে পূবপানে তাকিও — হয়ত একটি উজ্জ্বল তারা চোখে পড়বে।

রহস্যটার অর্থ কী? আসলে রহস্য কিছু নেই: শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা দুটি পৃথক তারা নয়, একটিই তারা, কখনো সকালে, কখনো সন্ধ্যেবেলায় চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে তো একেবারে দেখা যায় না তাকে। আর এই জ্যোতিষ্ককে তারা বলা ভুল — এটি



পৃথিবী সম্পর্কে শুক্রের বিভিন্ন মূর্তি।

তারা নয়, শুক্রগ্রহ। সৌন্দর্যদেবীর খাতিরে রোমানরা এর নাম দেয় ভেনাস।

ভেনাস সত্যিই অত্যন্ত সুন্দর গ্রহ। মৃদু শ্বেত দীপ্তি এর, উজ্জ্বলতার দিকে কোনো গ্রহনক্ষত্র এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।

হয়ত তোমরা ভাববে, 'এত উজ্জ্বল যখন, নিশ্চয়ই খুব বড়ো একটা গ্রহ।'

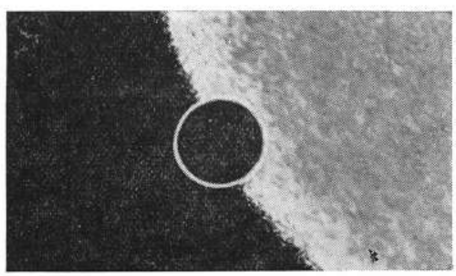
তা নয় কিন্তু। আমাদের গ্রহের চেয়ে শুক্র বড়ো নয়। শুক্র আর পৃথিবীকে মাঝে মাঝে বলা হয় যমজ।

শুক্রকে এত উজ্জ্বল ঠেকে তার কারণ চাঁদ বাদে এটি আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। শুক্র পৃথিবীর ৪ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার কাছে আসতে পারে, আর পৃথিবী ও প্লুটোর মধ্যে যে ব্যবধান তার তুলনায় এ দূরত্ব বাস্তবিক অত্যন্ত কম।

পৃথিবী-বর্ষের চেয়ে শুক্র-বর্ষ অনেক ছোট, ২২৫ দিন অর্থাৎ সাড়ে সাত পার্থিব মাস। শুক্রেরও কলা আছে, চাঁদ এবং বুধের মতো।

ভালো দূরবীক্ষণ যন্ত্রে শুক্রের দিকে তাকালে চোখে পড়বে কয়েকটি নিরাকার ছোপ, তার কয়েকটা উজ্জ্বল, কয়েকটা অন্ধকার। দেখতে অনেকটা মেঘের মতো। আর বায়ুমণ্ডল থাকলে তবে তো মেঘ ভাসতে পারে। তাই শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে নিশ্চয়ই। সে মণ্ডল খুব উঁচু আর ঘন।

শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে — এটা প্রথম ধরা পড়ে রাশিয়ার মিখাইল লমোনোসভের কাছে। এটি তিনি আবিষ্কার করেন ১৭৬১ সালে, প্রায় দুশ বছর আগে। তখন একটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা তিনি দেখেন — সূর্যের চক্রফলক হয়ে শুক্রগ্রহের যাত্রা। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সরাসরি লাইনে শুক্রগ্রহ থাকলেই এটা ঘটে: তখন গ্রহের আলোকিত দিকটা থাকে সূর্যের পানে আর অন্ধকার দিকটা আমাদের মুখে, তাই সূর্যের উজ্জ্বল মুখ হয়ে যাবার সময় এটিকে দেখায় অতি ক্ষুদ্র কালো একটি বৃত্তের মতন।



সূর্যের চক্রফলককে শুক্রের অতিক্রমণ।

সূর্যের কাছে শুক্রের আগমন মুহূর্তটিতে লমোনোসভ এর চার পাশে একটা ক্ষীণ আলোকবেষ্টনী দেখেন। তিনি ঠিকই ধরেন যে এটি শুক্রের সূর্যালোকিত বায়ুমণ্ডল।

একই সময়ে শুক্রকে পর্যবেক্ষণকারী অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লমোনোসভের মতো অবহিত ছিলেন না।

আলোর মালা তাঁদেরো চোখে পড়ে, কিন্তু জিনিসটা কী তাঁরা বোঝেননি। তাঁরা শুধু এই বলে আপত্তি করেন যে আলোকবেষ্টনীর জন্য সূর্যের চক্রফলকের প্রান্তে ঠিক কোন সময়ে শুক্রগ্রহের প্রান্ত পৌঁছয় সেটা তাঁরা ধরতে পারেননি।

কিন্তু লমোনোসভ লেখেন: '... শুক্রগ্রহ নিশ্চয়ই বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিবৃত... আমাদের পৃথিবীর চারদিকে যেমন ঠিক তেমন (তার চেয়ে বড়ো হয়ত)।'

লমোনোসভ যে এত স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন সেটা আশ্চর্য, কেননা তিনি মানমন্দির থেকে গ্রহটির গতি দেখেননি, হাতে-গড়া একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বাড়ির জানলা দিয়ে বাগিয়ে দেখেন।

সূর্যের চক্রফলক হয়ে শুক্রের গতি ঘটে কদাচিৎ। এ-রকম শেষবার ঘটে ১৮৮২ সালে, পরবর্তীটি ঘটবে ২০০৪ সালে। আমাদের পাঠকদের তখন অনেক বয়স, তাঁরা হয়ত সে বছর দূরবীক্ষণ ঘোরাবেন সূর্যের দিকে...



মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ লমোনোসভ (১৭১১—১৭৬৫)।

লমোনোসভের সময় থেকে বিজ্ঞান এগিয়েছে অনেক দূর। কোন কোন গ্রহে বায়ুমণ্ডল আছে শুধু সেটা যে জানেন বিজ্ঞানীরা তা নয়, তাঁরা বলতে পারেন সে বায়ুমণ্ডলে কোন কোন গ্যাস আছে।

তাঁরা জানেন শুক্রের বায়ুমণ্ডলে নাইট্রজেন আছে কিন্তু অক্সিজেন আছে কিনা এখনো অজ্ঞাত। এর অর্থ কী নিশ্চয়ই জানো। তার মানে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন পাঠাবার মতো কোনো উদ্ভিদ নেই শুক্রে, অথবা যা আছে তা অত্যন্ত নগণ্য। খুব অল্প যে আছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কেন এক্ষুণি জানতে পারবে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে শুক্র-দিন হল ২০ থেকে ২৪ পৃথিবী-দিনের সামিল

(সঠিক সংখ্যাটা এখনো জানা যায়নি, জানাটা অত্যন্ত কঠিন)। শুক্রে দিন আর রাত প্রত্যেকটি ১০ থেকে ১২ পার্থিব দিন আর রাতের মতো, অর্থাৎ প্রায় ২৫০-৩০০ ঘণ্টা। তাছাড়া, পৃথিবীর চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে; আলো ও উত্তাপ পায় দ্বিগুণ।

চন্দ্রলোকে আমাদের যাত্রার একটা কথা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় — সেখানকার দিন আর রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য অনেক বেশি, কেননা রাত আর দিন দুটোই ৩৫৪ ঘণ্টা দীর্ঘ। চাঁদের চেয়ে শুক্র সূর্যের অনেক কাছে, তাই বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিনরাতের তাপমাত্রার পার্থক্য আরো বেশি হবে সেখানে। দিনের বেলায় বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ঘন মেঘ সূর্যের জ্বলন্ত রশ্মি থেকে গ্রহপৃষ্ঠকে বাঁচায়। আর রাত্রে বায়ুমণ্ডলের দরুন উত্তাপ অতি তাড়াতাড়ি মহাশূন্যে বিলীন হয় না।

তবু শুক্রে দিবাভাগের তাপমাত্রা আমাদের পক্ষে অতিশয় বেশি — ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে। তার মানে শুক্রের মহাসাগরগুলি — আর বিজ্ঞানীদের মতে শুক্রে মহাসাগর বর্তমান — পৃথিবীতে ফুটন্ত জলের মতো গরম হবে।

শুক্রের রাত্রিভাগে মেঘস্তরের উত্তাপ মেপেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা — শূন্যাঙ্কের নিচে ২৩ ডিগ্রি। এটা সহনীয়। মস্কোয় এ তাপমাত্রাকে খুব কঠোর মনে করা হয় না।

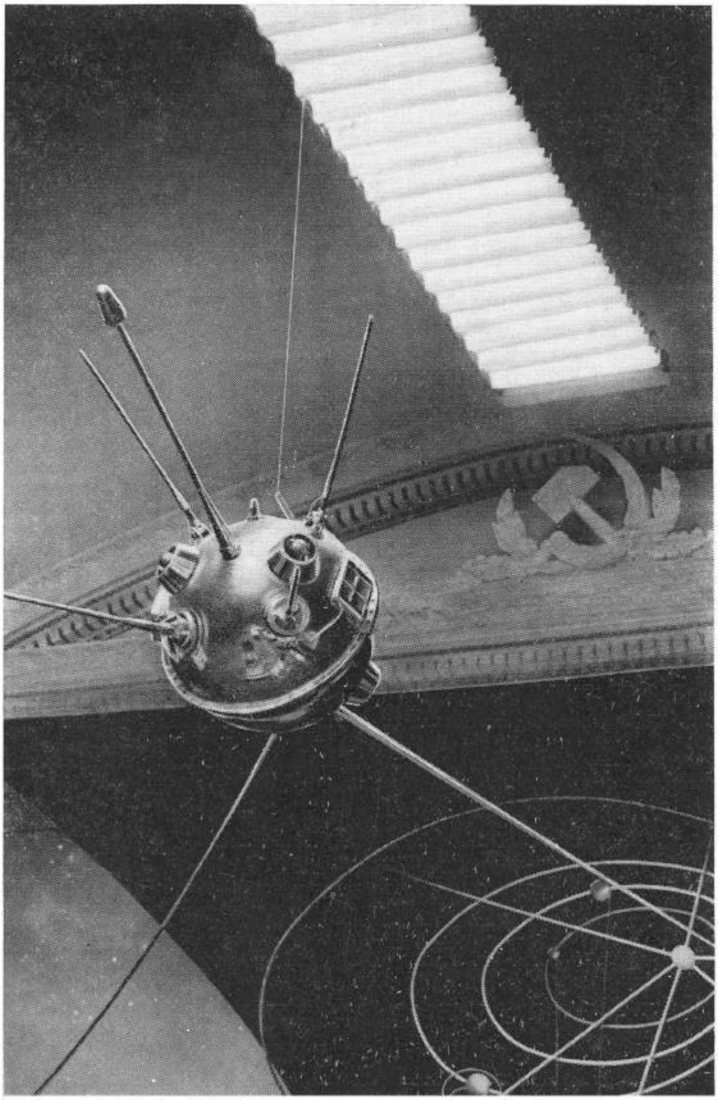
যা হোক, উদ্ভিদজীবন যে নেই তা বলা যায় না সুনিশ্চিতভাবে। পৃথিবীতে তো এমন জলজ উদ্ভিদ আছে যেগুলি উষ্ণ প্রস্রবণে বেঁচে থাকে। আর পৃথিবীর উদ্ভিদ আরো অনেক কঠোর শৈত্য সইতে শিখেছে। তাই খুব সম্ভব শুক্রে উদ্ভিদ আছে, খুব বেশি নয় কিন্তু, আর খুব বেশি দিন থেকে নয়, তাই এমন পরিমাণ অক্সিজেন তারা নিঃসৃত করতে পারেনি যাতে বিজ্ঞানীদের যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়ে।

হয়ত পৃথিবীতে যেমন, তেমন করে শুক্রগ্রহেও প্রাণের বিকাশ ঘটবে।

মানুষের তৈরি প্রথম গ্রহ

১৯৫৯ সাল, ২রা জানুয়ারি, সন্ধ্যা আটটা। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থানবিশেষে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শোনা গেল। সার্চলাইটের আলোতে উজ্জ্বল একটি অতিকায় বহুপর্যায়ী রকেট রাত্রির অন্ধকারে উপরে উঠল খরগতিতে, পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডলে পথ কেটে।

ঘটল অবিস্মরণীয় একটি ঘটনা, এমন একটি ঘটনা যার স্বপ্ন কত শতাব্দী ধরে দেখেছেন পৃথিবীর মহত্তম চিন্তাশীলরা। অন্ধকার সেই রাত্রে প্রথম আন্তঃগ্রহ যান বহিশূন্যে প্রবেশ করল। মানুষ ছিল না তাতে। এর গতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ডিজাইন অনুসারে সোভিয়েত কর্মীদের দ্বারা নির্মিত জটিল যন্ত্রপাতিতে নিয়ন্ত্রিত। যন্ত্রপাতি এত নিখুঁত



সোভিয়েত কৃত্রিম গ্রহ 'মেচতা' (স্বপ্ন)।

যে মহাশূন্য রকেটটি বরাদ্দ পথ অনুসরণ করে একটি পূর্ব-নির্ধারিত পয়েণ্টে চাঁদকে অতিক্রম করার পর আরো এগিয়ে সূর্যের গ্রহে পরিণত হল, গ্রহ-পরিবারের একটি সদস্য হয়ে দাঁড়াল সমান স্বাধিকারে। বিস্ময়বিমুগ্ধ মানবজাতি আবার সোভিয়েত জনগণের অক্ষয় বৈজ্ঞানিক কীর্তিকে তারিফ জানাল।

নতুন গ্রহটি খুব বড়ো নয় — এর বস্তুভর মাত্র ১,৪৭২ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে কয়েক কোটি গুণ ছোট। কিন্তু সৌরজগতের অন্য সব সদস্যের চেয়ে পৃথিবীর এই সন্তানটি আলাদা, কেননা পৃথিবী থেকে চাঁদে নিজের যাত্রা বিষয়ে কথা বলার ক্ষমতা একে দেয় লোকে। পথে যা কিছু পড়ল তার খবর এটি দিল অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে সর্ট-ওয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে। খবরগুলিকে বিশ্লেষণ করে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা জানলেন মহাশূন্যে কত উল্কাকণা ধাবমান, অতি উচ্চে কতো অনিবিড় গ্যাস, সূর্য থেকে আমাদের কাছে আসে শক্তির কত স্রোত, ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

প্রথম মহাশূন্যে-রকেট চাঁদের সবচেয়ে কাছের পয়েণ্ট অতিক্রম করে ৪ঠা জানুয়ারি, সকাল ৫·৫৯ মিনিটে (মস্কো সময়)। সে মুহূর্তে চাঁদের উপরিভাগ থেকে এর দূরত্ব হল ৫-৬ হাজার কিলোমিটার, চান্দ্র ব্যাসের প্রায় দেড় গুণের সমান এই দূরত্ব।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রলোকে যেতে রকেটটির লাগে ৩৪ ঘণ্টা, কিন্তু রকেটের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে প্রেরিত খবরগুলিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে বিজ্ঞানীদের লেগেছে অনেক মাস।

পৃথিবীর মহাকর্ষ অতিক্রম করার বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে যে রকেট যাত্রা শুরু করে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার যেতে তার কেন ৩৪ ঘণ্টা লাগল? লাগা উচিত ছিল তো ন ঘণ্টার একটু বেশি।

একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের কথা মনে রাখা দরকার — এটা হল পৃথিবীর মহাকর্ষ। একটা পরীক্ষার কথা ভাবা যাক। খেলার কামান থেকে পাতলা ইলাস্টিকে লাগানো ভারি একটা বল ছোড়া হল। কামানের নল থেকে ঝট করে বেড়িয়ে গেল বটে বলটা, কিন্তু ইলাস্টিক সেটাকে পিছুটান দিয়ে গতিবেগ কমিয়ে দিল। ইলাস্টিকটাকে ছেঁড়ার মতো গতি থাকলে বলটা আরো দূর যাবে, কিন্তু না ছিঁড়লে ফিরে আসবে।

পৃথিবীর মহাকর্ষকে তুলনা করা যায় একটি অদৃশ্য ইলাস্টিক সুতোর সঙ্গে। এ সুতো ক্রমে রকেটের গতি কমিয়ে দেয়, গতিবেগ খুব কমে গেলে অদৃশ্য সুতো রকেটটিকে টেনে ফিরিয়ে আনবে ধরাধামে। ১৯৫৮ সালে আমেরিকানরা চন্দ্রাভিমুখে যে চারটি রকেট ছোড়ে তাদের কপালে এমনটাই ঘটে। একটাও লক্ষ্যে পৌঁছয়নি, মহাকর্ষের শেকল ভাঙতে না পারায় সবকটা ফিরে আসে পৃথিবীতে।

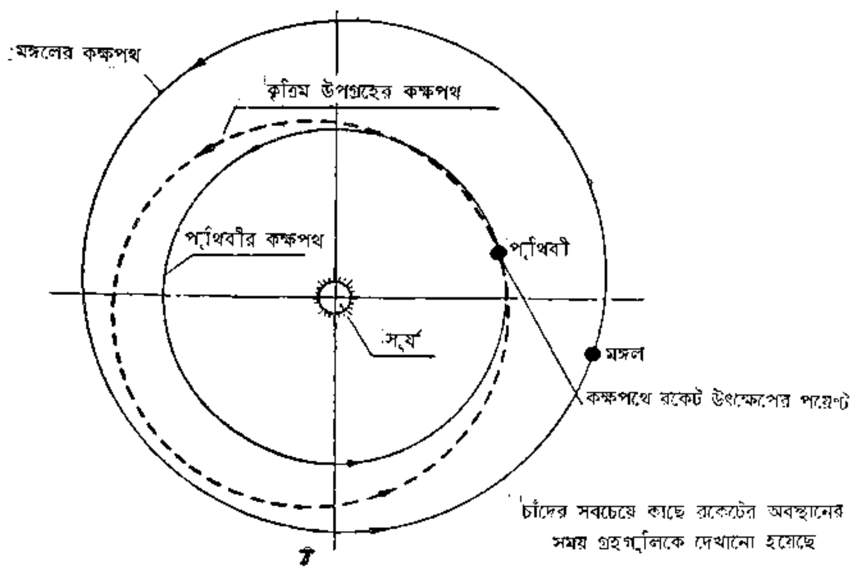
এ শেকলকে ছেঁড়ে একমাত্র আমাদের রকেট, ছিঁড়ে সূর্য পরিক্রমণের পূর্ব-নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রবেশ করে। তবু পৃথিবীর মহাকর্ষ বাধা দিয়ে এর গতিবেগ মন্থর করে। যা হোক, গতিবেগ যতটা ছিল তাতে রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে আসেনি বা চাঁদের টানে পড়েনি চাঁদে, যাত্রা চালিয়ে গেছে বহিশূন্যে।

পৃথিবী থেকে পালানো, চাঁদ থেকে পালানো রকেটটির কী হল তারপর?

বলেছি তো, সূর্য পরিক্রমার কক্ষপথে এটি প্রবেশ করে। কক্ষপথের অবস্থান ও মাত্রার হিসেব ১৯৫৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। দ্রুতকার্যক্ষম পরিগণক যন্ত্রে, যেটি হালের কয়েক বছরের একটি বৃহত্তম উদ্ভাবন, বিজ্ঞানীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই হিসেব করতে পারেন। যে গণনা করতে সুদক্ষ গণিতবিদদের কয়েক মাস লাগে সেগুলি এ যন্ত্রে হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই।

নতুন গ্রহের কক্ষপথটা কেমন?

দ্রাঘিত বৃত্তের মতো অনেকটা, কেন্দ্রের এক দিক থেকে সূর্যের দূরত্ব ২ কোটি ৫৮ লক্ষ কিলোমিটার। কক্ষপথে প্রদক্ষিণের সময়ে মানুষের তৈরি গ্রহটি অনুসূর অর্থাৎ সূর্যের সবচেয়ে নিকট পয়েন্টে (১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে) পৌঁছয়



প্রথম কৃত্রিম গ্রহের কক্ষপথ।

১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি। অপসূর অর্থাৎ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূর পয়েণ্টে (১৯ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার) হাজির হয় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে।

নতুন গ্রহটির বর্ষ, অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের কাল হল ১৫ মাস, আমাদের বর্ষের চেয়ে সিকিভাগ বড়ো।

সূর্য থেকে গ্রহটির গড় দূরত্ব হল ১৭ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের চেয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার বেশি। সৌরজগতের এই প্রথম কৃত্রিম গ্রহটির কক্ষপথ হল পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথের মাঝে। অতি অল্প দূরত্বের জন্য এটি পৃথিবীর কক্ষপথ অনুসরণ করে, তারপর মহাশূন্যের আরো গভীরে গিয়ে কাছে আসে মঙ্গলগ্রহের। মাঝে মাঝে মঙ্গল থেকে এর দূরত্ব মাত্র দেড় কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্বের প্রায় সিকিভাগ।

কক্ষপথে গ্রহটির বেগ সেকেণ্ডে ৩২ কিলোমিটার; এক বছরে এর যাত্রার দৌড় এক শ' কোটি কিলোমিটার।

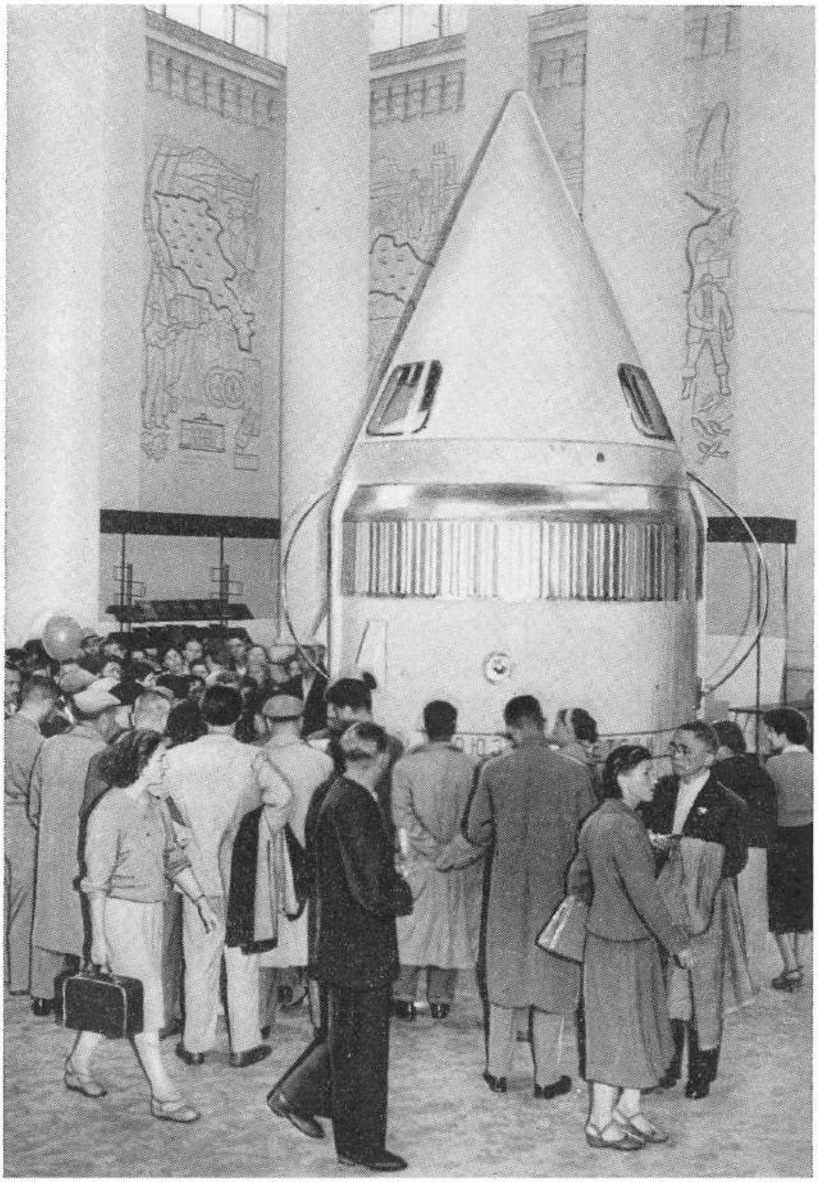
পৃথিবীকে সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ছেড়ে আর চাঁদকে সেকেণ্ডে মাত্র ২·৪৫ কিলোমিটার বেগে ছাড়িয়ে এত প্রচণ্ড গতিবেগ কোথা থেকে পেল গ্রহটি? কারণটা সহজ: উৎক্ষেপণ-মঞ্চে থাকার সময়েই রকেটটি মহাশূন্যে সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে গতিশীল ছিল। অবাক হবার কারণ নেই: তুমি, আমি, পৃথিবীর সবকিছু সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় এক লক্ষ কিলোমিটারের বেশি বেগে সূর্যকে ঘিরে ছুটি, যদিও ব্যাপারটা অলক্ষিত।

আর একটা কথা কখনো ভুলে গেলে চলবে না: এ বইতে উল্লিখিত সমস্ত বেগ — প্রথম ও দ্বিতীয় মহাজাগতিক বেগ, চাঁদের কাছে রকেটটির বেগ — সব দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রের সূত্রে, আমাদের আপন সেই পৃথিবী যাতে আমরা এত সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ যে তাকে ছেড়ে গেলেও সূর্যঘটিত তার বেগ আমরা বহন করি।

বলবিদ্যার বিধিনিয়ম থেকে আমরা জানি যে একদিক মুখী বেগগুলিকে যোগ দিতে হয়। স্টীমার ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ভাটায় চলেছে, তার ডেকে ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার বেগে দৌড়লে নদীতীরের যে কোনো পয়েণ্টের সূত্রে তোমার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার।

সূর্য প্রদক্ষিণের কক্ষপথে প্রবেশের সময় রকেটটির বেগ ছিল সেকেণ্ডে ২ কিলোমিটার। এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে সূর্যঘটিত বেগকে, সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার, যে বেগ পৃথিবী ত্যাগের মুহূর্তে এটির ছিল এবং বজায় থাকে; এ ভাবে সেকেণ্ডে বেগ হল ৩২ কিলোমিটার।

মানুষের তৈরি প্রথম গ্রহ বহন করেছে 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন, জানুয়ারী, ১৯৫৯' উৎকীর্ণ গর্বিত ধাতু-গোলক। কক্ষপথে কোটি নিযুত বছর ধরে বাহিত



মানুষের তৈরি প্রথম গ্রহকে যে সোভিয়েত মহাশূন্য-রকেটটি ছাড়ে তার শেষ পর্যায়।

হবে গোলকটি, অবশ্য যদি মহাজাগতিক কোনো দুর্বিপাক না ঘটে, যদি বড়ো উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা না লাগে বা ভবিষ্যতে মহাশূন্যযানে গিয়ে লোকে এটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে না আনে — বহিঃশূন্যের বিজয় সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের অপূর্ব সাফল্যের মহান স্মারক তো এটি।

কোপের্নিকাস, গালিলিও এবং ব্রুনোর মতবাদ যে সঠিক তার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিয়েছে মানুষের তৈরি গ্রহটি।

প্রথম কৃত্রিম গ্রহটি বহু দিন পর্যন্ত একা ছিল; পরে আরো দুটি গ্রহ, অনেক ছোট কিন্তু, উৎক্ষিপ্ত করেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

মঙ্গলগ্রহ

প্রাচীন কালের লোকেরা একটি গ্রহকে ডরাত। তার চেহারাটা পরাক্রান্ত কোনো দেবতার টকটকে লাল চোখের মতো, যে চোখ সক্রোধে তাকিয়ে আছে সুদূর পৃথিবীর দিকে। লাল গ্রহটির নাম রোমানরা দেয় মার্স, যুদ্ধদেবতা।

সূর্য ও মঙ্গলের গড় দূরত্ব ২২ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার — সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের দেড় গুণ বেশি। বিরাট দূরত্ব মাপের জন্য পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে বিজ্ঞানীরা বলেন — ১৫ কোটি কিলোমিটার — এটা একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট। মঙ্গল থেকে সূর্যের দূরত্ব তাহলে দেড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট।

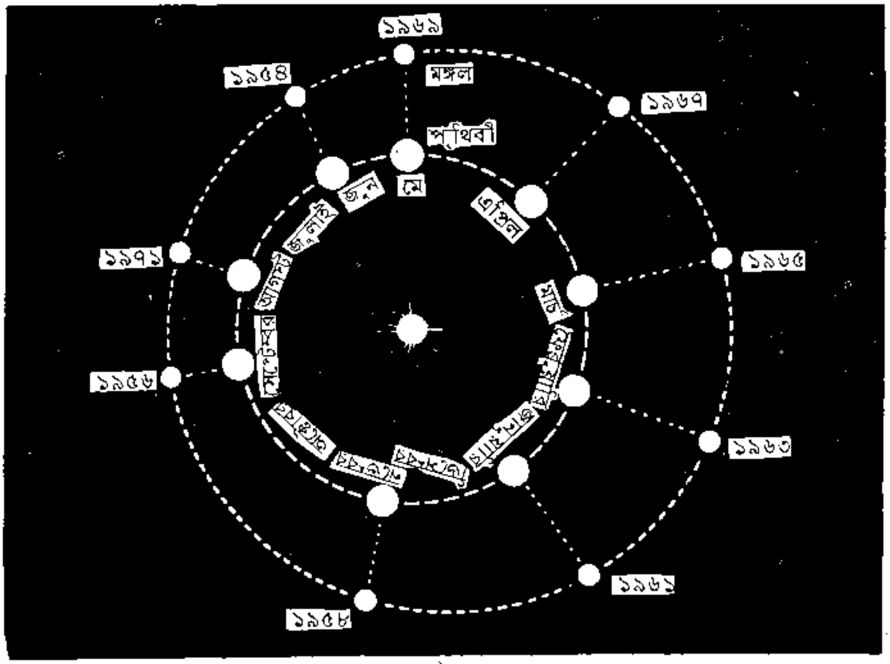
মঙ্গল দেখার সবচেয়ে সুবিধাজনক সময় কখন? দুটি গ্রহ যখন সূর্যের একই দিকে, তখন নিশ্চয়ই। এ অবস্থায় পৃথিবী ও মঙ্গল থাকলে বলা হয় মঙ্গলবিরোধী অবস্থায়। দু বছরে একবার করে এটা ঘটে। বিরোধী অবস্থায় পৃথিবীর ৭ থেকে ১০ কোটি কিলোমিটার কাছে আসে মঙ্গল।

প্রতি পোনেরো-সতেরো বছর অন্তর ঘটে মহা-বিরোধিতার একটা অবস্থা। এ সময়ে মঙ্গল ও পৃথিবী পরস্পরের সবচেয়ে কাছে আসে — দূরত্বটা মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি কিলোমিটার।

১৯৫৬ সালে মঙ্গলের একটা মহাবিরোধিতা লক্ষীভূত হয়। সে-সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আবার আকৃষ্ট হয় গ্রহটিতে।

বিরোধিতার সময় মঙ্গল একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক।

সূর্যের দুই বিপরীত দিকে পৃথিবী ও মঙ্গল থাকলে মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণ করা অতি কঠিন। এ সময়ে তাদের ব্যবধান ৪০ কোটি কিলোমিটার। এত দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে খুব কম জ্যোতির্বিজ্ঞানীই রাজী হবেন।



মঙ্গলের বিরোধী অবস্থা, ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১।

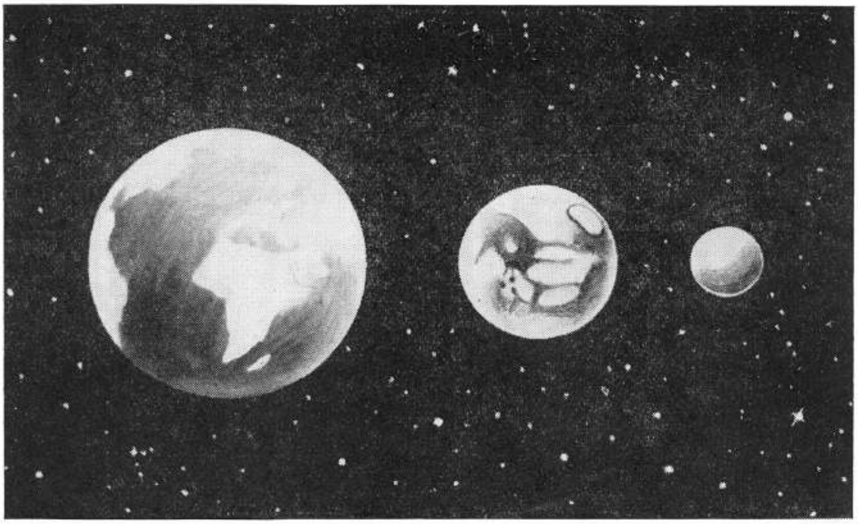
মঙ্গল ছোট একটি গ্রহ, ব্যাস মাত্র ৬,৮০০ কিলোমিটার, চাঁদের দ্বগুণ। এর আয়তন পৃথিবীর এক-সপ্তমাংশের অল্প বেশি।

১১২ পৃষ্ঠায় মঙ্গলের ড্রয়িংটি ১৯০৯ সালে করেন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আন্তনিয়াদি। গ্রহের প্রান্তে সাদা ছোপটা হল মঙ্গলের মেরুচূড়া, বরফের আচ্ছাদন। কালো ছোপ আর ডোরা দাগগুলো মঙ্গলের সমুদ্র; বিস্তৃত লালচে-হলদে দাগগুলো শুকনো ডাঙা।

মঙ্গলের অধ্যয়ন-ইতিহাস খুব চিত্তাকর্ষক।

ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কিয়াপারেল্লি (১৮৩৫—১৯১০) অনেক বছর ধরে খুঁটিয়ে গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৭৭ সালে মঙ্গল যখন মহাবিরোধিতার অবস্থায়, তখন আবহাওয়া ভালো থাকলে প্রতি রাত্রে দেখতেন স্কিয়াপারেল্লি। মঙ্গলের যে মানচিত্র তিনি এঁকেছেন আর কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী কখনো তেমনটা করেননি।

প্রথম তাঁর চোখে পড়ে কালো ছোপগুলো। দূর থেকে স্থলের চেয়ে জলকে সর্বদা বেশি কালো মনে হয়, তাই তিনি নাম দিলেন মঙ্গল-সমুদ্র। তারপর দেখলেন সমুদ্রগুলির



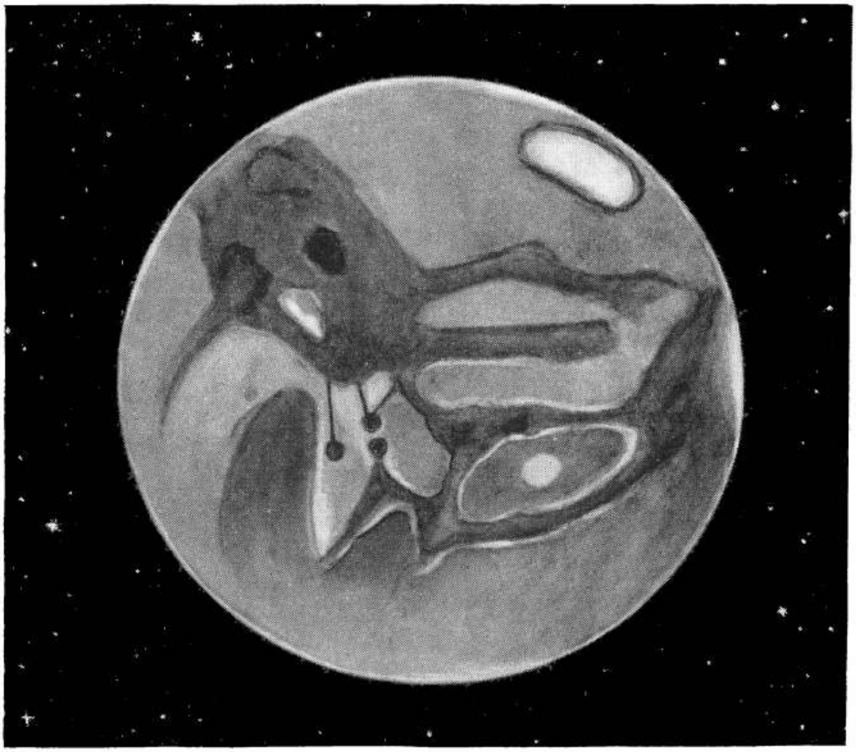
পৃথিবী, মঙ্গল ও চাঁদের তুলনামূলক আয়তন।

মধ্যে কয়েকটি সরু কালো রেখা, মনে হল সমুদ্রগুলিকে যুক্ত করেছে এগুলি। এদের নাম তিনি দিলেন খাল বা প্রণালী।

হতচকিত পৃথিবী হৈচৈ করে উঠল:

'ইতালির স্কিয়াপারেল্লি না কি মঙ্গলগ্রহে খালের খোঁজ পেয়েছেন! খাল খুঁড়তে পারে শুধু মানুষ বা কোনো চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণী। আর ওদের যন্ত্রসম্ভার তাহলে তো দারুণ! খালের যা ঠাসবুনোট মঙ্গলগ্রহে তেমনটা এমন কি আমরা, পৃথিবীবাসীরা, করতে পারিনি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাহলে তো ওদের খালগুলো চওড়ায় কয়েক ডজন, এমন কি কয়েক শ' কিলোমিটার হবে!'

পত্রপত্রিকায় মঙ্গল ও সেখানকার বাসিন্দেদের বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ বেরোতে লাগল। মঙ্গলগ্রহবাসীদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লেখকেরা। মাথা-গরম লোকেরা বলল অবিলম্বে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। কয়েকজন বলল, আলোকসঙ্কেত পাঠানোর জন্য বিরাট আয়না ব্যবহার করতে হবে। অন্যরা প্রস্তাব করল, সাইবেরিয়ায় বিস্তৃত সমভূমিতে জ্যামিতিক নকসা এঁকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের বোঝানো হোক যে পৃথিবীতে চিন্তাচৈতন্যসম্পন্ন প্রাণীরা থাকে। নকসাগুলোর লাইন তো কয়েক শ' কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বিশ-ত্রিশ কিলোমিটার চওড়া না করলে নয় (দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এত বড়ো না হলে মঙ্গলগ্রহবাসীরা তো টেলিস্কোপে দেখতে পাবে না); তাই আরো বলা হল



আন্তনিয়াদির আঁকা মঙ্গলের ড্রয়িং।

যে লাইনগুলো হবে গমের — মঙ্গলগ্রহের টেলিস্কোপে তাহলে কালো মাটির বুকে সোনালী গমের রেখা সহজে ধরা পড়বে।

মঙ্গলগ্রহবাসীদের সঙ্গে সলাপরামর্শ চালানোয় খরচ হত দারুণ, তাই শুরুর চেষ্টা পর্যন্ত কেউ করেনি। কিন্তু সারা দুনিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরো উৎসাহে মঙ্গলের খালগুলোকে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

জানা ছিল যে ১৯০৯ সালে মহাবিরোধিতার একটা অবস্থা আসবে, ধরা হল যে তখন মঙ্গলগ্রহের খালগুলির বিষয়ে একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় আসা যাবে।

মঙ্গলকে পর্যবেক্ষণের জন্য আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী লোয়েল এ্যারিজোনা মরুভূমির মালভূমিতে এমন কি একটা বিশেষ বীক্ষণাগার বানালেন। সেখানকার হাওয়া অত্যন্ত নির্মল, বড়ো সহরের ধোঁয়া আর ঝুল পর্যবেক্ষণে ব্যাঘাত ঘটাবে না। বীক্ষণাগারের

জন্য বিশেষ একটা টেলিস্কোপ জোগাড় হল — অত্যন্ত শক্তিশালী টেলিস্কোপ — লেন্সের ব্যাস ৬৬ সেণ্টিমিটার।

১৯০৯ সাল। সারা দুনিয়ার টেলিস্কোপ প্রকান্ড কামানের মতো মঙ্গলগ্রহের দিকে উঁচিয়ে আছে। তারপর এ্যারিজোনা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বাকি পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুরু হল একটা বিবাদ। কিছুদিন সে আলোচনায় যোগ দেননি শুধু পুল্কোভোর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

লোয়েল ও তাঁর বন্ধুরা জোরগলায় বললেন যে মঙ্গলগ্রহে খাল বর্তমান। সব সময় সেগুলি দৃশ্যমান নয়, মেরুতুষার গলে গেলে আস্তে আস্তে আসে দৃষ্টিপথে। তার মানে এ সময়ে খালগুলি জলে ভরে যায়।

এ্যারিজোনার পর্যবেক্ষকদের মতে, মঙ্গলের খালগুলির জল বসন্তকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে ধায় আর হেমন্তে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

কিন্তু মহাকর্ষবলে জল প্রথম এক দিকে এবং পরে বিপরীত দিকে যেতে পারে না। তাই লোয়েল ও তাঁর সমর্থকরা বললেন, খালে জল পাঠানো হয় বিরাট পাম্পের সাহায্যে। আর পাম্প বানাতে পারে শুধু বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী, অতি উচ্চ ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যা যাদের আয়ত্তে সে-ধরনের প্রাণী।

লোয়েল-পন্থীরা বললেন, 'এ থেকে মঙ্গলগ্রহবাসীদের অস্তিত্ব বেশি করে প্রমাণিত হয়।'

কিন্তু দুনিয়ার বেশির ভাগ জ্যোতির্বিজ্ঞানী — তাঁদের মধ্যে বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের অভাব ছিল না — ঘোষণা করলেন যে মঙ্গলগ্রহে কোনো খাল তাঁদের চোখে পড়েনি।

খালবিরোধীরা বললেন ব্যাপারটা দৃষ্টিবিভ্রম। বললেন, 'একটা কাগজের টুকরোয় কয়েকটি দাগ আর ছোপ আঁকো এলোমেলোভাবে। তারপর দেখো দূর থেকে। মনে হবে দাগ আর ছোপগুলো লাইন বেঁধে জোড় খেয়েছে।'

আরো বললেন তাঁরা যে খাল চোখে পড়েছে শুধু মাঝারি আকারের টেলিস্কোপে। অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপে খাল নজরে আসে না, দেখা যায় শুধু অবিন্যস্ত কালো ছোপ।

সে-সময়কার বৃহত্তম টেলিস্কোপ, এক মিটার ব্যাসের ইয়েৰ্কস-এর টেলিস্কোপ যে সব আমেরিকান পর্যবেক্ষক ব্যবহার করেন তাঁরা বললেন, 'মঙ্গলগ্রহের খালের পক্ষে বড্ড জোরালো টেলিস্কোপ!'

টেলিস্কোপে গ্রহনক্ষত্র দেখা বেশ কঠিন। এমন কি বহু বছরের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরাও মাঝে মাঝে ভুল করে পর্যবেক্ষণ থেকে বেঠিক মীমাংসায় পৌঁছন।

মঙ্গলগ্রহে খাল থাকা না থাকার বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক একটা বিরোধ বলে যেটাকে মনে হয় সেটা আসলে অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কিনা সেই আলোচনার অন্তর্গত। সাহসী ও চিন্তাশীল ব্রুনোর কালেও এ প্রশ্ন নিয়ে মতান্তর ছিল।

চার্চ কেন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারার দণ্ডাজ্ঞা দেয়? কারণ তিনি বলেছিলেন: 'অগণিত গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব। বিশ্বজগতে প্রাণের বৈচিত্র্যের শেষ নেই; অসীম জগতে ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো আমাদের এই পৃথিবীতে শুধু বুদ্ধিসত্তার বিরাজ — এটা ভাবা হাস্যকর।'

মহৎ এই প্রতিভাবান ব্যক্তির অদ্ভুত আন্দাজ যেন মঙ্গলগ্রহে খালের আবিষ্কারে সত্য প্রমাণিত হল।

ঠিক এ-সময় পুল্কোভো মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণের খবর বেরোল। নবীন দুটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী — তিখভ ও কালিতিন — মঙ্গলগ্রহের খালগুলির ফটো তুলতে সক্ষম হন। দেখা গেল সংখ্যায় সেগুলো অনেক — দীর্ঘ ও হ্রস্ব, চওড়া ও সঙ্কীর্ণ।

আজ মঙ্গলের একটি সবিস্তার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। তাতে দু তিন থেকে তিন শ কিলোমিটার চওড়া খালের সংখ্যা হাজারের বেশি। কয়েকটি খাল পড়েছে গোল অন্ধকার ছোপে — এগুলিকে বলা হয় হ্রদ বা মরূদ্যান।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিন্তু বিশ্বাস করেন না যে খালগুলি কেউ নির্মাণ করেছে। খালগুলি কী, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

কয়েকজনের বিশ্বাস, এগুলো হল মজা নদীগর্ভ। অন্যরা বলেন, শুকিয়ে-যাওয়া মাটির ফাটল, অতিকায় খাদের মতন।

আর একটি মত হল যে, এগুলি আশেপাশের ভূমিদৃশ্যের চেয়ে কালো ঘন উদ্ভিদে আবৃত আর্দ্র মাটি।

খুব সম্ভব তৃতীয় মতটাই সঠিক। মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্মকালে খালগুলিতে ঘন-সবুজ একটা ছোপ, হেমন্তে রং আরো ফিকে।

খাল আর সমুদ্রের রংবদলের জন্য (ঋতু অনুসারে সমুদ্রগুলিরও রং বদলায়) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে মঙ্গলে উদ্ভিদ বর্তমান।

কয়েকজন সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, মঙ্গলগ্রহে গাছপালা আছে, শীতকালে ওক আর বার্চের মতো এদের পাতা খসে পড়ে, অন্য গাছ আবার কোনিফারের মতো বহুঋতু স্থায়ী।

মঙ্গলের সমুদ্রগুলি হয়ত সবুজ গাছপালায় আবৃত জলাভূমির প্রসার।

মাটির রঙের জন্য মঙ্গলকে লালচে দেখায়। পৃথিবীতে এ রং হল কাদা আর বালির মরুভূমির। মঙ্গলের অধিকাংশ শুকনো জায়গা, বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে মরুভূমির রাজত্ব, এটা হয়ত নিরাপদে ধরে নেওয়া চলে।

বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু অত্যন্ত অনিবিড়। পৃথিবীর ১৮ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে যে-রকম চাপ ঠিক তেমন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মঙ্গলের উপর। মঙ্গলের উপরিভাগে মানুষের মনে হবে যে, বেলুনে-জোড়া খোলা ঝুড়িতে প্রচণ্ড উঁচুতে উঠেছে। আমাদের অতি উচ্চগামী

বেলুনগুলিতে নিশ্ছিদ্র ক্যাবিন থাকে, আর মঙ্গলগামী প্রথম আন্তঃগ্রহ অভিযাত্রীদেরও বিশেষ পোষাক চড়াতে হবে রকেটযান থেকে বেরোবার সময়ে। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের মহাকর্ষ প্রায় আড়াই গুণ কম, তাই পোষাকগুলোয় খুব একটা অসুবিধে হবে না।

মঙ্গলের আবহাওয়া কঠোর। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে দেড় গুণ বেশি দূরে বলে পৃথিবীর চেয়ে আলো আর তাপ পায় দু গুণ কম।

একটি বিষয়ে কিন্তু বুধ বা শুক্রের চেয়ে মঙ্গলের অবস্থা অনেক ভালো, পৃথিবীর মতো: মঙ্গলগ্রহে দিন ও রাত, নিজের মেরুদণ্ডে আবর্তন কাল প্রায় পৃথিবীর মতো, ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। দিন আর রাত প্রায় আমাদের মতোই, আর দিন ও রাত এ-রকম সংক্ষিপ্ত হলে গ্রহ অতিগরম বা অতিঠাণ্ডা হয় না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মঙ্গলের মেরুদণ্ড আনত হয়েছে যে শীর্ষকোণ থেকে সেটা প্রায় অবিকল পৃথিবীর মতো, তাই ঋতুগুলি — বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত সমান। অবশ্য তাদের মেয়াদ অনেক বেশি। পৃথিবীর চেয়ে মঙ্গলের কক্ষপথ, সূর্য প্রদক্ষিণের পথ অনেক বেশি দীর্ঘ, গতিও মন্থরতর, তাই একটি সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণে লাগে ৬৮৭ পার্থিব দিন বা ৬৬৯ মঙ্গল-দিন।

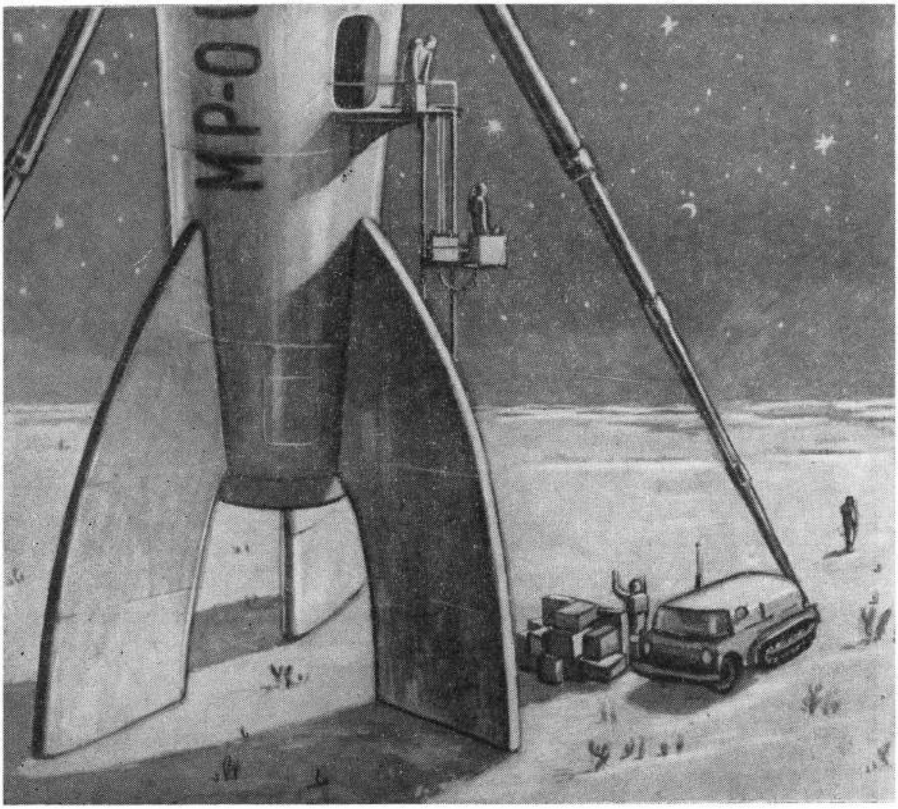
মঙ্গলের তাপমাত্রা কেমন?

সবচেয়ে গরম অংশে, বিষুবরেখায়, দিনের তাপ ২০ ডিগ্রির (সেণ্টিগ্রেড) ওপরে ওঠে না, রাত্রে নামে শূন্যাঙ্কে, সূর্যোদয়ের সময় শূন্যাঙ্কের নিচে ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত শৈত্য।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতে তাপমাত্রা নামে শূন্যাঙ্কের ৭০-৮০ ডিগ্রি নিচে আর মেরুতে শূন্যাঙ্কের ১০০ ডিগ্রি নিচে।

মঙ্গলগ্রহে একটি দিনের মধ্যে গরম থেকে হঠাৎ খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে। এ-রকম আবহাওয়ায় দিনের বেলায় আমরা বিনা কোটে বাইরে যেতাম আর রাতে ভারি ফারকোট চাপিয়ে বাড়িতে আগুন জ্বালতে হত।

মঙ্গলের একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হল মেরুতুষারের গলন। শীতকালে বরফক্ষেত্র ব্যাসে তিন-চার হাজার কিলোমিটার, গ্রীষ্মকালে আয়তন কমে, হেমন্ত নাগাদ পড়ে থাকে শুধু সাদা সাদা ছোপ। মাঝে মাঝে বরফ তো একেবারে পাততাড়ি গুটোয়। গলন্ত বরফ থেকে জল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গিয়ে নতুন জীবন দেয় সমুদ্র আর খালগুলিকে, সত্বর চাড়া দেয় সবুজ গাছপালা। আমাদের পৃথিবীতে মেরুতুষার (যেমন গ্রীনল্যাণ্ড এবং কুমেরুতে) হাজার হাজার বছর ধরে গলেনি বলে অসম্ভব পুরু। গ্রীষ্মকালে কিনারায় শুধু হিমমুকুট কিছু গলে, কিন্তু শীতে জমে আরো বরফ। মঙ্গলের হিমমুকুট যে খুব তাড়াতাড়ি গলে তা থেকে বোঝা যায় যে এদের ঘনত্ব কয়েক সেণ্টিমিটারের বেশি নয়।



মঙ্গলে আন্তঃগ্রহ অভিযাত্রীদের আগমন।

মঙ্গলের বেশির ভাগ হল শুকনো প্রাণহীন মরুভূমি। জল খুব সম্ভব ফাটল হয়ে চুঁইয়ে ঢুকেছে গ্রহের অভ্যন্তরে, প্রতি বছর উপরিভাগে জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলও আরো পাতলা হয়ে আসছে, কেননা উচ্চ স্তরের গ্যাসকণা বিলীন হচ্ছে মহাশূন্যে, পৃথিবীর চেয়ে ক্ষীণ মহাকর্ষ তাদের আটকে রাখতে পারে না।

মঙ্গলের দুটো ছোট্ট চাঁদ বা উপগ্রহ। এরা আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৭ সালে, নাম দেওয়া হয় ফোবস ও দেইমস — গ্রীক শব্দদুটির মানে 'ভয়' আর 'বিভীষিকা' — যুদ্ধদেবতার অনুচরদের উপযুক্ত নামই বটে!

প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে মঙ্গলে: জল, অক্সিজেন এবং বায়ুমণ্ডল,

আছে গাছপালা, দিন রাতের পরিক্রমা, ঋতু। এ অবস্থায় পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়। সত্যি বটে, পৃথিবীর তুলনায় অবস্থাটি আরো কঠোর, কিন্তু লক্ষ কোটি নিযুত বছরের মধ্যে একে মানিয়ে নিতে পারে জীবসত্তা। এত দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর মানুষের মতো উচ্চ সভ্য জীব বিকশিত হতে পারে।

তাহলে মঙ্গলগ্রহে নগর-সহর দেখি না কেন?

হয়ত ওখানকার বাসিন্দেরাও ভাবে পৃথিবীর কোনো সহর-নগর নজরে আসে না কেন? হয়ত তারা ভাববে পৃথিবীতে প্রাণধারণ অসম্ভব। এই অগ্নিকুণ্ড গ্রহের নিদারুণ তাপে কে বাঁচতে পারে?

টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে গেলে দশ কোটি কিলোমিটার দূরেকার বাড়ি ঘরদোরকে হতে হবে অতি বিরাট আয়তনের — দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কয়েক ডজন কিলোমিটার। মঙ্গলে লোক থাকলেও মস্কো, লেনিনগ্রাদ বা প্যারিস দেখা তাদের পক্ষে অতি কঠিন যে হবে — পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধা বাদ দিলেও — তা সহজে ধরে নেওয়া চলে।

আমাদের প্রথম আন্তঃগ্রহ অভিযাত্রীরা ওখানে পেঁছিনোর আগে জানা যাবে না মঙ্গলে বুদ্ধিসত্তা আছে কিনা।

মঙ্গলের বিষয়ে আলোচনা বুধ শুক্রর চেয়ে অনেকখানি বেশি জায়গা নিল। এটা স্বাভাবিক, কেননা পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক গ্রহ হল মঙ্গল।

গ্রহাণুপুঞ্জ

অনেক দিন আগেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে বড়ো একটা ফাঁক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখতে পান। সেখানে আর একটা গ্রহের উপস্থিতি নিয়ে নানা গণনা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

অনেক দিন ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহটির সন্ধানে থাকেন — অনেকে বললেন ওটা নেই, আবার কেউ কেউ বললেন আছে, তবে এত ছোট যে টেলিস্কোপে ধরা পড়ে না।

১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে খুদে একটা গ্রহ আবিষ্কার করলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নাম দিলেন সীরিস, শ্যামল শস্যের রোমান দেবীর নাম। ব্যাস যখন মাপা হল তখন দেখা গেল অত্যন্ত ছোট — মাত্র ৮০০ কিলোমিটার।

'গ্রহের ভিড়ে খুদকণা,' বললেন বিজ্ঞানীরা। 'চাঁদের আশি ভাগের এক ভাগ, পৃথিবীর চেয়ে চার হাজার গুণ ছোট। যাকগে, তবু তো প্রমাণ হল মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে কিছু একটা আছে!'

বছরখানেক পরে সীরিসের মতো খুদে একটা গ্রহ আবিষ্কৃত হল সূর্য থেকে প্রায় সমান দূরত্বে। এতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটু চিন্তায় পড়লেন — আর একটা গ্রহ তাঁদের

হিসেব মতো থাকতে তো পারে না। যা হোক, আছে যখন নাম তো একটা দিতে হবে। নাম হল পাল্লাস, গ্রীকদের যিনি সরস্বতী।

সত্বর তর্কের আরো একটা বড়ো সূত্র পাওয়া গেল: ১৮০৪ সালে তৃতীয় একটি গ্রহ ধরা পড়ল — জুনো — আর ১৮০৭-এ আর একটি, ভেস্তা।

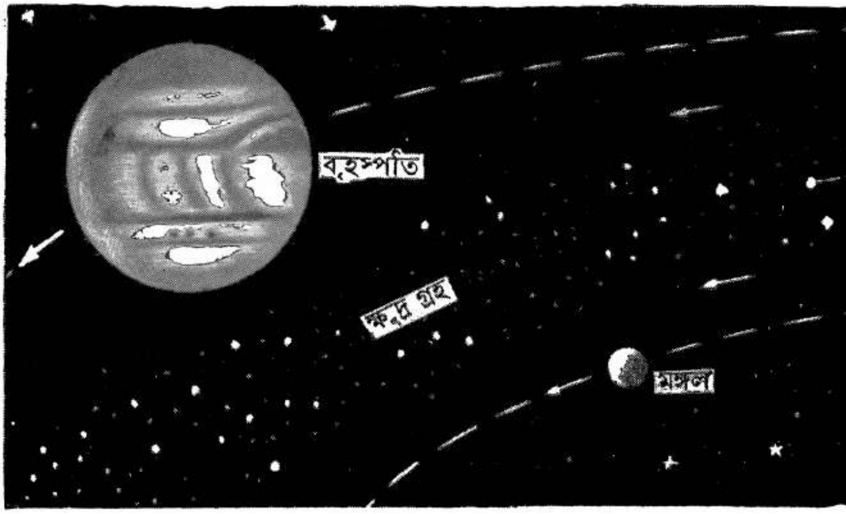
বেশ চিন্তার খোরাক হল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। একটা প্রত্যাশিত বড়ো গ্রহের জায়গায় চারটে খুদে ধরা পড়েছে, আর ব্যাপারটা ভালো লাগুক, মন্দ লাগুক, মনে করতেই হবে যে এগুলো বিনষ্ট একটি বড়ো গ্রহের টুকরো। মনে হয় কোনো এক কালে মহাশূন্যে দারুণ একটা দুর্বিপাক ঘটে, ঘটে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি কোথাও; সে-সময় বড়ো একটা গ্রহ ভেঙে কয়েকটা খণ্ডে পরিণত হয়।

এ ধারণাটা উনিশ শতকের অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ভালো লাগেনি। বিখ্যাত জার্মান গণিতবিশারদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল গাউস একজন বন্ধুকে লেখেন: 'ধরুন, কয়েক বছরের মধ্যে জানলাম যে এককালে সীরিস ও পাল্লাস একটা অখণ্ড দেহ ছিল। মানুষের স্বার্থের দিক দিয়ে এ-রকম একটা সিদ্ধান্ত অবাঞ্ছনীয় হবে। ভেবে দেখুন কী ভীষণ আতঙ্ক জাগবে লোকের মনে, ধর্মে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে কেমন একটা সংগ্রাম শুরু হবে, কেউ বা ভগবদ্বিধানকে সমর্থন করবে, কেউ বা উড়িয়ে দেবে! গ্রহ বিনষ্ট হতে পারে এ কথাটা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করলে, এ-সব তো ঘটবেই। সৌর জগৎ অপরিবর্তনশীল, এ কথাটার ওপর যাঁরা তত্ত্ব বানিয়েছেন তাঁরা কী বলবেন! কী বলবেন তাঁরা যখন দেখবেন যে তাঁদের সব তত্ত্বের বনিয়াদ হল বালি, প্রাকৃত শক্তির একটা অন্ধ আকস্মিক লীলারই রাজত্ব সবখানে। আমার নিজের তো মনে হয়, এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত হবে না...'

দেখা গেল পাল্লাস, জুনো ও ভেস্তা সীরিসের চেয়ে ছোট। পাল্লাসের ব্যাস প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, ভেস্তার প্রায় ৪০০ আর জুনোর মাত্র ২০০। এদের মধ্যে শুধু ভেস্তা কখনো সখনো খালি চোখে দৃশ্যমান, অন্যগুলিকে দেখা যায় শুধু টেলিস্কোপে উজ্জ্বল বিন্দুর মতো। এ কারণে তাদের নাম গ্রহিকা বা তারার মতো জ্যোতিষ্ক। টেলিস্কোপে গ্রহদের চেহারা চক্রফলকের মতো, তারাদের মনে হয় উজ্জ্বল বিন্দু।

সীরিস ও তার প্রতিবেশীরা বামন-গ্রহ। কালক্রমে অবশ্য বোঝা গেল যে একই পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় তারা রীতিমতো প্রকাণ্ড, আর পরিবারটা দেখা গেল নেহাৎ ছোট নয়। ভেস্তা আবিষ্কারের ৩৮ বছর পরে সে পরিবারের পঞ্চম সদস্য ধরা পড়ে। এতদিন লোকে ভাবত যে উপরোক্ত চারটে খুদে গ্রহই সব। ১৮৪৫ সালে একজন সৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী দর্শন পেলেন পঞ্চমটির, এর নাম হল আসত্রায়া।

অনেক সৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী তখন টেলিস্কোপ ঘোরালেন মহাকাশের দিকে।



গ্রহাণুপুঞ্জ।

বেশির ভাগ বাড়িতে-তৈরি টেলিস্কোপ। ব্যাপারটা বেশ মনের মতো — বহিশূন্যে নতুন একটা গ্রহের খোঁজ। একমাত্র তাঁদের দরকার ধৈর্য। প্রতি রাত্রে আকাশের একটা অংশে নজর রাখতে হবে, নক্ষত্র-মানচিত্রে তারার অবস্থান সঠিকভাবে বসাতে হবে। প্রতিবেশীদের টান ছেড়ে অন্যত্র গেলে তারাটি আর তারা নয়, গ্রহিকা!

আকাশের কোন অংশে গ্রহিকার দর্শন মিলবে আগে থেকে বলা যায় না, তাই একটা ঝুঁকি নিতে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। কয়েকজন সৌখীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কপাল ভালো, কয়েকটি নতুন গ্রহিকা তাঁরা বের করেন।

বছরের পর বছর বেড়ে চলল নব-আবিষ্কৃত গ্রহিকার সংখ্যা, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কয়েক ডজন। সত্বর গ্রীক আর রোমান দেবীদের পুঁজি ফুরিয়ে গেল, তখন ফিনিসীয়, জার্মানিক ও নরওয়েজীয় দেবীদের নাম দেওয়া হতে লাগল নতুন গ্রহিকাগুলিকে। তারপর মেয়েদের ঘরোয়া নাম শুধু। অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা গ্রহিকার একটা ছোট দল নাম পেল দেবতাদের — হার্মিস, ইরস, এ্যাডোনিস ...

সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন গ্রহিকা বের করেছেন। কয়েকটির নাম— ভ্লাদিলেন, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের সম্মানে; মরোজভিয়া—রুশ বিপ্লবী ন. আ. মরোজভের নাম থেকে; পাভলভিয়া — সুপ্রসিদ্ধ রুশ শারীরতত্ত্ববিদ ই. প. পাভলভের নামে।

আবিষ্কারের বছর এবং তারপর দুটো লাটিন অক্ষর দিয়ে নব-আবিষ্কৃত গ্রহিকাগুলিকে বর্ণনা করা এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে: ১৯৩৭ T L (সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নেউইমিন আবিষ্কৃত একটি ছোট গ্রহ)।

বর্তমানে আমরা দেড় হাজারের বেশি গ্রহিকার কথা জানি।

অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, তবু আরো অনেক গ্রহিকা মহাশূন্যে ধাবমান — বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস হাজার হাজার খুদে গ্রহিকা আছে।

প্রথমে যেগুলি ধরা পড়ে অবশ্য সেগুলিই বৃহত্তম — সীরিস, পাল্লাস, জুনো ও ভেস্তা। পরে, ১০০, ৫০ এবং ২০ কিলোমিটার ব্যাসের গ্রহিকা আবিষ্কৃত হয়। এক কিলোমিটার ব্যাসের গ্রহিকাও আজ পরিচিত। সৌরজগতের এই বামনগুলির তুলনায় সীরিস ও তার বোনরা সত্যি সত্যিই দানবী। সীরিসের পরিধি প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার, হাঁটতে মন্দ সময় লাগবে না। এলাকা প্রায় ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ইউরোপের এক ষষ্ঠাংশ। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ব্রিটেন এবং সুইজারল্যান্ডের মতো ডজন খানেক আরো ছোট দেশের সঙ্কুলান হবে খুদে গ্রহটিতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দশভাগের মাত্র একভাগ কুলোতে পারে সীরিসে।

প্রায় এক কিলোমিটার ব্যাসের 'পকেট' গ্রহিকা আছে, এগুলোকে ঘণ্টা-খানেকে চক্কর মারা যায়। এদের উপরিভাগের আয়তন মাত্র ৩০০ হেক্টার। আয়তন সীরিসের চেয়ে ৫০ কোটি গুণ কম।

দেখা গেল যে, গ্রহিকা পরিবারে দানব ও বামন দুইই আছে। অনাবিষ্কৃত গ্রহিকার মধ্যে কয়েক ডজন মিটার বা এমন কি কয়েক মিটার ব্যাসের চীজও আছে নিশ্চয়। মহাশূন্যে ধাবমান বড়ো পাথরখণ্ড।

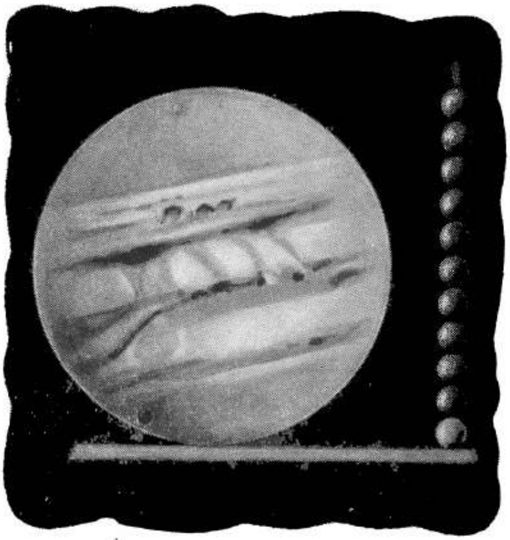
বড়ো ছোট গ্রহিকা আছে বলে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে এককালে মহাশূন্যে সত্যিই একটা মহা দুর্বিপাক ঘটাতে কোনো একটা গ্রহ ভেঙে চৌচির হয়। তাই হয়ে থাকলে গ্রহটা নিশ্চয় বেশ ছোট ছিল, পৃথিবীর চেয়ে প্রায় হাজার গুণ ছোট।

বৃহস্পতি

বিরাট বহির্গ্রহের দল শুরু বৃহস্পতি থেকে। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বলে রোমানরা ভেবেচিন্তে এর নাম দেয় জুপিটার, রোমান দেবতাধিপতি যিনি।

বৃহস্পতি কত বড়ো বোঝাবার জন্য কয়েকটা তথ্য দিই।

ব্যাসে বৃহস্পতি পৃথিবীর এগারো গুণ। দিনে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ৮০০ দিন



বৃহস্পতি ও পৃথিবীর তুলনামূলক আয়তন।

হেঁটে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করা চলে, কিন্তু বৃহস্পতিকে চক্কর দিতে লাগবে ২৫ বছর। যৌবনে রওনা দিলে ফিরবে মধ্যবয়সে।

জুপিটারের উপরিভাগের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ১২০ গুণ বেশি।

ভূগোল পড়তে গিয়ে তোমরা পৃথিবীর মহাদেশগুলির বিষয়ে জেনেছ — ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং কুমেরু। সম্ভব হলে এ আকারের ৭০০টি মহাদেশ থাকত বৃহস্পতিতে। নিজেদের গ্রহ নিয়ে ওখানকার ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের কাজের অন্ত থাকত না, বর্ণনা করতে গিয়ে বড়ো বড়ো লাইব্রেরি ভরিয়ে ফেলতেন। আর ভূগোল পাঠে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কী অবস্থাটা হত!

পৃথিবীর সাইজের ১,৩০০টি গোলক বানানো চলে বৃহস্পতি থেকে। বৃহস্পতির মহাকর্ষ, নিজের উপরিদেশের বস্তুগুলিকে আকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রচণ্ড। পৃথিবীতে ষাট কিলোগ্রাম ওজনের মানুষ বৃহস্পতিতে গিয়ে পড়লে ১৪০ কিলোগ্রাম হবে। চাঁদে আমাদের মতো লাফিয়ে গমন তার চলবে না বৃহস্পতিতে; শরীর এত ভারি হয়ে যাবে যে টানার শক্তি থাকবে না পেশীগুলোর। নিজের ভারে মানুষ পড়বে মাটিতে, হামাগুড়ি দেওয়াও মহা মুশকিল। এত আস্তে চলবে সে যে এক শ' বছরেও বৃহস্পতিকে চক্কর দিতে পারবে না।

দু তিন শ' বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে সবকটি গ্রহতে লোক আছে, বুদ্ধিসত্তা আছে। তাঁরা যুক্তি দিতেন:

'পৃথিবী একটি গ্রহ, লোক থাকে এখানে। বুধ, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিও গ্রহ, অতএব ওগুলিতে লোক থাকতেই হবে।'

তাঁরা আরো ভাবতেন যে ছোটখাটো গ্রহগুলিতে থাকে ছোটখাটো লোক, বড়োগুলিতে থাকে দানব। মস্ত একটা ভুল তাঁরা করেন: বৃহস্পতিতে লোক থাকলে তারা হত অত্যন্ত খুদে, কেননা ওখানে ছোট হালকা দেহ টানতে পারার মতো শক্ত পেশী থাকত শুধু অতি

ছোট সাইজের প্রাণীর। চাঁদে ঠিক এর উল্টোটা খাটে: মহাকর্ষ যৎকিঞ্চিৎ, ওখানে থাকতে পারে অতিকায় লোক। কিন্তু আগেকার দিনে এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম হয়নি বিজ্ঞানীদের।

বৃহস্পতিতে প্রাণী নেই।

বিরাট বহির্গ্রহগুলির গঠন অন্তর্গ্রহগুলি থেকে — পৃথিবী, মঙ্গল, শুক্র এবং বুধ থেকে আলাদা। ক্ষুদ্রতর গ্রহগুলি কঠিন বস্তুতে তৈরি, আছে পাথরের কঠিন ত্বক। মহাশূন্যচারীরা রকেটে অন্তর্গ্রহে গেলে সেখানে নামতে পারবেন। কিন্তু বৃহস্পতিতে অবতরণের চেষ্টা করলে মৃত্যুর আশঙ্কা।



বৃহস্পতিতে মানুষের ওজন (স্প্রিঙের ওজন-যন্ত্রে)।

বিরাট গ্রহটিকে ঘিরে অতি ঘন বায়ুমণ্ডল, সে মণ্ডলের নানা গ্যাস নিশ্বাসে গ্রহণ করা যায় না। বৃহস্পতির আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা: ওখানকার তাপমাত্রা মেপে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন — শূন্যাঙ্কের নিচে ১৪০ ডিগ্রি। কারণ, সূর্য থেকে সামান্য আলো আর তাপ আসে বৃহস্পতিতে — সূর্য থেকে এর দূরত্ব পাঁচটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট।

বৃহস্পতির ঘন বায়ুমণ্ডলের নিচে কী আছে তা এখনো বিজ্ঞানীদের অজানা: কয়েকজনের মতে, গ্রহটির মধ্যাংশ গরম। অন্যদের মতে, কঠিন কেন্দ্রটি ঘন বরফের স্তরে পরিবৃত।

পৃথিবীর বারো বছরে এক একবার সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে বৃহস্পতি, তার মানে বৃহস্পতি-বর্ষ আমাদের বর্ষের চেয়ে বারো গুণ দীর্ঘ, কিন্তু দিনগুলি অতি ছোট — মাত্র দশ ঘণ্টা: পাঁচ ঘণ্টা দিন, পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি।

এত ছোট দিন হলে পৃথিবীতে কেমনটা হত? সকালে উঠে ছোট হাজরি খেলে, স্কুলে গেলে, চারটে ক্লাস করলে — ব্যস, আবার রাত্রি। খেলাধুলো বা বাড়িতে পড়ার সময় কখন পাবে?

বৃহস্পতিতে লোক নেই, তাই দিনের আয়ুতে কিছু এসে যায় না।

আর একটা ব্যাপারে অন্তর্গ্রহগুলি থেকে বৃহস্পতি আলাদা — উপগ্রহের সংখ্যায়। সবসুদ্ধ বারোটা উপগ্রহ আছে। তাই উপগ্রহ সমেত বৃহস্পতি একটি গোটা জগৎ।

বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা তো জানো যে বৃহস্পতির নিকটতম চারটে উপগ্রহ অনেকদিন আগে আবিষ্কার করেন টেলিস্কোপে আকাশ অধ্যয়নকারী প্রথম মানুষ গালিলিও। তাঁর টেলিস্কোপটা অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু তবু চারটে উপগ্রহ খুব বড়ো বলে তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ে। গালিলিওর দুটি চাঁদ (আজকে এই তাদের নাম) বুধের চেয়ে বড়ো, একটি আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়ো আর চতুর্থটি ছোট।

আবিষ্কারের পর অনেকদিন বৃহস্পতির উপগ্রহগুলি খুব কাজ দেয় নাবিকদের, তাদের সাহায্যে তারা পাড়ি দিত মহাসাগর।

নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাইবে কী করে নাবিকরা এটা করত। ব্যাপারটা তাহলে বলি।

সমুদ্রে জাহাজ চলেছে, হাজার হাজার কিলোমিটার জল, শুধু জল। জলের নিচে পাহাড়, চড়া আর দ্বীপ, কুয়াশায় বা রাত্রের অন্ধকারে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নে সূর্য দেখে আর ক্রোনোমিটার নামে একটি অত্যন্ত সঠিক ঘড়ি ব্যবহার করে জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয় করেন ক্যাপ্টেন। তারপর জাহাজটা কোথায় দেখাবার জন্য চার্টে একটা দাগ কাটেন।

চার্টের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরেন জাহাজের কাছাকাছি কোথাও পাথর বা দ্বীপ আছে কিনা। কিন্তু ধরা যাক — ক্যাপ্টেন ভুল করে বসলেন; তিনি ভাবলেন পাথর আছে ৪০ কিলোমিটার দূরে, অথচ আসলে সেগুলো মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে। ক্রোনোমিটার খারাপ হলে, পিছিয়ে থাকলে এমনটা ঘটা সহজ।

আমাদের সময়ে এটা কোনো সমস্যাই নয়। প্রতিদিন রেডিওর সাহায্যে ক্রোনোমিটার মিলিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু দু এক শ' বছর আগে রেডিও কোথায়, আর ঘড়ির কলকব্জাও আজকের মতো নিখুঁত ছিল না।

এ-ক্ষেত্রে গালিলিওর চাঁদগুলি ক্যাপ্টেনের কাজে লাগল। বৃহস্পতির উপর সূর্যের আলো পড়লে বিরাট একটা ছায়া ফেলে গ্রহটি। তার কোনো চাঁদ ও-ছায়ায় থাকলে গ্রহণ ঘটে। দু শ' বছরেরও আগে এই গ্রহণগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখতে আরম্ভ করেন জ্যোতির্বি-



পৃথিবী-চাঁদ বিন্যাসের তুলনায় বৃহস্পতি ও তার উপগ্রহগুলির বিন্যাস। (বৃহস্পতি ও পৃথিবীকে স্কেল হিসেবে দেখানো হয়নি)।



নিজের অন্যতম উপগ্রহ থেকে দেখা বৃহস্পতি।

জ্ঞানীরা, কবে হবে আগে থেকে বলতে শুরু করেন। গ্রহণ-সারণী ছাপা হল বিশেষ পাঁজীতে, প্রত্যেক জাহাজে থাকত এই পঞ্জিকা।

পঞ্জিকা দেখতেন ক্যাপ্টেন: আজ ইউরোপে (বৃহস্পতির চাঁদের একটা) গ্রহণ লাগবে। তাহলে মেঘ না থাকলে ক্রোনোমিটারটা মিলিয়ে নিতে পারব।

সময় এলে ক্যাপ্টেন তাঁর টেলেস্কোপে আকাশে নজর রাখলেন। প্রথম সহকারী ক্রোনোমিটার হাতে পাশে দাঁড়িয়ে।

'গ্রহণ শুরু হয়েছে!' বললেন ক্যাপ্টেন।

'ক্রোনোমিটারে সময় হল ২৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড,' সহকারী বলেই সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখল।

'পাঁজীতে বলেছে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ড,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আমাদের ঘড়ি তাহলে ৩৯ সেকেন্ড পিছিয়ে আছে।'

দেখা গেল বৃহস্পতি ও তার চাঁদগুলি অত্যন্ত সঠিক ঘড়ি; দম দেবার দরকার নেই, মেরামত বা সাফের বালাই নেই, এক সেকেন্ডও আগে পিছে চলে না।

এমন কি আজও জাহাজের বিশেষ করে পাল-জাহাজের ক্যাপ্টেনরা সঙ্গে পাঁজী রাখেন। রেডিও চমৎকার জিনিস, কিন্তু যদি কিছু গড়বড় হয়!

তাহলে দেখছ তো, জ্যোতির্বিজ্ঞান — আকাশবিজ্ঞান — পৃথিবীর কত কাজে লাগে। এমন উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে।

বৃহস্পতির অন্য আটটি উপগ্রহ আকারে এত ছোট যে শুধু শক্তিশালী টেলিস্কোপে ধরা পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এদের নিয়ে মাথা ঘামান। অন্যের অত আগ্রহ নেই।

শনি

শনি মহাকায়, আয়তনে পৃথিবীর ৭৫০ গুণ।

শনিকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ বলে প্রাচীনেরা জানতেন। আজ আরো তিনটি গ্রহের কথা আমরা জানি যারা শনির চেয়েও দূরে, যারা ধরা পড়ে শুধু টেলিস্কোপে।

পুরাকালের রোমানরা মহাকাল এবং জুপিটারের পিতাকে সেটার্ণ নামে ডাকতেন। সেই নামে গ্রহটির নাম।

সূর্য থেকে শনির দূরত্ব সাড়ে নয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট। শনি বর্ষের মেয়াদ প্রায় তিরিশ পার্থিব বছরের মতো — তার মানে এখানে যে নব্বই বছরের সে ওখানে বছর তিনেকের ছেলে।

শনি প্রাণহীন। বৃহস্পতির মতো ঘন গ্যাসের চাদরে আবৃত, আর এর উপরিভাগের তাপমাত্রা মাইনাস ১৫০ ডিগ্রি।

এইখানেই শনির ইতিবৃত্ত ক্ষান্ত করা যেত, কিন্তু শনির অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো গ্রহের নেই।

সতেরো শতকের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের দুর্বল টেলিস্কোপে শনির অদ্ভুত চেহারার রহস্যটি সমাধান করতে পারেননি।

সৌরজগতে একমাত্র শনিরই একটি চক্র আছে, চক্রটার প্রকৃতি বিচিত্র।

এক টুকরো পিজবোর্ড বা শক্ত কাগজে কম্পাস দিয়ে এক কেন্দ্র থেকে দুটো চক্র আঁকো। ভেতরের এবং বাইরের চক্র কাঁচি দিয়ে গোল করে কাটলে একটা সমতল চক্র ফুটে উঠবে — শনি চক্রের মডেল।

চক্রটা সরাসরি শনির গায়ে লাগা নয়, হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে।

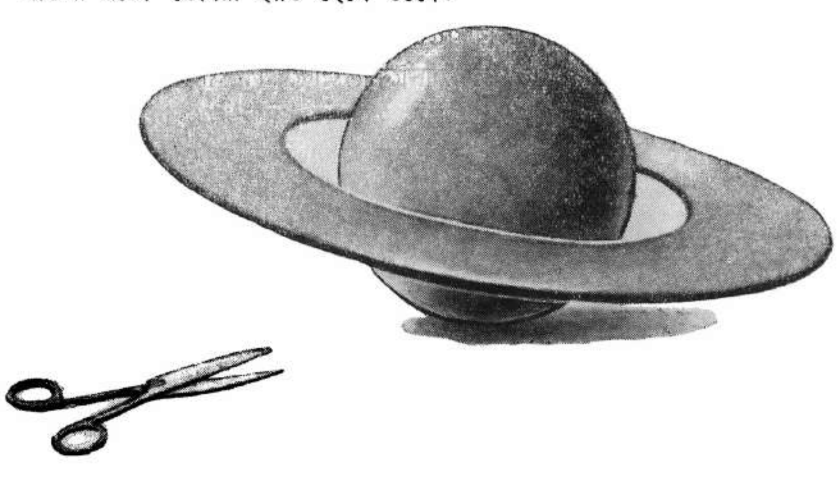
বড়ো টেলিস্কোপে শনি আর তার চক্রকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। মখমলমসৃণ কালো আকাশের গায়ে শনিকে ঠেকে চমৎকার খেলনার মতো — প্রকৃতি কতো রকমের জ্যোতিষ্ক তার খামখেয়ালে সৃষ্টি করতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত।

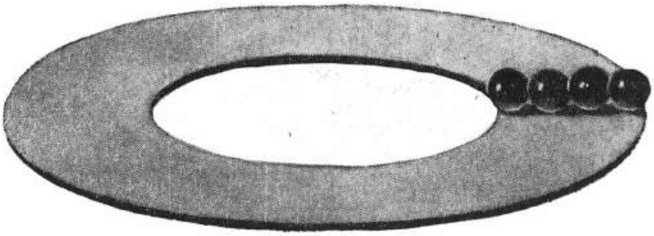
কোথা থেকে শনির চক্রটা এল? এখনো ঠিক জানা যায়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবেন যে শনির বিনষ্ট উপগ্রহগুলির টুকরোর জন্য এই চক্র।

সেকেণ্ডে ১৫-২১ কিলোমিটার বেগে চক্রটি শনিকে পরিক্রমণ করে। খুদে খুদে বিচ্ছিন্নভাবে ধাবমান বস্তুকণার সমষ্টি এটি। বস্তুকণাগুলি বিভিন্ন আকারের — ধূলোকণা থেকে কয়েক টন ওজনের পাথরখণ্ড।

শনিচক্র কঠিন নয় কেন ভাবি? পর্যবেক্ষক এবং কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মাঝখানে চক্রটি থাকলে পরিষ্কারভাবে নক্ষত্রটিকে দেখা যায় চক্র ভেদ করে। প্রসঙ্গত এ থেকে প্রমাণ হয় যে চক্রটি পাতলা, ১৫ কিলোমিটার গোছের...

'পাতলা বটে!' তোমরা হয়ত হেসে উঠবে।





শনিচক্রের বহরে কতগুলি পৃথিবীকে বসানো যায়।

তবে পাতলাই, যদি এর বিপুল বহরের কথাটা মনে রাখি। তোমাদের সেই কাটা চক্রে চারটে এমন মার্বেল রাখো যেগুলো পাশাপাশি থাকতে পারে। এক একটা মার্বেল একই স্কেলে আমাদের পৃথিবীর প্রতীক হবে। তাহলে বুঝতে পারবে শনিচক্রের বহর কতখানি!

শনি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় দেড় শ' কোটি কিলোমিটার। চক্রের কিনারা যখন পৃথিবীমুখী তখন সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপেও দেখা চলে না: প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে এক টুকরো কাগজের ধার দেখার মতো।

প্রতি পোনেরো বছরে পর্যবেক্ষকদের নিশানা এড়িয়ে অদৃশ্য হয় শনিচক্র, এ-সময় শনির চেহারা অন্য গ্রহদের মতো।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মজার গল্প আছে।

১৯২১ সালে শনি এমন ভাবে পৃথিবীর দিকে ঘুরে ছিল যে চক্রটি দেখা যায়নি। পঞ্জিকাতে চক্রটির অন্তর্ধানের কথা বেরল।

নানা দেশে খবরের কাগজগুলি ব্যাপারটা নিয়ে পড়ল।

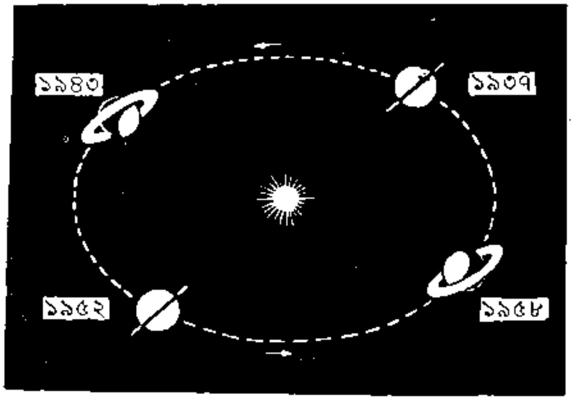
'শনিচক্র উধাও,' বড়ো বড়ো হেডলাইনে খবরটা বেরল একটা কাগজে। 'ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে!' (মূর্খরা ভাবত চক্রটি কঠিন।)

আর একটি খবরের কাগজ ভয়ের কথা তুলল: 'প্রচণ্ড বেগে টুকরোগুলো আসছে আমাদের দিকে! মহাজাগতিক একটি সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী!'

চারিদিকে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। চার্চ থেকে ঘোষণা করা হল: 'প্রলয় আসন্ন! হে খৃষ্টানগণ, প্রায়শ্চিত্ত আর প্রার্থনা করো!'

সমস্ত উত্তেজনার মূলে ছিল একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীর লেখা ছোট একটা চিরকুট।

অবশ্য চক্রটি আবার দেখা দেয়। প্রথমে সরু সুতোর মতো চেহারা, তারপর আয়তন ক্রমশ বেড়ে সাত-আট বছরে 'পূর্ণদশা'। পর্যবেক্ষণের সুসময় সেটা। শনিচক্র পর্যবেক্ষণের



বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী থেকে দৃষ্ট শনিচক্র।

ভালো সময় ছিল ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সাল, তখন পৃথিবীর দর্শকরা শনির রূপ পুরো দেখার সুযোগ পান।

আমার পাঠক পাঠিকারা যদি একটা ভালো টেলিস্কোপ যোগাড় করতে পারো বা যেতে পারো মানমন্দিরে, তাহলে মহাকাশের এই অতি আশ্চর্য দৃশ্যটি — চক্রসহ শনিকে — দেখা চাই-ই।

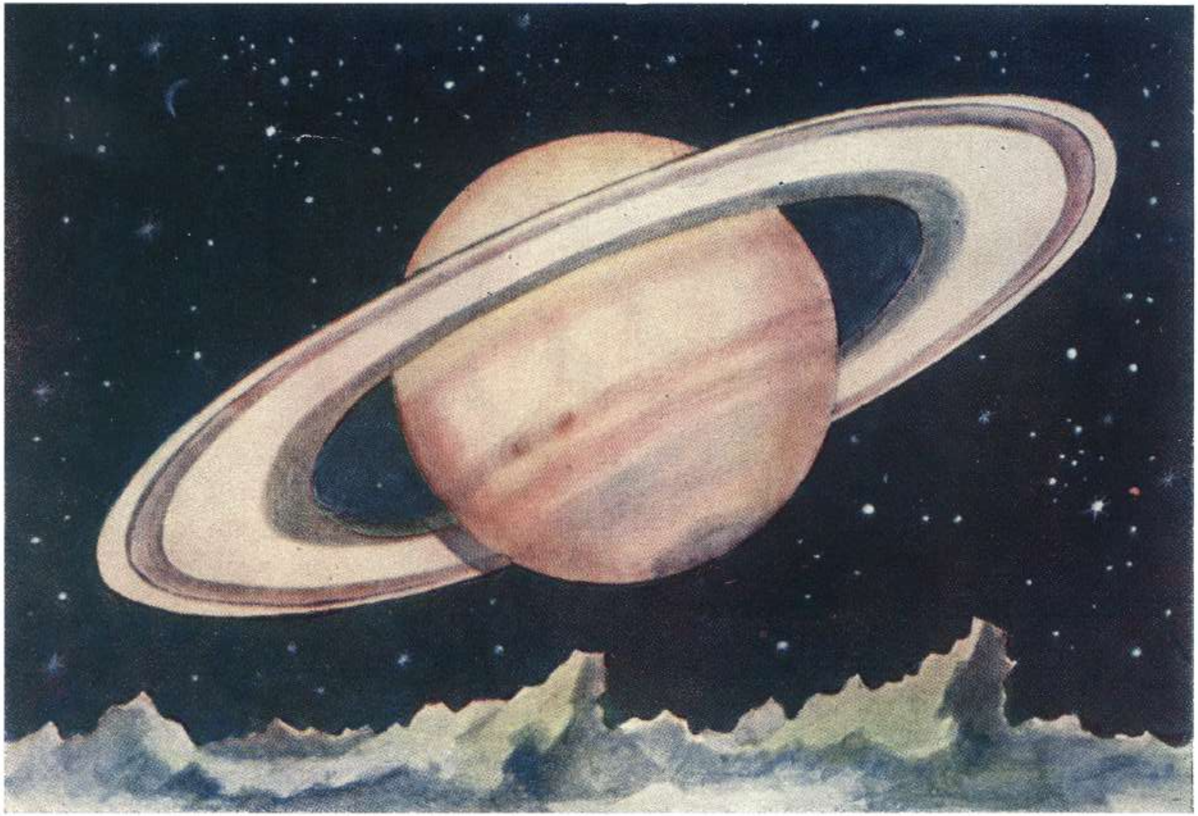
চক্র ছাড়া ন'টি উপগ্রহ শনির, সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহটি আয়তনে আমাদের চাঁদের ডবল।

ইউরেনস

সূর্য থেকে বহু দূরে ইউরেনস, পৃথিবীর চেয়ে ১৯ গুণ দূরে। গ্রহটির আলো অতি ক্ষীণ, দৈবক্রমে ইউরেনস ১৭৮১ সালে টেলিস্কোপে গোচর হয়। আগেই তো বলেছি যে প্রাচীন রোমানরা সেটার্ণকে জুপিটারের পিতৃদেব ভাবতেন। আকাশদেবতা ইউরেনস ছিলেন সেটার্ণের পিতা। তাই সূর্য থেকে সেটার্ণের চেয়েও দূরে আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দেওয়া হল ইউরেনস।

ইউরেনস-বর্ষ ৮৪ পৃথিবী-বর্ষের সামিল। আমাদের জগতের ক'জন দুটি ইউরেনস-বর্ষ টিকতে পারবেন। ইউরেনসে দিনের মেয়াদ মাত্র ১১ ঘণ্টা, তাহলে এক বছরে দিনের সংখ্যা ৭২ হাজারের বেশি!

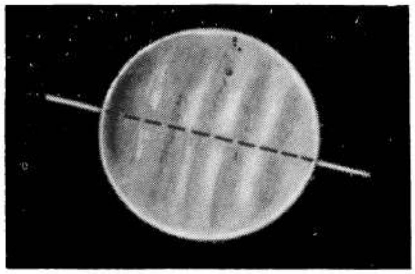
সৌরজগতে ইউরেনসের একটি একান্ত বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সব গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ



নিজের অন্যতম উপগ্রহ থেকে দেখা শনি।

করে, তাদের মেরুদণ্ড খাড়া বা অল্প বিক্ষেপিত। কিন্তু ইউরেনস পাশে-শোওয়া ঘুরন্ত লাট্টুর মতো।

অদ্ভুত এই বৈশিষ্ট্যের দরুন ইউরেনসে দিন রাত্রির পালাবদল বড়ো বিচিত্র। কখনো মেরুদণ্ডের শেষভাগ, মেরুরেখা, সরাসরি সূর্যমুখী। এ-সময় ইউরেনসের মেরুতে দাঁড়ানো পর্যবেক্ষক সূর্যকে পাবেন ঠিক মাথার উপর।



ইউরেনস।

ফলে কী হবে? মেরু আর মেরু অঞ্চল পায় অতি প্রখর সূর্যালোক আর দূরে, বিষুবরেখার দিকে, সূর্যালোক ক্রমশ নিম্ন কোণে তেরছাভাবে পড়ে, শেষ পর্যন্ত খাস বিষুবরেখায় সূর্য ঠিক দিগন্তের উপরে আসে। ইউরেনসে সবকিছু তাই পৃথিবীর ঠিক উল্টো। সূর্যের বিপরীত মুখোমুখি গোলার্ধে দিবাভাগ, দিনের আলো থাকে অনেক পৃথিবী-বছর বা হাজার হাজার ইউরেনস-দিন ধরে। আর মেরুতে দিবালোকের আয়ু ৩৬ হাজার ইউরেনস-দিন আর রাত্রি।

প্রকৃতির উদ্ভাবনা শক্তি যে অসীম এটা তার প্রমাণ।

পাঁচটি উপগ্রহ ইউরেনসের। সবচেয়ে বড়োটি আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট।

নেপচুন

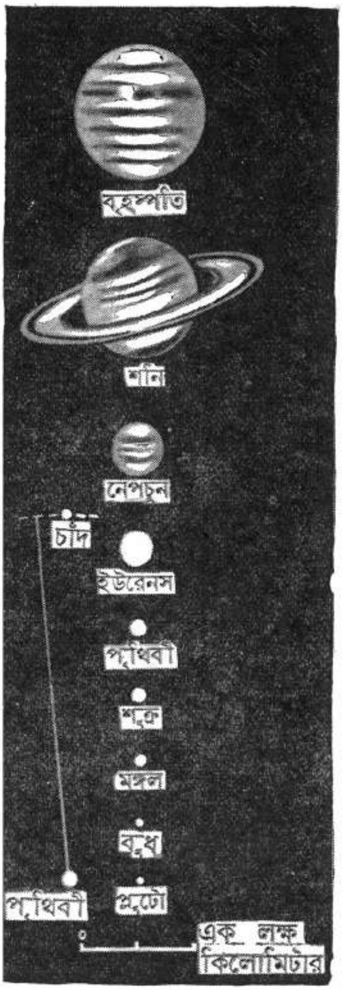
সূর্যের বহির্লোক ধরে হিসেব করলে নেপচুন হল অষ্টম গ্রহ, বড়ো গ্রহদলের শেষ সদস্য। নেপচুনের আবিষ্কার-কাহিনী শোনার মতো।

টেলিস্কোপে আকাশ-দেখা জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ আবিষ্কার করেননি, করেছেন একজন গণিতবিদ, নিজের পড়ার ঘরে কলম হাতে বসে। গণনার সময় আকাশপানে একবারও তিনি তাকাননি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরাট এই ঘটনাটির কথা তোমাদের বলি।

তোমরা শুনেছ যে প্রতি ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ইউরেনস। এর আপাত বেগ অত্যন্ত মন্থর, যদিও সেটা সেকেন্ডে সাত কিলোমিটার। আবার মনে করিয়ে দিই, কামানের মুখ থেকে বেরোবার সময় গোলার গতিবেগ হল সেকেন্ডে দু কিলোমিটার।

কিন্তু আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে বলে নক্ষত্রপল্লীর মধ্যে এর যাত্রাকে অত্যন্ত ঢিমেতালের মনে হয়। ইউরেনসের গতি অনেক বছর আগে থেকে হিসেব করেন



গ্রহগুলির তুলনামূলক আয়তন; পৃথিবী ও চাঁদকে দেখানো হয়েছে আলাদাভাবে, দুজনের মধ্যকার দূরত্ব আঁকা হয়েছে গ্রহগুলির ব্যাসের জন্য ব্যবহৃত স্কেলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, আবিষ্কারের পর বিশ, চল্লিশ এবং ষাট বছর পরে এটি কোথায় থাকবে তার সঠিক হিসেব করা হল।

কিন্তু কী হল? চল্লিশ বছর পর উচিত স্থানে গ্রহটির পাত্তা মেলেনি, আরো বিশ বছর পর, যেখানে থাকবে হিসেব করা হয়েছিল তা থেকে আরো দূরে রইল ইউরেনস। হয়ত ভাববে, বিচ্যুতিটা সামান্য, মাথা ঘামানোর যোগ্য নয়। একটা দেশলাই কাঠি খাড়া করে রেখে সাত পা হটে যাও। ওখান থেকে কাঠিটাকে কি খুব মোটা (বা চওড়া) মনে হয়? বেশ কয়েক বছর আগে থেকে হিসেব করা জায়গাটা থেকে ইউরেনসের আসল অবস্থানের দূরত্ব ঠিক এ-রকম। তোমাদের হয়ত যৎকিঞ্চিৎ মনে হবে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তুচ্ছ মনে করেননি, তাঁরা ভাবলেন সঠিক পথ থেকে ইউরেনসের অপসারণের একটা কারণ নিশ্চয় আছে। সেটা বের করতে হবে।

তোমরা জানো যে মহাকর্ষ কাজ করে সর্বত্র, তবে দূরত্ব যত বেশি তত ক্ষীণ তার শক্তি। যেমন ধর, আমরা বলি:

'সূর্য টানে বলে পৃথিবী তার চারদিকে ঘোরে।'

সত্যি কথা। কিন্তু এও বলা দরকার যে পৃথিবীকে কেবল সূর্য টানে না, টানে চাঁদ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, টানে সমস্ত গ্রহ। এমন কি সুদূর নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত টানতে ছাড়ে না, অবশ্য তারা এত দূরে যে তাদের মহাকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্রহগুলির মহাকর্ষ প্রভাব বাদ দিলে চলবে না।

একটা দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর একই দিকে সূর্য ও বৃহস্পতি থাকলে মহাকর্ষ বাড়ে — পৃথিবীকে টানতে সূর্যকে সাহায্য করে বৃহস্পতি। কিন্তু সূর্য এক দিকে আর বৃহস্পতি অন্য দিকে যখন, তখন

উল্টোটা ঘটে: সূর্য পৃথিবীকে নিজের দিকে টানে, অন্য দিকে টান মারে বৃহস্পতি, তাই সূর্যের টান অল্প কমে। প্রথম ক্ষেত্রে, নিয়মিত কক্ষক্ষেত্রে থাকলে যতটা তার চেয়ে অল্প বেশি সূর্যের কাছে এগোয় পৃথিবী; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বৃহস্পতির দিকে স্বল্প বিচ্যুতি ঘটে।

বৃহস্পতির মহাকর্ষজনিত বিচ্যুতিকে বলা হয় বিক্ষোভ। অতএব এটা সঙ্গত যে মহাশূন্যে পৃথিবীর পথ হিসেবের সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে শুধু বৃহস্পতির মহাকর্ষজনিত বিক্ষোভ নয়, চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল ইত্যাদির টানের ফলে যে বিক্ষোভ ঘটে তারো কথা মনে রাখতে হয়। অত্যন্ত কঠিন এ কাজ।

ইউরেনসের পথ হিসাবের জন্য এ কঠিন কাজ করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। জানা সব গ্রহের দরুন বিক্ষোভের কথা তারা হিসেবে ধরেন। তবু সঠিক পথ বের করা গেল না।

হয়ত হিসেবে তাঁরা ভুল করেন? তা নয় কিন্তু। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবার মতলব থাকলে স্কুলে গণিতে সর্বদা চমৎকার নম্বর পেতে হবে তোমাদের।

গণনা নির্ভুল থাকা সত্ত্বেও ইউরেনস হিসেব মতো পথে এল না, তার মানে অজানা আর একটা গ্রহ নিশ্চয়ই তাকে টানে।

অজানা গ্রহ যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে তা গণনা করে বহিঃশূন্যে তার হদিশ বের করতে হল।

মাঠের মাঝখানে রেখে কম্পাসকাঁটার প্রতিক্রিয়া দেখে উঁচু ঘাসে আবৃত জায়গায় হারিয়ে-যাওয়া বল-বেয়ারিঙ বের করা বোধ হয় আরো সহজ। নতুন গ্রহটিকে বের করা ছিল অতি কঠিন, অত্যন্ত জটিল গণনায় কেটে গেল কত মাস। তবু কাজ চলল।

নবীন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেভেরিয়ে গণনা সম্পূর্ণ করে মানমন্দিরকে লিখলেন: 'মকরের কাছে নতুন গ্রহটির সন্ধান করুন।'

যে সন্ধ্যায় চিঠিটা এল সেই সন্ধ্যাতেই ধরা পড়ল গ্রহটি। টেলিস্কোপে দেখা গেল আলোর ছোট একটা বৃত্ত। তারার মতো বিন্দু নয়।

এ-সব ঘটে ১৮৪৬ সালে।

নাম দেওয়া হল নেপচুন, সমুদ্রদেবতা বরুণ।

আকারে ইউরেনস এবং নেপচুন যমজ, পৃথিবী ও শুক্রের মতো। দুটিই পৃথিবীর প্রায় ষাট গুণ বড়ো।

সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব ৩০ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট, এর দিন ১৬৫ পার্থিব দিনের সামিল। আবিষ্কারের পর শতাধিক বছর কেটেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সূর্যকে একটাও পুরো চক্কর দেয়নি নেপচুন।

নেপচুনের দুটি উপগ্রহ। একটি আয়তনে বুধের মতো, অন্যটি অত্যন্ত ছোট, আবিষ্কৃত হয় ১৯৪৯ সালে।

প্লুটো

প্লুটো ছিলেন রোমানদের পাতালদেবতা। তাঁর বাস অনন্ত অন্ধকারে, মাঝে মাঝে শুধু নরকাগ্নির ঝলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠত সে স্থান।

মানুষের জানা গ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে দূরেরটির নাম প্লুটো রাখলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর চেয়ে প্লুটো সূর্য থেকে ৪০ গুণ দূরে, এর বর্ষ আমাদের প্রায় ২৫০ বছর।

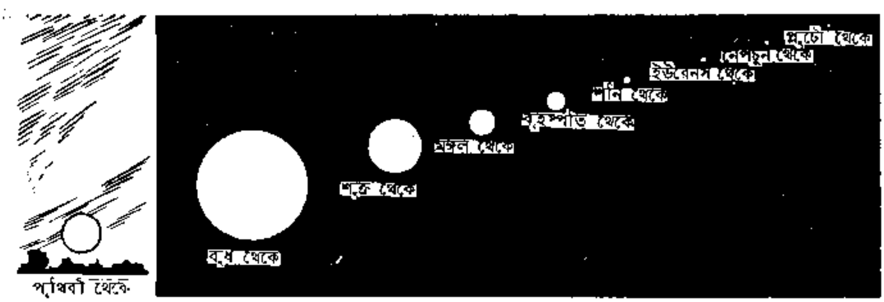
পৃথিবীর তুলনায় প্লুটোর উপরিভাগের প্রতিটি বর্গ মিটার সূর্য থেকে ১,৬০০ গুণ কম আলো ও উত্তাপ পায়। প্লুটো থেকে সূর্যের চেহারাটা নিশ্চয়ই খুদে একটা চাকতির মতো, আমাদের দেখা সূর্যের চেয়ে যার ব্যাস চল্লিশ গুণ কম।

প্লুটোতে আদিঅন্তহীন অন্ধকার — এটা কিন্তু বলা যায় না। সূর্যাহত দিকে আমাদের চাঁদের চেয়ে ২৭৫ গুণ বেশি আলো। আমাদের রাতকে প্লুটোর দিনের মতো ঝকঝকে করতে হলে লাগবে ২৭৫টি পূর্ণচন্দ্র। সূর্যের কত আলো, আশে পাশের মহাবিস্তারকে কত যে আলো জোগায় তা দেখতেই পারছ তাহলে।

তবু প্লুটোকে ছিটেফোঁটা উত্তাপ জোগাবার ক্ষমতা নেই সূর্যরশ্মির — ওখানে তাপমাত্রা মাইনাস ২০০।

প্লুটো আবিষ্কৃত হয় সম্প্রতি, ১৯৩০ সালে। তারপর থেকে সূর্য প্রদক্ষিণের কাজটা অতি অল্প মাত্র সেরেছে প্লুটো — আটভাগের একভাগের কম।

এত দূরে প্লুটো যে শক্তিশালী টেলিস্কোপেও চেহারাটা চাকতির মতো নয়, ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর মতো। এখনো সবিস্তারে প্লুটোকে পরীক্ষা করার মতো যথেষ্ট সময় পাননি



বিভিন্ন গ্রহ থেকে সূর্যকে কেমন দেখায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মেরুদণ্ডে ঘোরে কিনা, বায়ুমণ্ডল এবং উপগ্রহ আছে কিনা এখনো অজ্ঞাত।

ছোট গ্রহ প্লুটো। অনুমান করা হয় আয়তনে প্রায় পৃথিবীর মতো।

প্লুটোকে ছাড়িয়ে আরো গ্রহ আছে? হয়ত আছে, কিন্তু এত দূরে যে বের করা অত্যন্ত কঠিন।

উল্কা

অনেক, অনেক দিন আগে লোকে ভাবত যে তারাগুলি হল স্ফটিক মণ্ডলে ঝোলানো লণ্ঠন। ভাবত, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব তারা আছে, মানুষের মৃত্যুদিনে সেটি নিভে যাবে।

উজ্জ্বল একটা তারা আকাশে ছুটে গিয়ে নিভে গেলে ধর্মভীরুরা বুকে হাত দিয়ে বলত:

'কাঁর আত্মা ফিরে গেল ঈশ্বরের কাছে...'

আকাশে-ছোটা আলোর উজ্জ্বল বিন্দুগুলির নাম ছিল 'পড়ন্ত তারা'। তখনকার দিনে জানা ছিল না যে প্রত্যেকটি তারা এক একটি সুদূর সূর্য, আমাদের পৃথিবীর চেয়ে শত কোটি গুণ বড়ো।

পরে পড়ন্ত তারাগুলির নাম বিজ্ঞানীরা উল্কা দিলেন।

মাঝে মাঝে উল্কাগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারার মতো নয়, বরং জ্বলন্ত বলের মতো আকাশে তারা ছুটে যায়। মাঝে মাঝে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল সে অগ্নিগোলক। এ ধরনের বড়ো উল্কার নাম বোলাইড।

কী এগুলো, কেন এদের নাম উল্কা?

পাথর আর ধুলোর স্রোত সর্বদা মহাশূন্যে ধাবমান। কয়েকটি হল বিনষ্ট জ্যোতিষ্কের অবশিষ্টাংশ। টেলিস্কোপে দেখা যায় না, কেননা তারা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু স্রোত থেকে কিছু পাথর বা ধূলিকণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে বায়ুতে গমনজনিত ঘর্ষণে গনগনে লাল হয়ে ওঠে, জ্বলে ওঠে উজ্জ্বল তারার মতো।

উল্কা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান। অবশ্য এক একটা উল্কা নিয়ে নয়, উল্কার নানা স্রোতে তাঁদের আগ্রহ। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে উল্কার ঝলক থেকে পৃথিবীর বায়ুস্তরের উচ্চতা নির্ণয়ে সাহায্য হয়।

কদাচিৎ পৃথিবীতে পড়ে উল্কা, সচরাচর বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়। পাথরগুলি অত্যন্ত বড়ো হলে টুকরো টুকরো হয়ে তারপর পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে পৌঁছয়। পৃথিবীতে পৌঁছনো উল্কা বা তার টুকরোকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড।

১৯০৮ সালের ৩০শে জুন, সাইবেরিয়ায় ইর্কুৎস্কের প্রায় হাজার কিলোমিটার উত্তরে তুঙ্গুস তাইগাতে বিরাট একটি উল্কাপিণ্ড পড়ে। পতনের সময়ে এত উজ্জ্বল ছিল এটি যে সূর্যালোক ম্লান হয়ে যায়।

পৃথিবীতে আঘাত করার সময় দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। মাটি এমন নড়ে ওঠে যে মধ্য ইউরোপে পর্যন্ত সে স্পন্দন অনুভূত হয়। বিস্ফোরণের ধাক্কাজনিত বায়ুতরঙ্গ দুবার পৃথিবীকে চক্কর দেয়।

সে ধাক্কায় কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিরাট সব গাছ উৎপাটিত হয় ঘাসফুলের মতো। কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে উল্কাপিণ্ডটি পৃথিবীকে আঘাত করে সেখান থেকে মাথা ঘুরিয়ে গাছগুলি পড়ে থাকে।

এটা কৌতূহলোদ্দীপক যে তুঙ্গুস উল্কাপিণ্ড পতনের পরের রাতটা সারা দুনিয়ায় বেশ উজ্জ্বল ছিল, পৃথিবীকে আলোর মেঘ ঘিরেছে যেন।

জার-সরকার উল্কাপিণ্ড নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শুধু সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমী তুঙ্গুস তাইগায় একটি অভিযাত্রী দল পাঠান। নেতা ছিলেন সাহসী অভিযাত্রী ল. আ. কুলিক। উল্কাপিণ্ড যেখানে পড়ে সেখানে তিনি অত্যন্ত বড়ো গর্ত পান, গর্তগুলি তরল কাদায় ভর্তি। উল্কাপিণ্ডের কোনো টুকরো পাওয়া যায়নি।

আর একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড সাইবেরিয়াতে পড়ে সোভিয়েত আমলে। ১৯৪৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারিতে: জায়গাটা হল দূর প্রাচ্যের সিহতে-আলিন পর্বত।

সিহতে-আলিন উল্কাপিণ্ড দেখা দেয় ইমান সহরের কাছে বেলা ১০·৩৬-এ: বহুরঙা ধোঁয়ার পুচ্ছওয়ালা একটা অগ্নিগোলক। সূর্যের চেয়ে দীপ্ত বোলাইডটির বিস্ফোরণ ঘটে প্রচণ্ড শব্দে।

সিহতে-আলিনের তুষারাবৃত ঢালুতে যে গর্ত হয় আঘাতের ফলে সেগুলি উড়ন্ত বিমান থেকে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হল বিজ্ঞান আকাদমীর একটি অভিযাত্রী দল।

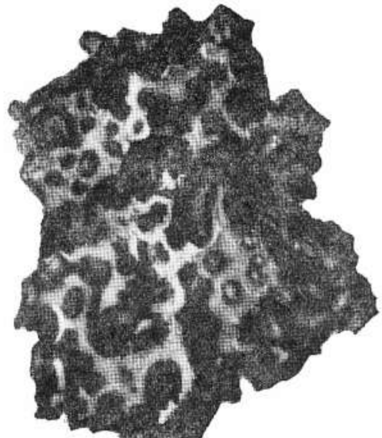
বিজ্ঞানীরা পড়ি কি মরি করে পেঁছিন, তাই মোট ৪০ টন ওজনের কয়েক হাজার খণ্ড তাঁরা কুড়িয়ে পান: সবচেয়ে বড়ো খণ্ডটির ওজন ১,৭৪৫ কিলোগ্রাম। বিজ্ঞানীদের হিসেবে উল্কাপিণ্ডটির মোট ওজন ছিল এক হাজার টন।

খণ্ডগুলির অধিকাংশ হয় মাটির গভীরে প্রবেশ করে নয় এত টুকরো টুকরো হয়ে যায় যে খুঁজে পাওয়া ভার।

পরিষ্কার সন্ধ্যেবেলায় খোলামেলা জায়গায় গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আকাশে নজর রাখলে হয়ত উল্কার উজ্জ্বল দীপ্তি চোখে পড়বে — দপ করে জ্বলে নিভে যাওয়া তারা। এক

জায়গা থেকেই হয়ত কয়েকটি দেখা গেল। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো পড়ে পৃথিবীতে! দিবারাত্রি উল্কাপতন চলেছে, দিনের বেলায় শুধু বড়ো অর্থাৎ বোলাইডগুলিকে দেখা যায়।

এক বছরের মধ্যে কোটি কোটি উল্কার সংঘর্ষ লাগে পৃথিবীর সঙ্গে। অবশ্য এদের কয়েক হাজার মাত্র উল্কাপিণ্ড রূপে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত আসে। আর কয়েকটা মাত্র, পাঁচ-দশটা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পান। সারা পৃথিবীর সব মিউজিয়মে বারো শ' খানেক উল্কাপিণ্ড আছে। সিহতে-আলিন উল্কাপিণ্ড পতনের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল শ' খানেক।


'পাল্লাস লোহা'র একটি উল্কাপিণ্ড।

উল্কাপিণ্ডের উপাদান বিষয়ক তদন্ত বিজ্ঞানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সৌরজগতের গভীর থেকে, হয়ত বা কোনো সুদূর নক্ষত্র থেকে উল্কাপিণ্ডের আগমন। 'স্বর্গীয়' পদার্থ হাতে পাওয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মস্ত কপালগুণ। এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে উল্কাপিণ্ডগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে বিবেচিত।

পৃথিবীতে পতিত উল্কাপিণ্ড খুঁজে পাওয়া সাধারণত বেজায় কঠিন। পড়ার পর মনে হয় ওটা আছে কাছের কোনো বনে বা পাশের গ্রামে। আসলে পড়েছে দর্শকের থেকে অনেক অনেক দূরে।

অনেক উল্কাপিণ্ড পড়ে অগম্য জায়গায়—মরুভূমি, তাইগা, নদী বা সমুদ্রে। প্রত্যেকটি পাওয়া উল্কাপিণ্ড তাই বিজ্ঞানের কাছে মহারত্নের সামিল — এক তাল সোনার চেয়ে মূল্যবান।

ভূপতিত উল্কাপিণ্ড অনুসন্ধানের গুরুত্ব যদি আমার নবীন পাঠকেরা বোঝে তাহলে আকাশবিজ্ঞান আগেকার চেয়ে ঢের বেশি মালমশলা পাবে গবেষণার জন্য।

এবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে ফেরা যাক হাজার বছর আগে।

ইতিবৃত্তকার লিখেছেন: 'হিসহিসিয়ে গর্জিয়ে অগ্নিময় একটা ড্র্যাগন পড়ল আকাশ থেকে...'

কেমন ধারা ড্র্যাগন?

পশ্চিমী দেশে দীর্ঘ জ্বলন্ত লেজওয়ালা ড্র্যাগনের ইতিকথা চলে এসেছে, নিশ্বাসে তারা আগুন ছড়ায়। অগ্নিময় পাখায় এরা উড়ে আসত, লড়ত সাহসী নাইট আর যোদ্ধারা।

কিন্তু আগুন-ছড়ানো ড্র্যাগন সত্যি কে দেখে? এদের উদ্ভাবক হয়ত অনেক দিন আগে আগুনের পাশে বসা বুড়োরা, শীতের দীর্ঘ রাত কাটানোর জন্য ছেলেপুলেদের কাছে যারা গল্প বলত।

কল্পিত হলেও এ-সব উপকথা ও লোককাহিনীর মূলে ছিল আসল ঘটনা।

আগুন-ছড়ানো ড্র্যাগন অবশ্য হল বোলাইড, আকাশে যাদের দেখা যায় প্রায়ই। খাস বোলাইড হল ড্র্যাগনের মাথা আর জ্বলন্ত চোয়াল, পিছনের ধোঁয়া বা আগুনের রেখা হল তার লেজ।

আকাশে ড্র্যাগনের আবির্ভাবকে দুর্লক্ষণ মনে করা হত; লোকে সন্ত্রস্ত হত, এমন কি ইতিবৃত্তে লিখে রাখত তার কথা।

কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটল, বিকশিত হল বিজ্ঞান। তখনো পণ্ডিতেরা উল্কার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। অনেকে এমন কি বিশ্বাস করতেন না যে আকাশ থেকে পাথর পড়তে পারে, ভাবতেন এ সব গল্প নেহাৎ বকবকানি, যাদের অন্য কিছু ভাবার নেই তারাই বলে।

উল্কা-পাথরের সঙ্গত অধ্যয়ন শুরু করেন রুশ আকাদমীর সদস্য পাল্লাস। ১৭৭২ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বিজ্ঞান আকাদমীকে তিনি খবর দিলেন যে নিকেল-মিশ্রিত এক খণ্ড লোহা সাইবেরিয়াতে পড়েছে আকাশ থেকে, ওজন ৩৯ পুদ ১৮ পাউণ্ড (প্রায় ৬৪০ কিলোগ্রাম)।

লোহাখণ্ডটিকে আনা হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে; বিজ্ঞান আকাদমীর বিখ্যাত উল্কাপিণ্ড সংগ্রহের এটিই প্রথম। নানা দেশের আকাদমীতে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হল 'পাল্লাস লোহা'র টুকরো। এরি পরে শুধু বিজ্ঞানীরা মেনে নিলেন যে উল্কাপিণ্ড সত্যি সত্যি 'আকাশ' থেকে পড়ে।

তাহলে দেখছো তো, 'স্বর্গীয়' উপাদানের চর্চাকাল দু শ' বছরের কম।

এ-সব উল্কাপিণ্ডে এমন কিছু কি পাওয়া গেল যা পৃথিবীতে নেই? আমাদের অজানা কোনো ধাতু বা খনিজ পদার্থ তাতে পাওয়া যায়নি; বেশির ভাগ হল লোহা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়ম, অক্সিজেন এবং গন্ধক।

শুধুমাত্র বিশুদ্ধ লোহার উল্কাপিণ্ড আছে। কয়েকজন ঐতিহাসিক তো ভাবেন যে, প্রথম লোহার যন্ত্রপাতি মানুষ বানায় উল্কাপিণ্ডেরই লোহা থেকে, আর শুধু পরে আকরিক থেকে লোহা গলাতে শেখে।

বিশ্বজগতের সমস্ত কঠিন দেহের উপাদান একই, কিন্তু সে জগতের নানা অংশ থেকে কী আকারে তারা আসে সেটা জানা দরকার।

উল্কাবৃষ্টি

এক একটা রাত্রে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার উল্কা। তাদের পিছরেখায় ভরে যায় সমস্ত আকাশ, পৃথিবীর দর্শকের মনে হয় আকাশ থেকে নক্ষত্রবৃষ্টি চলেছে।

কখন ঘটে উল্কাবৃষ্টি? অগণিত খুদে খুদে পাথর আর ধূলিকণায় গঠিত উল্কাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে রাত্রে পৃথিবী চলে সে-ই রাত্রে। লক্ষ লক্ষ পাথর আর ধূলিকণা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এসে পড়ে আর তৎক্ষণাৎ জ্বলে পুড়ে যায়।

উল্কাবৃষ্টি দেখতে ভারি সুন্দর।

পৃথিবীর ভূমিপৃষ্ঠে প্রতি বছর যত উল্কাপিন্ড পড়ে তার ভর কত? আগেই বলেছি, সংখ্যায় তারা কোটি কোটি। পুড়ে-যাওয়া উল্কাপিন্ডগুলিও ভূপৃষ্ঠে পেঁছয় খুদে ধূলিকণার আকারে, দহনজনিত গ্যাসেরও ওজন আছে। তাই যে কোনো উল্কাপিন্ডই পড়ুক, যত ক্ষুদ্রই হোক, পৃথিবীর বস্তুভর বেড়ে যায়।



উল্কাবৃষ্টি।

হয়ত ভাববে যে প্রতি বছর পৃথিবীতে পতিত উল্কাপিণ্ডগুলির ভর তাহলে অত্যন্ত বেশি। তা নয় কিন্তু। সবশুদ্ধ তাদের ওজন কয়েক হাজার টন মাত্র, জড়ো করলে দুটো মালগাড়িতে ভরা যায়।

বেশির ভাগ উল্কাপিণ্ড শুধু ধূলিকণা; বড়োগুলি, অর্থাৎ বোলাইড, অতি বিরল। পৃথিবীর বস্তুভর প্রতি বছর বাড়ে বটে, তবে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে।

উল্কাপিণ্ডের গোলাবর্ষণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে তার বায়ুমণ্ডল। সাধারণত বায়ুমণ্ডল আমাদের অসীম উপকারী। শুধু যে নিশ্বাস টানি তা নয় — বায়ু না থাকলে বাঁচা অসম্ভব — বায়ুমণ্ডল আমাদের বাঁচিয়ে রাখে সর্বপ্রকার বড়ো ছোট উল্কাপিণ্ড থেকে — এরা প্রতিনিয়ত পৃথিবীর জীবন সংশয় করে চলেছে। এগুলো আমাদের পানে ছোঁড়া গোলার মতো, কিন্তু দশ লক্ষের মধ্যে হয়ত হাজার খানেক পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়।

চাঁদে এত গর্ত কেন?

কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেন, কোটি কোটি বছর ধরে উল্কাপিণ্ড বর্ষণের দরুন। চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব অকিঞ্চিৎকর বলে গোলাবর্ষণ রোখার মতো কিছু নেই। অবশ্য অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, চাঁদের ভূত্বকে আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ায় এদের উৎপত্তি।

লোমশ নক্ষত্র — ভাবী অমঙ্গলের নিদর্শন

'কমেট' কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ 'কমেটেস' থেকে, যার অর্থ দীর্ঘলোম। সূর্যের কাছে এলে ধূমকেতুর যে অদ্ভুত পুচ্ছ নজরে পড়ে তার জন্য এই নাম।

আগেকার দিনে সূর্যগ্রহণের মতোই ধূমকেতু দেখে লোকেরা অত্যন্ত ভয় পেত। নির্দোষ জ্যোতিষ্কগুলির উপর কত যে বিভীষিকার আরোপণ হত তার ইয়ত্তা নেই।

'ধূমকেতু কলেরা, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মূলে।'

'ধূমকেতু হল যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প — এক কথায় যত কিছু দুর্বিপাক সম্ভব তাদের মূলে...'

'ধূমকেতু রাজারাজরা ও পোপের মৃত্যু আনে...'

ধূমকেতুর দিকে তাকালে তার পুচ্ছকে মনে হত জ্বলন্ত একটা তরবারি বা ছোরা অথবা স্বর্গীয় একটা ঝাঁটা যেটা পৃথিবীর বুক থেকে সব পাপীকে সাফ করবে। ১৫২৮ সালের কমেটে কত যে বিভীষিকা লোকে দেখে তার ছবি আছে ১৩৯ পৃষ্ঠায়।

প্রত্যেকটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ও কোন ভাবী দুর্বিপাকের লক্ষণ তাতে প্রকাশ — সে কথাটা লিখে রাখা হত ইতিবৃত্তে। একটি রুশ ইতিবৃত্তে ১০৬৬ সালের বর্ণনার ধূমকেতুর বিষয়ে লিখেছে: 'এক্ষণে পশ্চিম আকাশে লক্ষিত হইল অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ —

আমব্রুয়াজ পারে-র লেখা একটি পুরনো বই 'শূন্যলোকের রাক্ষস' থেকে ড্রয়িংটা নেওয়া। ১৫২৮ সালের ধূমকেতুটিকে দেখানো হয়েছে ড্রয়িঙে। এর নিচে লেখা: 'ধূমকেতুটি এত ভয়াবহ এবং লোকের মনে এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে অনেকে ভয়ে মারা যায়, অন্যরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসামান্য দীর্ঘ ধূমকেতুটির রঙ রক্তলাল। ওপরে একটি বৃহৎ খড়্গধারী হাত যেন কাউকে কেটে ফেলার জন্য আনত। তিনটি তারা জ্বলছে খড়্গটিকে ঘিরে। ধূমকেতু থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির দু পাশে অনেক রক্তাক্ত কুঠার, ছুরি আর তরবারি; এদের মাঝে উস্কোখুস্কো চুলওয়ালা কাটা মুণ্ড সব।'



অতিকায় একটি নক্ষত্র যাহার রশ্মি যেন রক্তাপ্লুত। সূর্যাস্তের পর উত্থিত হইয়া এটি সপ্ত দিবস রহিল। তাহার পর ঘটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পলভ্‌ৎসি কর্তৃক রুশভূমি আক্রমণ; রক্তাক্ত নক্ষত্র সর্বদা রক্তপাতের পূর্বলক্ষণ।'

১৩৭৮ সালে, কুলিকভোর যুদ্ধে তাতার শক্তি বিনষ্ট হবার দু বছর আগে ইতিবৃত্তকার লেখেন: 'অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটিল, বহু রাত্রি ধরিয়া আকাশে দৃষ্ট হইল এই পূর্বলক্ষণটি: পূর্বদিকে, উষাকালে, বর্শাসদৃশ পুচ্ছসমেত একটি নক্ষত্র বহুবার আবির্ভূত হইল... তখ্‌তামিশ কর্তৃক রুশভূমিকে অশুভ আক্রমণ এবং খৃষ্টবিশ্বাসীদের উপর পৌত্তলিক তাতার হামলার পূর্বলক্ষণ এটি...'

এমন কি কয়েক শ' বছর পরে, ১৮১১ সালে উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুকে রাশিয়ায় দেখা যাওয়াতে লোকে সেটিকে যুদ্ধের পূর্বলক্ষণ ভাবে। আর হবি তো হ, পরের বছরই নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী রাশিয়াকে আক্রমণ করে। আরম্ভ হল ১৮১২ সালের দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, মস্কো দগ্ধ হল... এতে ধূমকেতুর অশুভ লক্ষণে লোকের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

এডমণ্ড হ্যালি ও তাঁর ধূমকেতু

সাধারণ লোকের কাছে ধূমকেতু তো জুজুর সামিল। কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে? আগেকার কালে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে ধূমকেতু হল বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা, মেরুজ্যোতি, ঝড়োমেঘ ও বিদ্যুতের মতো। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, আকাশে-জ্বলা ক্ষতিকর গ্যাসের মেঘ হল ধূমকেতু।

ধূমকেতু নিয়ে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা চালান তিনি হলেন তিখো ব্রাহে। ষোলো শতকের শেষাশেষির লোক। ১৫৭৭ সালে পৃথিবী থেকে একটি ধূমকেতুর দূরত্ব তিনি মাপতে সক্ষম হন, দেখলেন যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সেটা, চাঁদের চেয়েও অনেক দূরে। তিনি জানতেন যে চাঁদ হল জ্যোতিষ্ক; অতএব ধূমকেতুও তাই।

১৬০১ সালে তিখো ব্রাহের দেহান্তর হয়। তারপর ধূমকেতু নিয়ে গবেষণা চালান আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কেপলার। অনেক ধূমকেতু প্রায়ই পৃথিবীর কাছে আসে আর মহাশূন্য তো অসীম, তাই কেপলার এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সমুদ্রে যত মাছ তত ধূমকেতু মহাশূন্যে। তিনি অবশ্য ভেবেছিলেন যে ধূমকেতুগুলি চলে সরল রেখায়। এটা ভুল।

কেপলার বললেন, 'মহাশূন্য থেকে এসে ধূমকেতুগুলি সৌরজগতের মধ্য দিয়ে গিয়ে চিরতরে অদৃশ্য হয়।'

একেবারে ভুল কথা। সরল রেখায় চলে না কোনো জ্যোতিষ্ক। সাধারণত ধূমকেতু চলে দ্রাঘিত বৃত্তে বা উপবৃত্তে, উধাও হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

ইংরেজ নাবিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি প্রথম আবিষ্কার করেন যে ধূমকেতুরা সৌরজগতের নিয়মিত বাসিন্দে। ধূমকেতু আবির্ভাবের বিষয়ে পুরনো নথিপত্র পড়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে কয়েকটির আবির্ভাবের কালপর্যায় প্রায় সমান। যেমন, ধূমকেতু দেখা দেয় ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ সালে।

পণ্ডিতেরা ভেবেছিলেন তিন সময়ে তিনটি ধূমকেতু আসে। কিন্তু আকাশে তাদের গতিপথ প্রায় এক রকম। প্রসঙ্গত ১৬৮২ সালের ধূমকেতুটিকে হ্যালি নিজে দেখে আকাশে তার গতিপথ বা কক্ষপথ রেকর্ড করেন। হ্যালির যুক্তিধারা ছিল: ১৫৩১ থেকে ১৬০৭ হল ৭৬ বছর, আর ১৬০৭ থেকে ১৬৮২ — ৭৫ বছর। পালাক্রমে যা ঘটে তার নাম পর্যায়িক। যদি ধরা যায় যে, ধূমকেতুর আবির্ভাবও, একেবারে হুবহু না হলেও, পর্যায়িক ব্যাপার? এটা সত্যি হলে তার অর্থ যে ধূমকেতুগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অতি দ্রাঘিত কক্ষপথে, একটি চক্রপাকে লাগে সাড়ে পঁচাত্তর বছর।

ধূমকেতুর অনিয়মিত গতির ব্যাখ্যা সহজে মেলে: কক্ষপথে ঘোরার সময়ে ধূমকেতুটি বৃহস্পতি ও শনির কাছে আসে এবং এ দুটি অতিকায় গ্রহের বিপুল মহাকর্ষে গতিবিচ্যুতি ঘটে।

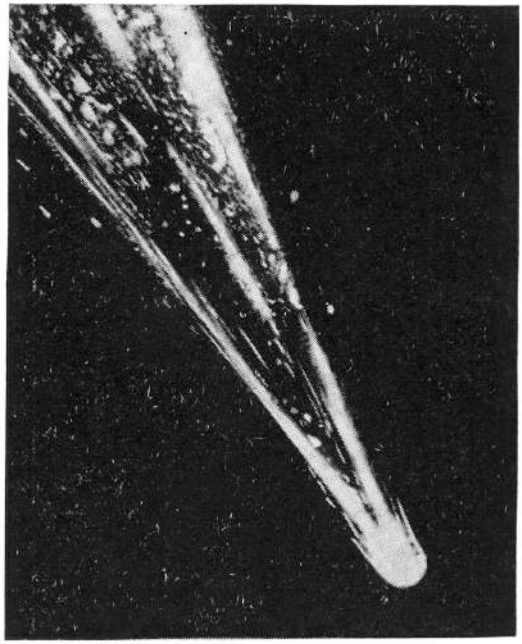
হ্যালি বললেন, 'আমার সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তাহলে ১৭৫৮ সালে আবার দেখা যাবে ধূমকেতুটিকে।' নিজের তদন্তের বিবরণ হ্যালি ছাপান, অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খবর পেলেন।

এডমণ্ড হ্যালি তাঁর দীর্ঘ ও মূল্যবান কর্মজীবন বিজ্ঞানের সেবায় কাটান। ১৭৪২ সালে, ৮৬ বছর বয়সে, অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মতো ধূমকেতু আবির্ভাবের ষোলো বছর আগে, তাঁর মৃত্যু ঘটে। আর ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দিল ধূমকেতু।

এ-ভাবে হ্যালি প্রতিপন্ন করলেন ধূমকেতুদের পর্যায়িকতা, তখন স্পষ্ট হল যে এরা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত।

ধূমকেতুটির নাম হ্যালি ধূমকেতু। এখনো সে নাম।

গ্রহের মতো নিজস্ব একটা নাম সচরাচর ধূমকেতুদের মেলে না। পর্যায়িক হলে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ধূমকেতুটিকে আবিষ্কার বা গতিপথ নির্ণয় করেছেন তাঁর নাম দেওয়া হয়। পর্যায়িকতা প্রমাণিত না হলে যে বছরে পৃথিবীর কাছে এসেছে সে বছরের উল্লেখ করা হয় — যেমন ১৮১১ সালের ধূমকেতু।

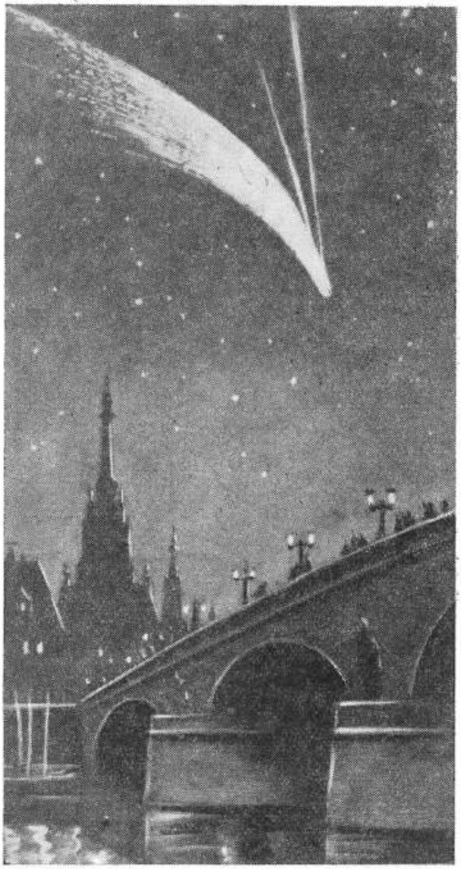


হ্যালির ধূমকেতু।

ধূমকেতুর পথ

মহাশূন্যে ধূমকেতুর পথ বা কক্ষপথ অধ্যয়নে বিশেষ বেগ পেতে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। প্রথম ধূমকেতুগুলি নথিবদ্ধ হবার পর প্রায় দেড় হাজারটি দেখা দিয়েছে। অবশ্য এটা সত্যি যে সব ধূমকেতুর বিষয়ে প্রাচীন ইতিবৃত্তে লেখা হয়নি, আর তার চেয়ে বড়ো কথা, অনেক লিখিত ইতিবৃত্ত যুদ্ধবিগ্রহ বা অগ্নিকাণ্ডে লুপ্ত হয়েছে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধূমকেতুগুলির কক্ষপথ অত্যন্ত দ্রাঘিত। আমরা এখন এমন অনেক ধূমকেতুকে চিনি যাদের সূর্য প্রদক্ষিণ কাল খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু বহিঃশূন্যে এমন কয়েকটি ধূমকেতু ধরা পড়েছে যাদের বর্ষকাল ইউরেনস, নেপচুন বা প্লুটোর চেয়ে দীর্ঘ।



একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু।

১৮৫৮ সালের উজ্জ্বল ধূমকেতু সূর্য থেকে ১৫০ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট সরে যায়। অর্থাৎ সাড়ে বাইশ শ' কোটি কিলোমিটার, প্লুটোর চেয়ে চার গুণ দূরে। অত দূর থেকে সূর্যকে খুদে একটা তারা বলে মনে হবে, তবু চাঁদের চেয়ে প্রায় বিশ গুণ উজ্জ্বল সেটি।

সূর্য থেকে এত দূরে বলে ধূমকেতুটি পদচারীর চেয়ে একটু দ্রুতগতি। কিন্তু সূর্যের যত কাছে আসে তত বেশি সূর্যের মহাকর্ষ, তত দ্রুত ধূমকেতুটির বেগ।

সূর্যের কাছাকাছি অনেক ধূমকেতু চলে সেকেণ্ডে ৪০০-৫০০ কিলোমিটার বেগে। প্রচণ্ড এ বেগ, নইলে সূর্যে গিয়ে পড়ত — বেগজনিত কেন্দ্রাতিগ শক্তি সৌর মহাকর্ষকে প্রতিরোধ করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গণনা করেছেন যে ১৮৫৮ সালের ধূমকেতুটি সূর্যকে দু হাজার বছরে একবার চক্কর দেয়। পৃথিবীর কাছাকাছি হয়ে এটি আবার যাবে উনচল্লিশ শতকে, অবশ্য পথে যেতে যেতে যদি কিছু না ঘটে। গ্রহিকার সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে যেতে পারে, বৃহস্পতি বা শনির খুব কাছে গিয়ে পড়লে মহাকর্ষে বদলে যেতে পারে কক্ষপথ।

ধূমকেতু পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট নয় ১৮৫৮ সালেরটি। দশ হাজার বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণকারী ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা বহিশূন্যের এত সুদূরে গমন করে যে হিসেবের বাইরে, তবু ফিরে আসে শেষ পর্যন্ত, সূর্যের টান এত বেশি।

ধূমকেতুর গঠন

সাধারণত বলা হয়, ধূমকেতুর তিনটি ভাগ: কেন্দ্র, মাথা আর পুচ্ছ।

ধূমকেতু-বিশেষজ্ঞরা প্রতি রাত্রে আকাশে নজর রাখেন, যদি নতুন একটা দেখা দেয়। টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্রে আগে-না-দেখা আবছা গোল ছোপ এলেই তাঁরা বলে ওঠেন: 'ধূমকেতু!'

গ্রহের মতো স্পষ্ট অবয়ব নেই ধূমকেতুর — ধারগুলো ঝাপসা অস্পষ্ট, তার কারণ, ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল বা পাথর-নিউক্লিয়স গ্যাসের আচ্ছাদনে আবৃত। বাইরের এই গ্যাস-আচ্ছাদনকে বলা হয় ধূমকেতুর মাথা।

কয়েকটা ধূমকেতুর মাথা প্রকাণ্ড। ১৯১০ সালে হ্যালির যে ধূমকেতু শেষ দেখা দেয় (এ বই-এর লেখক কপালগুণে সেটা দেখেন) তার মাথার ব্যাস ৩ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার, অর্থাৎ অতিকায় শনিগ্রহের তিন গুণ। এমন ধূমকেতুও আছে যাদের ব্যাস সূর্যের চেয়ে বড়ো।

এরাই তাহলে সৌরজগতের দৈত্য বুঝি। কিন্তু তা নয়, কেননা ধূমকেতুর মাথা হল অত্যন্ত অনিবিড় গ্যাসের পুঞ্জ। যে বিজলী বাতি থেকে ফিলামেণ্ট না পোড়ে এমন ভাবে হাওয়া বের করে দেওয়া হয়েছে, সেই বিজলী বাতির 'ভ্যাকুয়াম' ধূমকেতু-নিউক্লিয়সকে ঘেরা গ্যাসের চেয়ে হাজার গুণ ঘন।

ধূমকেতুর পাথর-নিউক্লিয়স গ্রহিকার চেয়ে বড়ো নয়, তাও ছোট গ্রহিকার কথা বলছি।

অবশ্য ধূমকেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার নিউক্লিয়স বা মাথা নয় — সেটা হল পুচ্ছ। এই অগ্নিদর্শন পুচ্ছই অনাদি কাল থেকে মানুষকে গ্রাসগ্রস্ত করেছে।

পুচ্ছটি কিসের, সে সমস্যা বেশ কঠিন।

অনেক দিন লমোনোসভ চিন্তা করেন কেন ধূমকেতুর পুচ্ছ সর্বদা সূর্য থেকে অন্য দিকে থাকে। তিনি ভাবতেন সূর্য থেকে নিঃসৃত কোনো বিকর্ষণ শক্তি নিশ্চয়ই ধূমকেতু কণাগুলিকে বাহিরমুখো করে দেয়। শতাধিক বছর পরে তাঁর আশ্চর্য অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল।

উনিশ শতকের শেষার্ধে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ফিওদর ব্রেদিখিন (১৮৩১—১৯০৪) ধূমকেতু পুচ্ছ নিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি এবং পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বলেন:

সূর্য থেকে বহুদূরে একটি বিরাট পাথরখণ্ড বা ক্ষুদ্রতর পাথরের পুঞ্জ ধেয়ে চলেছে মহাশূন্যে। ক্ষুদ্র পাথরকণাগুলির মধ্যবর্তী স্থান নাইট্রজেন, কার্বন ডায়োক্সাইড, সিয়ানজেন (খুব বিষাক্ত গ্যাস) ইত্যাদি গ্যাসে ভর্তি।

সূর্যের কাছে আগমনকালে সূর্যরশ্মিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পাথরটি। ভিতরের গ্যাস কেঁপে উঠে নিঃসৃত হয় পাথর থেকে। এ-সব গ্যাস হল ধূমকেতুর মাথা।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব যতটা ততটা ধূমকেতু এলে সূর্যের বিকর্ষণ ক্রিয়ায় গ্যাসগুলি মাথা থেকে সরে যায়, গড়ে ওঠে পুচ্ছ। সূর্যের কাছে আসতে আসতে পুচ্ছটি বাড়ে, অথচ সর্বদা সূর্যের দিক থেকে ঘুরে থাকে এটি। পুচ্ছের দৈর্ঘ্য কত কোটি কিলোমিটার তার ইয়ত্তা নেই। একটি ধূমকেতুর পুচ্ছ তো ৯০ কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ।



ফিওদর আলেক্সান্দ্রভিচ ব্রেদিখিন (১৮৩১—১৯০৪)।

দেখা গিয়েছে যে দুটি শক্তি গ্যাসের বিকর্ষণ ঘটায়। একটির প্রকৃতি এখনো অজানা, অন্যটি হল আলোর চাপ।

রুশ পদার্থবিদ পিওতর লেবেদেভ দেখিয়ে দেন যে আলো পড়লে সবকিছুকেই চাপ সহ্য করতে হয়।

আলো-চাপ অকিঞ্চিৎকর। পৃথিবীর সূর্যমুখী দিকটায় আলোর চাপ মাত্র ১০ হাজার টন গোছের। আলোর চাপে মটরসুটি বা গমের দানা বিকর্ষিত হবে না, কেননা তলক্ষেত্রের তুলনায় তাদের ভর অত্যধিক। কিন্তু ক্ষুদ্র কণার ভর অপরিমেয় কম, তাদের ছোটাবার পক্ষে আলোর চাপ যথেষ্ট। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ধূমকেতুর পুচ্ছের সঙ্গে জড়িত অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে আলো-চাপে।

সূর্য থেকে দূরে সরে আসার সময় ধূমকেতুর প্রকাণ্ড পুচ্ছ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আবার ধূমকেতু হয়ে দাঁড়ায় শুধু একটা পাথরখণ্ড, টেলিস্কোপে যেটা চোখে পড়ে না।

ধূমকেতুর অদৃষ্ট

ধূমকেতুর নিউক্লিয়স অনেকক্ষণ ধরে কি গ্যাস নিঃসৃত করতে পারে?

সূর্যের কাছে এলেই ধূমকেতুর বহির্ত্বক তপ্ত হয়ে ওঠে — কয়েক মিটার গভীর পর্যন্ত — আর এই বহির্ত্বক থেকে নিঃসৃত গ্যাসেই ধূমকেতুর মাথা ও পুচ্ছের সৃষ্টি। সূর্য থেকে অপসারণের সময়ে নিউক্লিয়সের ভিতর থেকে গ্যাস পাথরের বুকে এসে

বহির্স্তরের ফাঁকগুলি ভরিয়ে দেয়। সূর্যকে এক একটা পাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয়সে গ্যাসের পরিমাণ কমে যেতে থাকে।

ধূমকেতু-পুচ্ছ তাই অক্ষয় নয়। একটা সময় পুচ্ছকে আর দেখা যাবে না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করেছেন যে হ্যালির ধূমকেতুতে সূর্যকে আরো ১২৫ পাক দেবার মতো গ্যাস আছে, অর্থাৎ প্রায় আরো ন হাজার পার্থিব বছরের মতো। হ্যালির ধূমকেতুর নিউক্লিয়সের ব্যাস প্রায় ২০ কিলোমিটার, তাই এত দীর্ঘ মেয়াদ। ছোট নিউক্লিয়সের ধূমকেতু গ্যাস খরচ করে আরো অনেক আগে।

ধূমকেতুর নিউক্লিয়সও দীর্ঘায়ু নয়।

মাঝে মাঝে তো নিউক্লিয়স সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন বা পাঁচটি বিরাট খণ্ডে ভেঙে যায়। তখন খণ্ডগুলি দল ছাড়া চলে — প্রত্যেকের পেছনে এক একটি পুচ্ছ। একটি ধূমকেতু থেকে এ-ভাবে দেখা দেয় কয়েকটি।

বিয়েলা-র ধূমকেতু নিয়ে একটা চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। প্রায় সাত বছরে এটি সূর্যকে একবার ঘোরে। ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ সালে ঠিক সময় দেখা গেল একে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভাবলেন ১৮৪৫ সালে আবার সাক্ষাৎ হবে। ঠিক সময় ধূমকেতুটির উদয় হল কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর একটা খারাপ ব্যাপার ঘটে — পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে দু টুকরো হল ধূমকেতুটি। একটা অন্যের চেয়ে অনেক বড়ো, মনে হল ধূমকেতুটির একটি অনুচর জুটেছে। বড়ো ধূমকেতু আর তার অনুচরের দূরত্ব অতি দ্রুত বেড়ে ১০ই ফেব্রুয়ারিতে দাঁড়াল দু লক্ষ কিলোমিটারের বেশি। তারপর দেখা গেল না।



সূর্য থেকে নানান দূরত্বের ধূমকেতুর চেহারা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আগ্রহ দেখে কে। অধৈর্যভাবে তাঁরা বিয়েলার ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রইলেন। আগমন ঘটল ১৮৫২ সালে, কিন্তু তখন তার অনুচর ১৫ লক্ষ কিলোমিটার পিছে — পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চার গুণ বেশি।

সযত্নে অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও ১৮৫৯ এবং ১৮৬৬ সালে ধূমকেতুটিকে পাওয়া গেল না। ১৮৭২ সালে আবার দেখা দিল, তবে পরিবর্তিত আকারে। ১৮৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর এর কক্ষপথের কাছ দিয়ে যায় পৃথিবী। হাজার হাজার ঝকঝকে তারা আকাশে ধেয়ে নিভে গেল: বিয়েলার ধূমকেতু পরিণত হল উল্কাস্রোতে, উল্কাবৃষ্টিতে। আর কিছু রইল না।

এরপর বিয়েলা ধূমকেতুর কক্ষপথ পৃথিবী অনেক বার অতিক্রমণ করেছে, এবং প্রতিবার দেখা গিয়েছে নক্ষত্রবৃষ্টি — বায়ুমণ্ডলে পুড়তে পুড়তে অনেক ছোট ছোট উল্কাপিণ্ডের ঝলক।

তাহলে ধূমকেতু যতোই বড়ো বা কঠিন দেখাক শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট পাথর আর ধূলিকণার স্রোতে পরিণত হয়ে মহাশূন্যে ধেয়ে চলবে।

ধূমকেতুরা দীর্ঘজীবী নয়। গ্রহের তুলনায় ধূমকেতুর জীবন নিমেষের। সবকটি ধূমকেতু অনেক আগে নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু নতুনেরা দেখা দেয়। কোথা থেকে এদের আগমন?

গ্রহিকা ফেটে ধূমকেতু গড়ে ওঠে বলে লোকের বিশ্বাস। বিস্ফোরণের পর একটা খণ্ড যদি অতি দ্রাঘিত কক্ষপথে চলতে থাকে তাহলে সেটা ধূমকেতু হয়।

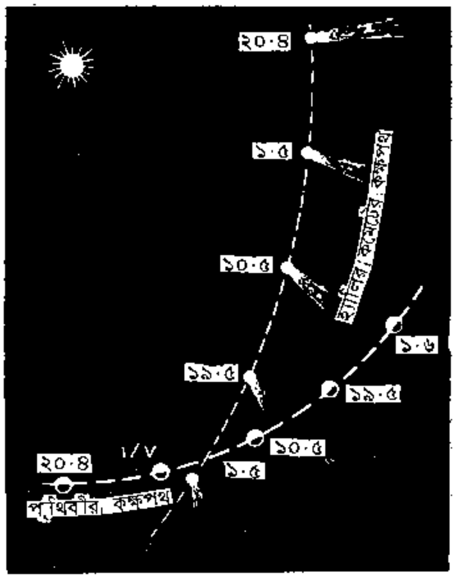
আর একটি মতবাদ হল: অতিকায় বৃহস্পতি আর শনিগ্রহে ধূমকেতু গড়ে ওঠে। এ দুটি প্রকাণ্ড গ্রহে হয়ত আগ্নেয়গিরি বর্তমান, তা থেকে উৎক্ষিপ্ত বিরাট পাথরখণ্ড পরে হয়ত ধূমকেতুতে পরিণত হয়। ধূমকেতুর উৎপত্তি বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনো বিজ্ঞানে মেলেনি।

ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ

আগেকার দিনে ধূমকেতুকে যত প্রকার দুর্বিপাকের পূর্বলক্ষণ বলে ধরা হত, সে কথা তোমাদের বলেছি। ধূমকেতুর আসল প্রকৃতি বিষয়ে তথ্যলাভের পর ভয়টা কমেছে বটে, কিন্তু দেখা দিয়েছে নতুন আশঙ্কা: ওদের কক্ষপথ বাঁধা ধরা নয়, ওরা তো বিভিন্ন দিকে ছুটে চলে। পৃথিবীর সঙ্গে কোনো একটা ধূমকেতুর ধাক্কা লাগবে, এটা ভাবা কি অসঙ্গত? তাহলে তো মহাজাগতিক দুর্বিপাক ঘটবে, সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ফলে মহাশূন্যে অতি প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে। মনে রাখা দরকার যে, এমন কি এক শ' বছর আগেও ধূমকেতুর আসল আয়তন বিষয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিছু জানতেন না, ভাবতেন যে বিরাট আয়তন। যেমন, মনে করা হত যে লেক্সেল-এর ধূমকেতুটির (১৭৭০ সালে প্রথম দেখা) বস্তুভর অন্তত

১০০০০০০০০০০০,০০,০০,০০০ টন (১ সংখ্যার পর ১৮টি শূন্য)।

এ-রকম একটা বিরাট বস্তুপুঞ্জ সরাসরি পৃথিবীর দিকে এলে ব্যাপারটা গুরুতর হবে বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন প্রমাণ করলেন যে ধূমকেতুর নিউক্লিয়স হল বড়ো একটা পাথর মাত্র, তখন বোঝা গেল যে এর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে পৃথিবীর সমূহ বিপদ হবে না: আর একটি অতি বড়ো উল্কাপিণ্ড পড়বে, ব্যস, আর কিছু নয়।



পৃথিবীর কক্ষপথকে অতিক্রমণ করছে হ্যালির ধূমকেতু।

তারপর আর একটা মহাতঙ্ক দেখা দিল: পৃথিবী যদি কোনো ধূমকেতু-পুচ্ছের ভিতর দিয়ে যায়? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের রচনায় লোকে পড়েছিল যে পুচ্ছ হল বিষাক্ত গ্যাসের সমষ্টি। পুচ্ছটি তাহলে পৃথিবীকে ঘিরে সমস্ত প্রাণীর দম বন্ধ করে মৃত্যু ঘটাবে...

ধূমকেতুর পুচ্ছ কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ আর বিরাট চওড়া, তাই নিউক্লিয়সের সঙ্গে ধাক্কা লাগার চেয়ে পুচ্ছের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

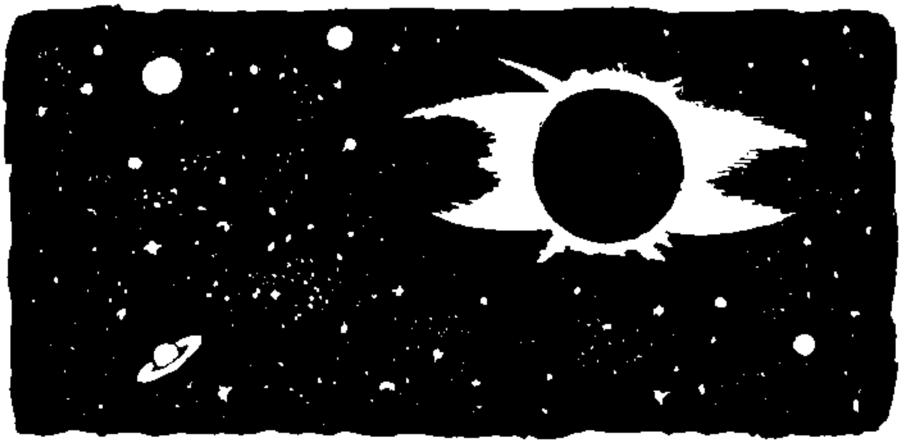
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখলেন যে সত্যি সত্যি ১৯১০ সালে পৃথিবী হ্যালির ধূমকেতু-পুচ্ছের মধ্য দিয়ে যাবে। পাল্লা দিয়ে খবরের কাগজে বেরোল পৃথিবীর আসন্ন মহাবিপদের কথা। তারা বলল, প্রলয় আসন্ন।

স্বভাবতই কোটি কোটি লোকের মনে আতঙ্ক। তেহেরানে অনেকে তো নিজেদের বাঁচাবার জন্য গর্ত খুঁড়ল (যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার তখনো হয়নি)। প্যারিসে অনুতপ্তদের দোষস্বীকারে যাজকদের আর ফুরসৎ মেলে না। আর ভিয়েনায় কয়েকটি ধনীব্যক্তি ভয়ে আত্মহত্যা করলেন।

১৯১০ সাল, ১৯শে মে। পৃথিবী হ্যালির ধূমকেতু-পুচ্ছের মধ্য দিয়ে গেল। কী হল? রাত্রে আগেকার মতোই তারার দ্যুতি, সকালে পাখির গান, লোকে আগেকার মতোই সহজে নিশ্বাস ফেলছে...

এর কারণ: ধূমকেতু-পুচ্ছের গ্যাসের চেয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কয়েক কোটি গুণ ঘন। মশা যেমন এক মিটার পুরু ইস্পাতের দেয়াল ভেদ করে কামড়াতে পারে না, তেমন ধূমকেতু গ্যাসের পক্ষে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করা অসম্ভব। এটা যাদের জানা ছিল তারা ধূমকেতু-পুচ্ছের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গমনের সময়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোল।

এ-ভাবে লোকের ভয় আর কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে বিজ্ঞান।



তৃতীয় খণ্ড

সূর্য

এমন কি প্রাচীন কালেও লোকে জানত যে সূর্য বিনা পৃথিবীতে প্রাণ থাকা সম্ভব নয়। তারা ভাবত সূর্য হলেন সদাশয় দয়ালু দেবতা। প্রাচীন গ্রীকেরা সূর্যকে বলত হিলিয়স, রোমানরা বলত ফিবাস (বা এ্যাপোলো) আর স্লাভরা ইয়ারিলো।

পুরোনো একটি লোক-প্রবচন আছে: উত্তর গোলার্ধে বছরের হ্রস্বতম দিনে, ২২শে ডিসেম্বর, 'সূর্য ঘোরে গ্রীষ্মের দিকে'। আগেকার ছ মাসে তিলে তিলে মৃত্যুর পর এ-দিনে মনে হয় সূর্যের পুনর্জন্ম হল। মহাবিষুবের দিনে সূর্য শীতের অশুভ শক্তির উপর চরম জয়লাভ করে।

আগেকার দিনে শীতকালে নবসূর্যের জন্ম ছিল একটি উৎসব। শীতের হিম-জমাট প্রকৃতিদেবীর নবজন্ম হত বসন্তকালে, লোকে তাকে অভ্যর্থনা জানাত। এই পৌত্তলিক উৎসবগুলি এখন পর্যন্ত চলে এসেছে ক্রিসমাস (যীশুর জন্মদিন) এবং ইস্টার (যীশুর পুনর্জন্ম) হিসেবে।

পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীর পরাক্রান্ত উৎস হল সূর্য। সূর্যের আলো আর উত্তাপ ছাড়া কোনো জীবসত্তা বাঁচতে পারে না — হোক না মানুষ বা ক্ষুদ্রতম জীবাণু। সূর্যের তাপ পৃথিবীর সমস্ত কার্যকলাপ, বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বললে, পারমাণবিক শক্তি বাদে পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্র সূর্য-থেকে-পাওয়া শক্তি লোককে দিত। কিন্তু ১৯৫৪ সালে দুনিয়ার প্রথম পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র চালু হল সোভিয়েত ইউনিয়নে। কয়েকটি পদার্থে নিহিত শক্তির দ্বারা চালিত হয় এই শক্তিকেন্দ্র।

রুশ মহাকবি আলেক্সান্দর পুশকিনের একটি রূপকথায় প্রিন্স ইয়েলিসেই বাতাসকে উদ্দেশ করে বলেন:

> হে বাতাস, তুমি বিশাল শক্তি ধরো,
> মেঘের পর মেঘ রাখো তুমি,
> সমুদ্র ফুঁসে ওঠে তোমার তাড়নায়,
> সবকিছুর উপর তোমার বিরাট নিশ্বাস,
> কাউকে ডরাও না তুমি, হে বাতাস...

কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে বাতাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ, হুকুম দেবার লোক না থাকলেও বিরাট উপকার করে চলেছে।

অগণিত জলকণা হাওয়ায় ভাসে, সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। হালকা বাষ্প ক্রমশ উপরে উঠে শেষ পর্যন্ত আসে বায়ুমণ্ডলের সর্বদা ঠাণ্ডা স্তরে। অদৃশ্য বিক্ষিপ্ত বাষ্প জমে আবার জলকণায় পরিণত হয়। পৃথিবীর বুকে থাকলে এদের বলতাম কুয়াশা কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তারা গড়ে মেঘ।

ভেবে দেখো, কোনো বিপুল অশুভ শক্তির ফলে হাওয়া নিশ্চল হল, জলে স্থলে আর উদ্দাম ঘূর্ণিঝড় নেই, আবহাওয়ার পূর্বাভাষে প্রায়ই উল্লিখিত মৃদুমন্দ হাওয়া নেই! এমন কি ফুরফুরে হাওয়াও নেই।

কী ঘটবে তাহলে? যতটুকু আয়ু ততটুকু আকাশে নিশ্চল হয়ে থাকবে মেঘ, শেষে ক্ষুদ্র জলকণাগুলি মিশে এত ভারি হবে যে বায়ুমণ্ডলে ভাসার ক্ষমতা হারিয়ে ফিরে যাবে মহাসাগরে, কোনো উপকার না করেই। বারবার ঘটবে এরি পুনরাবৃত্তি... জলের মহাসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে, মজে যাবে নদী আর স্রোতস্বিনী, শুকিয়ে যাবে মাঠের সবুজ ঘাস, ক্ষেতের শস্য; বনের গাছ ঝলসে হলদে হয়ে যাবে... সমস্ত শুকনো জমি দাঁড়াবে মরুভূমিতে। সমতলে ধুলোর ভারি স্তর জমে জমে শেষ পর্যন্ত দেখাবে চান্দ্র সমুদ্রের মতো, আন্তঃগ্রহ রকেটে আমাদের কল্পিত যাত্রার পর যেগুলিকে আমরা দেখি।

তৃষ্ণার্ত পৃথিবীকে বৃষ্টিদান, নানা স্রোতধারাকে মিশিয়ে বিশাল নদীর সৃষ্টি — শুধু এই উপকারটুকুই করে না বাতাস। বাতাসের গতির উপর অনেকটা নির্ভর করে আমাদের আবহাওয়া।

শীতকাল। বাইরে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি। রেডিওতে আবহাওয়ার বিষয়ে বলল: 'সুমেরু থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের পুঞ্জ চলেছে ইউরোপীয় রাশিয়ার উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের দিকে, এতে তাপমাত্রা বেশ নিচুতে নেমেছে এবং কয়েকদিন সে-রকম থাকবে।'

'সুমেরু থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের পুঞ্জ' ব্যাপারটা কী? সুমেরুর ধুধু বিস্তার থেকে আসা হিম-বাতাস।

উল্টোটাও ঘটে: শীতের মধ্যিখানে হানা দেয় দক্ষিণের গরম হাওয়া, রাস্তাঘাটে জল ছোটে, স্কেটিং রিঙ্কের বরফ গলে যায় — অকাল বসন্ত আনে গরম হাওয়া।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বায়ুপুঞ্জের বিনিময় মহাব্যাপার একটা। এতে আবহাওয়া হয় আরো সহনীয়। গরম জায়গায় ঠাণ্ডা আনে আর ঠাণ্ডা জায়গায় গরম।

কাজগুলো বেশ বড়ো, কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের জন্য হাওয়া আরো অনেক কিছু করে। লোকে হাওয়াকে খাটায় — হাওয়ায় জাহাজ চলে, হাওয়া-কলের চাকা ঘোরে, ঘোরে বায়ু-মোটরের পাখা। শেষেরটির গুরুত্ব বছরে বছরে বেড়ে চলেছে। বৃক্ষহীন অঞ্চলে যেখানে সারা বছর হাওয়ার দমক সেখানে বৈদ্যুতিক জেনেরেটর চালানোর জন্য হাওয়া হল সস্তা শক্তির উৎস। হাওয়ায় উৎপাদিত শক্তি জমিয়ে রেখে দরকার মতো ব্যবহার করা চলে।

তাই হাওয়া আমাদের হিতৈষী। অবশ্য মাঝে মাঝে হাওয়ার উৎপাতে বিরক্ত লাগে। দমকা হাওয়ায় মাথার টুপি গেল উড়ে বা জানলা দড়াম করে বন্ধ হওয়াতে কাঁচ ভেঙে গেল — এগুলো তো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আরো গুরুতর সব কাণ্ড ঘটে: প্রচণ্ড ঝড়ে বাড়ির ছাদ উড়ে যায়, আমূল উৎপাটিত হয় গাছ, লাইন থেকে পড়ে যায় ট্রেন, সমুদ্রে জাহাজ ডোবে... অনেক দুর্বিপাক ঘটায় হাওয়া, তবু অসামান্য উপকার করে বলে তাকে ক্ষমা করা উচিত।

আগেই বলেছি যে বাতাস না থাকলে নদী থাকত না। আর জলস্রোত নিজেই শক্তির বিরাট উৎস। আগেকার দিনে ছোট নদীতে জল-কল বানিয়ে বা ভেলা ভাসিয়ে সে শক্তির সামান্যটুকু ব্যবহার করত লোকে, কিন্তু আজ নদীকে দিয়ে আসল কাজ করাতে শিখেছে মানুষ। মহানদীতে বাঁধ তোলা হয়, আবদ্ধ জল উঁচু থেকে বৈদ্যুতিক জেনেরেটরে লাগানো টার্বাইনের চাকায় পড়ে। তার হয়ে বিদ্যুৎ শক্তি যায় দেশের সর্বত্র, এমন সব কাজ করে যার কথা আগে স্বপ্নেও ভাবা যেত না।

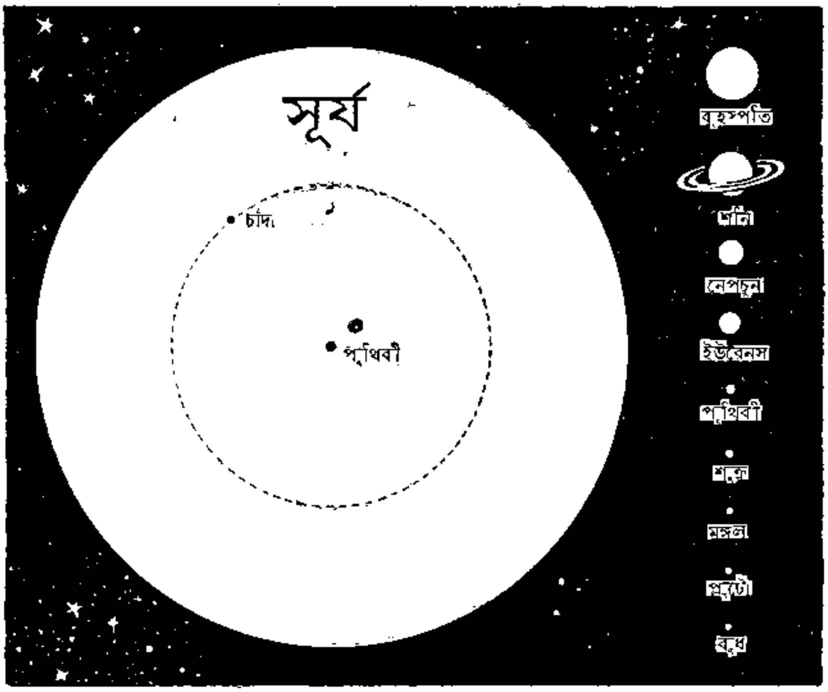
বেশ কিছু কাল ধরে লোকে এ ধারণায় অভ্যস্ত যে বিদ্যুৎ শক্তি যন্ত্র চালায়, সহরের রাস্তা আর বাড়ির আলো জ্বালায়। কিন্তু এমন কি বছর পঞ্চাশ আগেও কে ভেবেছিল যে

বিদ্যুৎ শক্তিতে জমি চষা হবে, বনের গাছ কাটা চলবে, গরুমোষের খাবার কাটা, এমন কি গরু দোয়ানো পর্যন্ত হবে?

দুনিয়ার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বানানো হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এদের দুটো, ভলগোগ্রাদ এবং কুইবিশেভ কেন্দ্র প্রতি দিন যা শক্তি উৎপাদন করে তা যন্ত্র বিনা করতে হলে দিনে আট ঘণ্টা করে খাটতে হত সাড়ে সাত কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মজুরকে। আরো বড়ো কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে আঙ্গারা এবং ইয়েনিসেই নদীতে।

এ শক্তি আমরা পাই সূর্য থেকে।

দুপুরের খাবার খাচ্ছ — মাংস আর সব্জি, রুটি মাখন ফল। বাঁধাকপি, আলু, রুটি, আপেল বা ফুটিতে যে পুষ্টিকর জিনিস তা সূর্যরশ্মির সাহায্যে এসেছে কার্বনিক এ্যাসিড, নাইট্রজেন এবং জল থেকে।



সূর্য যদি ফাঁপা একটা গোলক হত, যদি কেন্দ্রে থাকত পৃথিবী, তাহলে চাঁদের কক্ষপথ পড়ত সূর্যের মধ্যে।

সূর্যালোক ও তাপ ছাড়া গাছপালা বাঁচতে পারে না। পৃথিবীতে গাছপালা না থাকলে জীবজন্তু বা মানুষ থাকত না।

তাছাড়া গাছপালা আমাদের জোগায় জ্বালানি কাঠ, পীট আর কয়লা। এদের জ্বালিয়ে আমরা গাছপালায় কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চিত সূর্যের তেজকে মুক্তি দিই।

সূর্য হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেলে গাছপালায় সঞ্চিত তেজ ভাঙিয়ে আমরা কয়েক বছর, বড়ো জোর কয়েক ডজন বছর টিকে থাকতে পারব। তারপর আমাদের গ্রহ থেকে জীবন বিদায় নেবে।

সূর্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে বর্তমান, আরো বহু কোটি নিযুত বছর থাকবে। সারা সৌরজগতে সূর্য হল শক্তি উৎপাদনের সবচেয়ে জোরালো এবং সবচেয়ে টেকসই যন্ত্র।

সূর্য তাপের দু শ' কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ পায় পৃথিবী। তবু অনেকটাই বলতে হবে। পৃথিবী যা তাপ পায় প্রতি বছর তাতে সূর্যরশ্মি খাড়া পড়লে ৬৭ মিটার পুরু বরফ-পাত গলে যাবে।

সূর্য শক্তির ভাগ আমাদের এত কম সেটা ভালো। একসঙ্গে সূর্যের সমস্ত তাপ পৌঁছলে পৃথিবী সত্বর বাষ্পমেঘে পরিণত হত।

টেলিস্কোপের সাহায্যে সূর্যের উপরিভাগের অধ্যয়ন চালান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। কিন্তু খালি চোখে একবার তাকানো অসম্ভব। তাহলে টেলিস্কোপে কী করে দেখে? সমস্যার সমাধান সহজে করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা: টেলিস্কোপের লেন্স তাঁরা কালো কাঁচের পাতে ঢাকেন, সূর্যরশ্মির অনেকটা এটা শুষে নেয়, তাই বিনা ক্ষতিতে তাঁরা তাকাতে পারেন সূর্যের দিকে।

এক শ' গুণ বিবর্ধনশক্তির টেলিস্কোপে দেখলে সূর্যের যা চেহারা তা খালি চোখে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে দেখার মতো।

এখানে টেলিস্কোপের সীমা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। একসঙ্গে সূর্যের সমস্ত চক্রফলককে টেলিস্কোপে দেখা যায় না, ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র দৃষ্টিক্ষেত্রে আসে। থিয়েটারে অপেরা-গ্লাস ব্যবহার করে থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। খালি চোখে স্টেজের সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু কোনো অভিনেতার মুখভাব ভালো করে দেখার জন্য অপেরা-গ্লাস লাগালে শুধু তাকেই দেখবে, কেননা শুধু তার মুখই অপেরা-গ্লাসের দৃষ্টিক্ষেত্রের অন্তর্গত। অন্য অভিনেতাদের দেখতে হলে আলাদা করে প্রত্যেকের দিকে অপেরা-গ্লাস ঘোরানো দরকার।

সমস্ত টেলিস্কোপ আর দূরবীণে এই অসুবিধা বর্তমান। কোনো উপায় নেই, সইতেই হবে।

বিরাট একটি জ্যোতিষ্ক হল সূর্য। একটা মটরশুঁটি যদি পৃথিবী হয়, তাহলে সূর্য

হবে প্রকাণ্ড একটা ফুটি। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ১০৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাস ১২ হাজার কিলোমিটারের একটু বেশি; তাহলে সূর্যের ব্যাস হবে প্রায় ১৪ লক্ষ কিলোমিটার।

মনে কর সূর্য একটি ফাঁপা গোলক, তার কেন্দ্রে পৃথিবী। সে গোলকে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকারী চাঁদেরও ঠাঁই হবে, তখনো তার কক্ষপথ থেকে সূর্যের উপরিভাগের দূরত্ব হবে ৩ লক্ষ কিলোমিটার।

পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়ো। তার মানে সূর্য থেকে পৃথিবীসাইজের ১৩ লক্ষ বল বানানো চলে। তবু পৃথিবীর চেয়ে সূর্য মাত্র ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ ভারি, কেননা যে মালমশলা থেকে তার গঠন তার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের মাত্র সিকিভাগ। সহজে বোঝা যায় ব্যাপারটা: সূর্যের উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে তার মালমশলা থাকতে পারে শুধু ভাপ আর গ্যাসের আকারে।

সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্লাস ৬ হাজার ডিগ্রি। পৃথিবীর কঠিনতম জিনিস প্লাস ৩ থেকে প্লাস ৪ হাজার ডিগ্রিতে গলে যায়। প্লাস ৩,৪০০ ডিগ্রিতে গলে টাঙ্গস্টেন, যে ধাতু থেকে বিজলী বাতির ফিলামেণ্ট তৈরি হয়। সূর্যের উপরিভাগে সবচেয়ে দুর্গল বস্তু ভাপে পরিণত হয়।

সূর্যের উপরিভাগ প্রচণ্ড গরম, ভেতরটা আরো গরম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেবে— সূর্যের ভিতরকার উত্তাপ একটা বিজাতীয় ব্যাপার — প্লাস ২ কোটি ডিগ্রি। এ তাপমাত্রায় বস্তুর রূপ কী, সেটা শুধু অনুমান করা চলে।

ধরো, সৌর পদার্থের একটা ছোট কণা প্লাস ২ কোটি ডিগ্রি গরম হয়ে পৃথিবীতে পড়ে জ্বলতে লাগল অসহ্য দীপ্তিতে। শুধুমাত্র একটা কণা শত শত কিলোমিটার জুড়ে সমস্ত কিছুকে দগ্ধ করে দেবে।

সৌরকলঙ্ক

প্রাচীন কালে লোকে ভাবত যে সূর্যের চেয়ে নিখুঁত জ্যোতিষ্ক আর থাকতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা বলতেন, 'সূর্যের কোনো খুঁত নেই।'

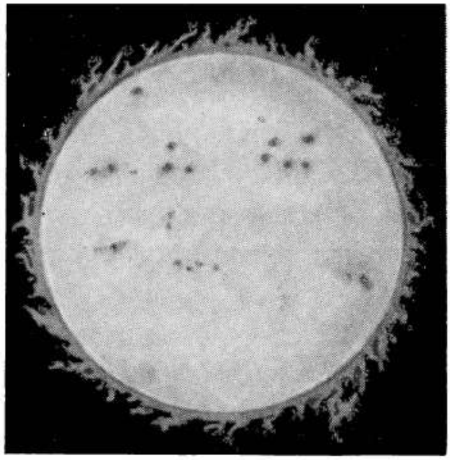
তারপর... হতাশ হতে হল তাঁদের। সূর্যের দিকে টেলিস্কোপ উঁচিয়ে গালিলিও (তার আগে লেনস্‌কে ধোঁয়াটে করে নিয়েছিলেন তিনি) দেখলেন তার গায়ে কালো কালো দাগ, যেগুলো খালি চোখে এতদিন ধরা পড়েনি। কথাটা ঘোষণা করাতে প্রথমে লোকে বিশ্বাস করেনি।

লোকে বলে গালিলিও আর একজন বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে সূর্যে দাগগুলোর কথা জানালেন। বিজ্ঞানীটি পুরাতনপন্থী।

মাথা নেড়ে খুব বিজ্ঞের মতো তিনি বললেন:

'ভাই, পুরনো সব বই আমি অনেকবার পড়েছি, জোর করে বলতে পারি যে তোমার বলা দাগের কথা কিছু নেই সেগুলোতে। ভালোয় ভালোয় যাও, আর মনে রেখো যে দাগগুলো শুধু তোমার চোখেই আছে।'

পরে অবশ্য সবাইকে মানতে হল যে সূর্যের গায়ে দাগ আছে। তখন থেকে বিখ্যাত কোনো লোকের ত্রুটি বিচ্যুতি ঢাকার জন্য লোকে বলে: 'সূর্যেও কলঙ্ক আছে!'



সৌরকলঙ্ক ও উদ্গতি।

দাগগুলো কী এখনো সঠিক আমরা জানি না। কয়েকজন বিজ্ঞানীর মতে, ওগুলো সূর্যের বুকে গড়ে-ওঠে প্রকাণ্ড গ্যাস-আবর্ত, কিন্তু ওদের উৎপত্তি এখনো অজানা।

আশে পাশের চেয়ে দাগগুলির তাপমাত্রা কম, তাই বেশি কালো দেখায়। অবশ্য সূর্যের উত্তাপ থেকে এগুলিতে গেলে আরাম হবে — এটা ভেবে বোসো না যেন। প্রমাণিত হয়েছে যে দাগগুলির তাপমাত্রা প্লাস ৪,৮০০ ডিগ্রি, অর্থাৎ আশে পাশের চেয়ে মাত্র প্লাস ১,২০০ ডিগ্রি ঠাণ্ডা। আর দেখতে যে কালো সেটা তুলনার ব্যাপার। অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বালালে আলোটা অত্যন্ত জোরালো ঠেকে, কিন্তু উজ্জ্বল বিজলী বাতির সামনে দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলে মনে হবে কালো। সৌরকলঙ্কের বেলায় একই ব্যাপার।

দাগগুলি বিরাটাকার, কয়েকটি লম্বায় আর চওড়ায় লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীসাইজের একটা নিরেট গোলক দাগের মধ্যে ফেললে অগ্নিকুণ্ডে ছিপির মতো উধাও হবে।

কয়েকটি সৌরকলঙ্ক দেখা দেবার কিছুকাল পরে মিলিয়ে যায়, কয়েকটি আবার কয়েক সপ্তাহ, এমন কি মাস কয়েক কায়েমি থাকে। দীর্ঘকালস্থায়ী দাগগুলি অধ্যয়নের সময় কয়েকটি চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার ঘটেছে। দেখা গেল জিওর্দানো ব্রুনো যা বলেন ঠিক তাই —— সূর্য নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায়। তার মানে সূর্যের মেরু ও নিরক্ষরেখা আছে। অবশ্য সৌর মেরু নিরক্ষরেখার চেয়ে কিছু ঠাণ্ডা, এটা ভাবা চলে না।

ঠিক পৃথিবীর ধরনে নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায় না সূর্য। সূর্য হল গ্যাসীয় গোলক, এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে আবর্তিত। নিরক্ষরেখায় আবর্তন সবচেয়ে দ্রুত,

মেরুর দিকে মন্থর। সূর্যের নিরক্ষীয় অংশটি সৌর মেরুদণ্ডকে ২৫টি পৃথিবী-দিনে একবার পাক দেয় কিন্তু মেরুর কাছে আবর্তনকাল হল ৩০ দিন।

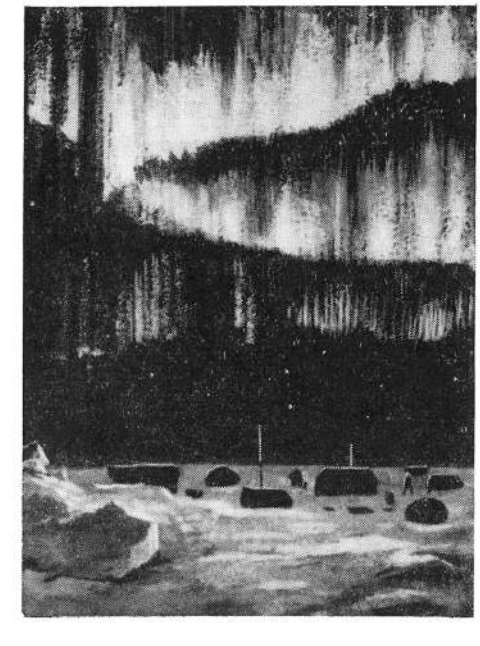
দীর্ঘ অধ্যয়নের ফলে দেখা গিয়েছে যে সৌরকলঙ্কগুলি বদলায়, বাড়ে এবং কমে। তাছাড়া তারা পর্যায়িকও, প্রায় ১১ বছরের পর্যায়।

সুমেরু প্রভার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই, আর উত্তরের বাসিন্দে হলে তো কথাই নেই, স্বচক্ষে দেখেছ। বহুকাল সুমেরু প্রভার প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বোঝাতে পারেননি।

লমোনোসভ লেখেন: 'খুব সম্ভব সুমেরু প্রভার মূলে আছে বাতাসে সক্রিয় বিদ্যুৎ শক্তি।'

দেখা গিয়েছে যে, যে-সব বছরে সৌরকলঙ্ক খুব বেশি সে-সব বছরে সুমেরু প্রভা আরো উজ্জ্বল, আরো ঘন ঘন তার ছটা। এক ধরনের কণার বিরাট স্রোত মহাশূন্যে নিঃসৃত হয় সৌরকলঙ্ক থেকে। কয়েকটি কণা পৃথিবীতে পৌঁছিয়ে ধাক্কা খায় বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরের কণাগুলির সঙ্গে, আর বাতাস হয়ে ওঠে ভাস্বর।

সূর্য-নিঃসৃত এই বিরাট বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পৃথিবীতে চুম্বক-ঝড়ও ঘটে। এ ঝড় সাধারণ ঝড় নয়। আকাশ হয়ত নির্মেঘ, হাওয়া চুপচাপ, ফুর্তিতে গান ধরেছে পাখিরা—কিন্তু কম্পাসের কাঁটা পাগলের মতো এদিক থেকে যাবে ওদিকে, ঠিক জায়গায় থাকার ক্ষমতা তার নেই, অর্থাৎ একটা মুখ উত্তর, অন্যটা দক্ষিণ দিকে থাকবে না।



একটি সুমেরু ঘাঁটি থেকে দৃষ্ট মেরুজ্যোতি।

মেঘলা দিনে কম্পাস হাতে হয়ত বনে গিয়েছ যাতে পথ না হারাও, চুম্বক-ঝড়ে গোলমালে পড়তে পারো।

প্রখর চুম্বক-ঝড়ের সময় সারা পৃথিবীতে সর্ট-ওয়েভ রেডিও বন্ধ হয়ে যায়। এটা সামান্য গণ্ডগোল নয়, বেশ গুরুতর গণ্ডগোল। প্রথম সোভিয়েত ভাসমান মেরু-স্টেশন—'১ নং উত্তর মেরু'র সঙ্গে ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিল শুধু সর্ট-ওয়েভ রেডিও-র মাধ্যমে। মাঝে মাঝে দু তিন দিনের জন্য

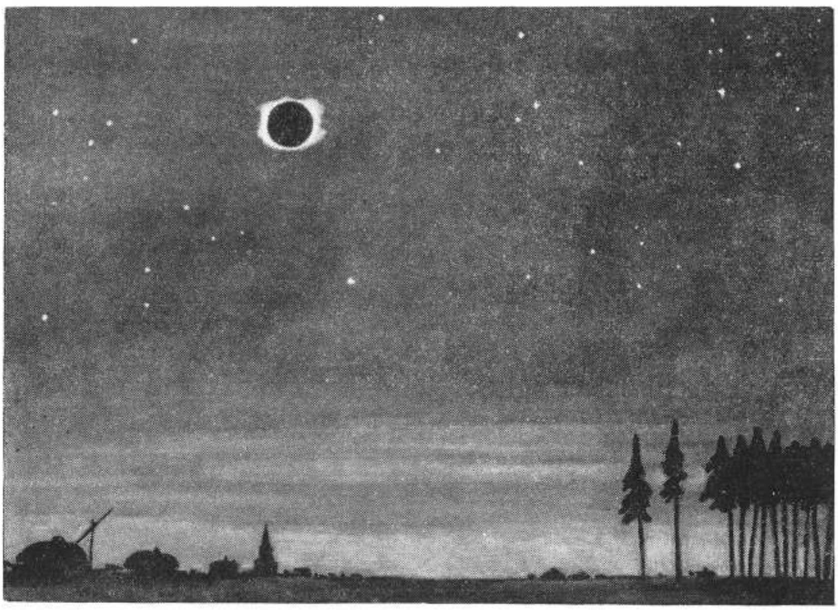
রেডিও যোগাযোগ থেমে যেত। তার মূলে — পৃথিবীমুখী সৌর চক্রফলকে সৌরকলঙ্ক-কণার বড়ো একটা দলের আবির্ভাব।

এও প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়া বদলায় সৌরকলঙ্কের প্রভাবে। সূর্যে যত বেশি কলঙ্ক, পৃথিবীতে তত বেশি ঝড়। সৌরকলঙ্কের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে শুকনো আর বাদলা বছরের পর্যায়ক্রমের যোগাযোগ আছে বলে বিশ্বাস। সমস্যাটা জটিল, এখনো সম্পূর্ণভাবে অধীত হয়নি।

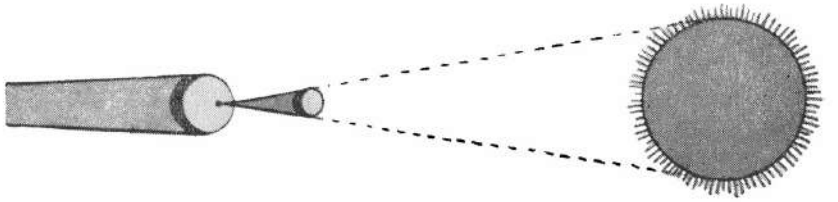
সূর্যগ্রহণ

সেকালে সূর্যগ্রহণ দেখে লোকের যতটা আতঙ্ক হত চন্দ্রগ্রহণ দেখে ততটা নয়। লোকে বুঝত যে সূর্য একেবারে অদৃশ্য হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

লোকে ভাবত সূর্য সদাশয় দেবতা, পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্মদাতা। আর হঠাৎ, খটখটে নির্মেঘ আকাশে একটা কালো অশুভ দর্শন ছায়া এগোতে শুরু করল সূর্যের



সূর্যের পূর্ণগ্রহণ।



সূর্যগ্রহণ কেমন ভাবে ঘটে।

দিকে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, আরো ছড়িয়ে অর্ধেকটা চাকতি ঢেকে ফেলল — একটা ফালিতে পরিণত হলেন সূর্যদেব — তারপর বেমালুম অদৃশ্য।

আতঙ্কে লোকে অভিভূত হত। 'প্রলয় আগত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হতে চলেছে।' প্রাণদাতা সূর্য আর নেই... শত্রুর হাতে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়েছে...

তারপর লোকের কী পুলক! কয়েক মিনিট আঁধারের পর সূর্যের প্রান্তদেশ আবার জ্বলে উঠল আর আধঘণ্টা বাদে সারা আকাশে আবার আলোর সেই অদ্ভুত সমারোহ!

এমন কি পশুজগতেও সূর্য গ্রহণের সময় উত্তেজনা আর ভীতি দেখা যায়। গরুর হাম্বাধ্বনি, ভেড়ার ডাক, কুকুরের কাতর চেঁচানি... নিশাচর পাখিরা বেরোয় শিকারের সন্ধানে, দিনের পাখিরা ঘুমোতে যায় তাদের নীড়ে।

চন্দ্রগ্রহণের মতো সূর্যগ্রহণও পূর্ণ ও খণ্ড হতে পারে। খণ্ডগ্রাসে লোকের মনে ততটা দাগ কাটে না — এতে সূর্যালোক কিছুটা দুর্বল হয়, এই যা।

'চন্দ্রগ্রহণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলেছি যে এমন কি প্রাচীন কালেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগে থেকে গ্রহণের কাল বলতে শেখেন। সর্বদা অবশ্য পারতেন না। চার হাজার বছর আগে চীনে একটা মজার ব্যাপার হয়। সূর্যগ্রহণ ঘটল, কিন্তু রাজজ্যোতিষী হি এবং হো তার কথা আগে থেকে সম্রাট ও লোকদের বলেননি।

পুরনো চীনে ইতিবৃত্তে আছে:

'জ্যোতিষী হি এবং হো সর্বধর্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁহারা ব্যস্ত। কর্তব্যের পরোয়া করেন না, তাঁহাদের উচ্চ পদের যোগ্য তাঁহারা নহেন। জ্যোতিষ্কদের বাৎসরিক পরিগণনা প্রথম তাঁহারা অবহেলা করিয়াছেন। হেমন্তের শেষ মাসে, মাসের প্রথম দিবসে, অপ্রত্যাশিতভাবে সূর্য ও চন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। এই অশুভকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঢাক ঢোল পিটাইবার ব্যবস্থা ছিল না। হিসাবী লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন, সাধারণ লোকে পলায়ন করিল। কিন্তু হি এবং হো মাতাল ছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে বা চক্ষে কিছুই প্রবেশ করে নাই।'

কর্তব্য পালন না করাতে কিম্বা হয়ত হিসাবে ছোট একটা ভুলের জন্য হি এবং হোকে জান দিতে হল — সম্রাটের আদেশে তাঁদের গর্দান গেল।

সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণে অনেক তফাৎ। সে-সময় পৃথিবীর যেখানে চন্দ্র পরিদৃশ্যমান সেখান থেকেই গ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু সূর্যগ্রহণ ঘটে তখন যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, আর মহাশূন্যে এরা সবাই ধাবমান বলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর বুক হয়ে মহাগতিতে চলে। সেজন্য চাঁদের ছায়ার সঙ্কীর্ণ ফালি যেখানে যেখানে পড়ে সেখান থেকে শুধু সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

চাঁদ তো ছোট, তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড়ো প্রকাণ্ড সূর্যকে কী করে তাহলে ঢাকে? এটা হল একেবারে দূরত্বের ব্যাপার — ছোট একটা মুদ্রা চোখের সামনে ধরলে সূর্যকে তোমরা ঢাকতে পারো।

সূর্যের ব্যাস চাঁদের চেয়ে ৪০০ গুণ বড়ো, কিন্তু সূর্যের তুলনায় চাঁদ ৪০০ গুণ আমাদের কাছে। তাই আমাদের কাছে চাঁদ ও সূর্যকে প্রায় সমান সাইজের মনে হয় — মাঝে মাঝে সূর্যকে বড়ো দেখায়, মাঝে মাঝে চাঁদকে।

পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের কেন্দ্র যখন সমরেখায় তখন চাঁদকে সূর্যের চেয়ে বড়ো দেখালে সূর্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে। আর ছোট দেখালে একটি অভিনব বিরল ঘটনা ঘটে যার নাম বলয়গ্রাস — এ সময় চাঁদ সূর্যকেন্দ্রকে ঢাকে বটে কিন্তু চারদিকে থাকে একটি উজ্জ্বল বলয়।

পৃথিবী ও সূর্যের কেন্দ্রের মাঝখানের সরল রেখার এক পাশ হয়ে চাঁদ গেলে সূর্যগ্রহণ খণ্ড হয়।

নিজের সহরে বরাবর বসে-থাকা জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সূর্যগ্রহণ দেখতে হলে বহুদিন সবুর করতে হবে। এক জায়গায় দুবার সূর্যের পূর্ণগ্রাস অতি বিরল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখা যায় ১৯৩৬ সালের ১৯শে জুন। দু শ' কিলোমিটার চওড়া একটা ছায়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত এলাকা অতিক্রম করে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত। গ্রহণের কালে চাঁদের ছায়া মিনিটে ৬০ কিলোমিটার বা সেকেণ্ডে এক কিলোমিটার বেগে চলে — সবচেয়ে দ্রুত যাত্রিবাহী বিমানের চেয়ে দু তিন গুণ বেগে। গ্রহণের সময়ে চাঁদের ছায়ার চেয়ে দ্রুতচর বিমান শুধু হালে নির্মিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাজ চালান অন্যভাবে: যে-সব জায়গায় ছায়া পড়বে সে-সব জায়গায় তাঁরা ঘাঁটি বসান। ১৯৩৬ সালের গ্রহণ ২৮টি সোভিয়েত এবং কয়েকটি বিদেশী ঘাঁটি থেকে দেখা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দেখা পরের গ্রহণটি ঘটে ১৯৪১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর — সে সময়ে চাঁদের ছায়া মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির এলাকা হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের ২৯শে জ্নন আর একটি গ্রহণ সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলে দেখা উচিত ছিল, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহাশত্রু মেঘলা আকাশের জন্য পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা শেষ গ্রহণটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি। সব মিলিয়ে ১৬৫ সেকেন্ড।

স্নর্যের প্নর্ণগ্রহণের সময় কয়েকটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস দেখা সম্ভব। অন্য সময় এগ্নলি চোখে পড়ে না।

স্নর্যমনুকুট

এককালে স্নর্যের নাম ছিল গ্রহাধিপতি। রাজারা মনুকুট পরেন, স্নর্যেরও মনুকুট আছে।

প্নর্ণগ্রাসের সময় প্রথম মনুকুটটিকে দেখেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ভাস্বর এই আভা স্নর্যের উপরিভাগ ছাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার জ্নড়ে ব্যাপ্ত হয় — আসলে চাঁদের অর্ধেক ঔজ্জ্বল্যমাত্র। তাই স্নর্যের চারিদিকে এটি দৃষ্ট হয় না, কেননা স্নর্য হাজার হাজার গ্নণ উজ্জ্বল। স্নর্যের চক্রফলক চাঁদে ঢাকা পড়লে তখনি শ্নধ্ন চোখে পড়ে।

এ মনুকুট হল সৌর বায়নুমণ্ডলের উচ্চ স্তর। ফটোগ্রাফি উদ্ভাবনের আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনুকুটের ছবি আঁকতেন, আজকাল ফটো তোলা হয়। প্নর্ণগ্রাসের মেয়াদ দ্ন থেকে আট মিনিট — এ সময় এমন কি একটা ছবি আঁকাও কঠিন। কিন্তু ফটো তোলা চলে কয়েক ডজন, এমন কি কয়েক শ'।

মনুকুট ছাড়া গ্রহণের কালে পর্যবেক্ষকরা স্নর্যের চক্রফলকের কিনারায় উদ্গতি দেখেছেন। কয়েকটিকে মেঘ, কয়েকটিকে ফোয়ারার মতো দেখতে। ওর কয়েকটি সত্যি সত্যিই মেঘ, স্নর্যের বায়নুমণ্ডলে ভাসমান অগ্নিমেঘ। বিরাট আয়তন এদের, আয়ন্ন কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন।

অন্য উদ্গতিগ্নলি স্নর্য থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দ্নরে বিক্ষিপ্ত ভাস্বর বস্তুর বিরাট জিহ্বা এবং ফোয়ারা। ১৯৩৮ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৫ লক্ষ কিলোমিটার উঁচু একটি উদ্গতি দেখেন।

টেলিস্কোপ উদ্ভাবনের পর স্নর্যের বিষয়ে অনেক কিছ্ন জানা গিয়েছে। আগে ভাবা হত যে স্নর্য হল চকচকে একটা গোলক, গনগনে গরম-করা প্রকাণ্ড লৌহগোলকের মতো। অতি উচ্চ তাপে কোনো জিনিস নিরেট থাকতে পারে না। স্নর্য গ্যাসে ভর্তি, তার লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রায় গ্যাসও গতিহীন হতে পারে না। গ্যাস ক্রমাগত ধাবমান আর এ বেগের শক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাওয়ার দমকের চেয়ে বেশি।

কত নিযুত বছর ধরে সূর্য আছে, কখনো মুহূর্তের জন্য গতিহীন থাকেনি। সূর্যে ঝড়ের অবিরাম দাপট, তাদের প্রচণ্ড শক্তির তুলনায় আমাদের সবচেয়ে ভীষণ হারিকেন সদ্যজাত শিশুর প্রথম নিশ্বাসের মতো মোলায়েম।

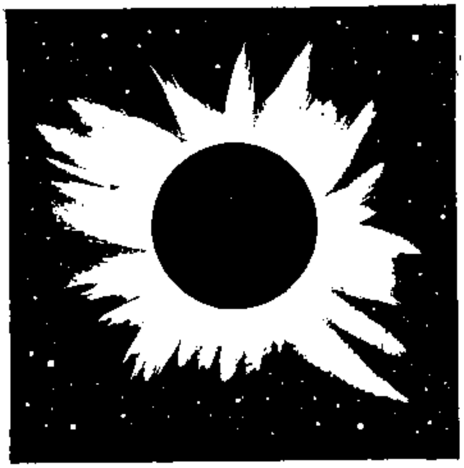
প্রকাণ্ড সৌরকলঙ্ক গড়ে উঠে বিদ্যুৎ শক্তির বিপুল প্রবাহকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে। বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে, কোটি কোটি টন ভাস্বর গ্যাসের পুঞ্জ সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটার বেগে মহাশূন্যে ছোটে। দশ মিনিটের মধ্যে অগ্নিজিহ্বা যতদূর ওঠে সেটা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের সামিল। এ সব উদ্গতির একটির পথে এসে পড়লে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চাঁদের সমস্ত বুক আগুনে মিলিয়ে যাবে।

যে-কোনো সময়ে সৌর উদ্গতিগুলির নিরীক্ষাবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ বানানো হয়েছে, বিনা ছেদে পর্যবেক্ষণ চলে, চলে উদ্গতিগুলোর সংখ্যা গণনা, তাদের ফটো তুলে সিনেমা-ছবিতে পরিণত করা। বেশ সময় বাদ দিয়ে এক একটা এক্সপোজার আলাদাভাবে করা হয়—হয়ত প্রতি ঘণ্টায় একবার। তারপর সাধারণ বেগে ফিল্মটিকে চালালে কোনো একটা উদ্গতির 'জীবন' চিত্র আমরা পাই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, যে-সব বছরে সবচেয়ে বেশি সৌরকলঙ্ক সেই সব বছরেই সবচেয়ে বেশি উদ্গতি এবং উদ্গতিগুলো দেখা যায় দাগগুলোর কাছাকাছি। সাধারণত, নিরীহ শান্ত কয়েকটি বছরের পর সূর্যে দেখা দেয় অশান্ত ঝড়ো বছর—তখন বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুৎপাত বিশেষ প্রখর হয়ে ওঠে। সূর্যক্রিয়ার শান্ত ও ক্ষুব্ধ বছরগুলি রচনা করে ১১ বছরের এক একটা চক্র বা পর্যায়ক্রম।



সূর্যমুকুটের অংশ।



গ্রহণের সময়ে সূর্যমুকুট।

এই পৃষ্ঠার ছবিতে উদ্গতি ঘেরা সূর্যকে দেখো। উদ্গতিগুলির তাপমাত্রা প্রায় প্লাস ৫,০০০। সূর্যের চেয়ে রঙ ময়লা। সাধারণ সময় তাই তারা চোখে পড়ে না। দেখতে পেলে মনে হত সূর্য একটা লোমশ গোলক যার গায়ে ক্রমাগত আকার-বদলানো বিরাট সব ফোলা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে গত এক শ' কোটি বছরে সূর্যের তাপমাত্রা বদলায়নি, সেই সমান উঁচু স্তরে আছে। আর নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে আরো অনেক কোটি বছরে সূর্য হিম হবে না।

নক্ষত্রগুলি কত দূরে?

এবারে আমাদের কল্পলোকের সৌর-সহর ছেড়ে যাওয়া যাক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আরো দূর জায়গায়।

এ বইতে আগেই বলেছি, প্রাচীন কালের লোকেদের ধারণা ছিল যে নক্ষত্রগুলি অচল। আসলে, সমস্ত বিশ্বজগৎ পৃথিবীকে ঘুরে পাক খায়; অবশ্য তোমরা জানো যে এই চক্রপাকটা একটা ভ্রান্তি। এক তারা থেকে অন্য তারার দূরত্ব কখনো বদলায় না।

সপ্তর্ষি নামের নক্ষত্রমণ্ডলকে ধরা যাক। দু হাজার বছর আগে তাদের যে আপেক্ষিক অবস্থান ছিল আজও তাই, এবং আরো হাজার হাজার বছর সমান থাকবে।

কিন্তু তারাদের এই গতিহীনতা — এটাও একটা ভ্রান্তি। মহাশূন্যে ভয়ঙ্কর বেগে তারা ধাবমান, কিন্তু এতদূরে যে তাদের গতি আমরা ধরতে পারি না।

কয়েক শ' বছর ধরে পৃথিবী থেকে তারাগুলির দূরত্ব হিসেবের প্রয়াস করেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু সফল হননি। ১৮৩৭ সালে পুল্‌কোভো মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ভ. ইয়া. স্ত্রুভে ভিগা নক্ষত্র কতদূর তার হিসেবে সফল হন। তিনি দেখলেন যে আমাদের সূর্যের চেয়ে ভিগা প্রায় ১৭ লক্ষ গুণ দূরে।

প্রথম পদক্ষেপটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রুভের সময়ে এবং পরে অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরো অনেক নক্ষত্রের দূরত্ব গণনা করেন।

সবচেয়ে কাছের তারাটির নাম দেওয়া হয় প্রক্সিমা, লাটিনে এর মানে 'সবচেয়ে কাছে'। প্রক্সিমা খুব বড়ো নয়, দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ভালো টেলিস্কোপে শুধু চোখে পড়ে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ডাকেন প্রক্সিমা সেণ্টারি বলে, কারণ এটি সেণ্টারাস নক্ষত্রমণ্ডলে।

প্রক্সিমায় যেতে কত সময় লাগবে? কীসে যাব? কল্পনা করি যে একটা অদ্ভুত রেলপথ বানানো হয়েছে প্রক্সিমা পর্যন্ত, প্রথম ট্রেন পৃথিবীর স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ছাড়ার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। তুমি আমি হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাম টিকিট-ঘরে।

'প্রক্সিমার টিকিট আর আছে না কি?'

'আছে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল টিকিট-বাবু।

'দুটো টিকিটে কত লাগবে?'

'কতো? দেখি... অনেক দূর বলে রেল কোম্পানী একটা যুক্তিসঙ্গত রেট ঠিক করেছে... দশ লক্ষ কিলোমিটার পিছু এক রুবল।'

'আরে, বেশ সস্তা তো!' খুশি হয়ে বলে উঠলাম।

'দাঁড়ান...' বলল টিকিট-বাবু। 'দশ লক্ষে এক রুবল, তার মানে প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিটে ১৫০ রুবল। প্রক্সিমা হল ২৬০ হাজার ইউনিট — তার মানে এক একজনের লাগবে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল।'

আতঙ্কে টিকিট-ঘরের জানলা থেকে আমরা হটে এলাম।

'আর... আর... বলুন তো যেতে ক' দিন লাগবে?'

'বলছি। একটা এক্সপ্রেস যাচ্ছে, ঘণ্টায় এক শ' কিলোমিটার বেগ। সূর্যে যেতে লাগে ১৭৩ বছর আর প্রক্সিমা হল ২৬০ হাজার গুণ দূরে... আপনারা পৌঁছবেন প্রায় সাড়ে চার কোটি বছরে।'

'পথে অন্য স্টেশন পড়বে?'

'মনে তো হয় না, অবশ্য যদি না কোনো গ্রহিকা এসে পড়ে।'

টিকিট-ঘর থেকে আমরা কেটে পড়লাম।

'আর একদিন আসব, আজ অনেক কাজ।'

আমরা চলে আসছি, আমাদের পিছন দিকে বড়ো বিষণ্ণমুখে চেয়ে রইল টিকিট-বাবু।

'মনে হচ্ছে ট্রেনটা দাঁড়িয়েই থাকবে, সব যাত্রীরা ভেগে যাচ্ছে।'

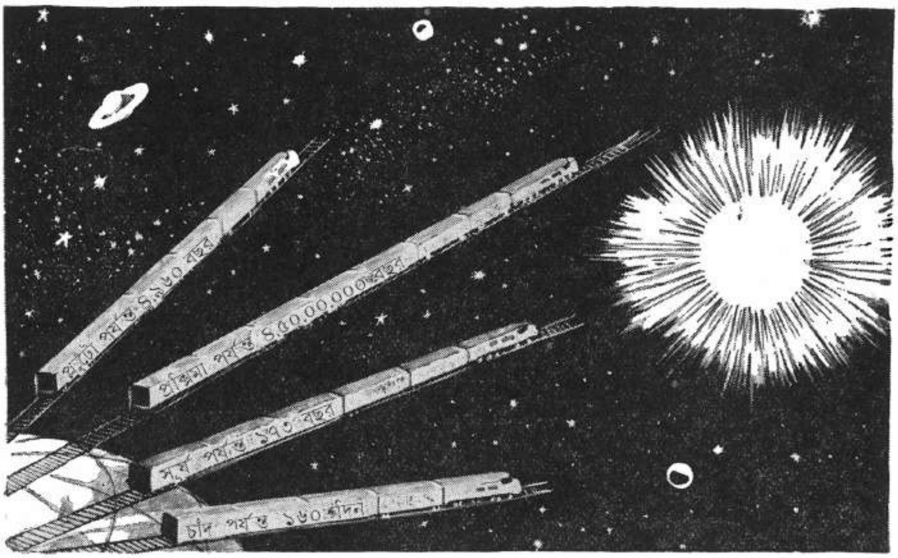
আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে তাহলে রেলওয়ে ট্রেন কোনো কাজের নয়। তারপর মনে পড়ল সেই রকেটটার কথা। চাঁদে আমাদের সেই কল্পিত যাত্রায় লেগেছিল প্রায় ৩৬ ঘণ্টা আর রকেটের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ৪০ হাজার।

তাহলে দেখা যাক রকেটে গেলে কত সুবিধে। ট্রেনের চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি বেগে রকেট চলে, তাহলে বছরের সংখ্যা ৪০০ গুণ কমবে। সাড়ে চার কোটিকে ভাগ করলাম ৪০০ দিয়ে... এমন কি রকেটেও সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে লাগবে ১ লক্ষ ১২·৫ হাজার বছর। তাহলে বোঝো, তারাগুলি কত দূরে!

আগেই একবার বলেছি পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুতগতি জিনিস হল আলোর রশ্মি। প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার — পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব যতখানি ততখানি প্রায়। সত্যি, আলোর রেখায় যদি যেতে পারতাম।

আলোক-রশ্মি একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, অতিক্রম করে ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে। দিনে ১,৪৪০ মিনিট, অর্থাৎ ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডের ১৭৩ গুণ। তাহলে আলোর রশ্মিতে একদিনে আমরা ১৭৩ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট যেতে পারি, আর এক বছরে ৬৩,৫০০ ইউনিট, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ৬৩,৫০০ গুণ।

এক বছরে আলোর রশ্মি যে দূরত্বে পাড়ি দেয় সেটার নাম 'আলোক-বর্ষ'। মহাশূন্যে দূরত্ব মাপের ইউনিট এটি।



মহাশূন্যে যাত্রার জন্য কল্পিত ট্রেন পৃথিবী ছাড়ছে।

সৌরজগতের মধ্যে দূরত্বের মাপে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট বেশ কাজ দেয়, কিন্তু তারাদের দূরত্ব মাপে ইউনিটটা বড়োই ছোট। প্রক্সিমাই তো ২ লক্ষ ৬০ হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট দূরে; আরো হাজার হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ গুণ দূরেও তারা আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিটে এদের দূরত্ব মাপা মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তকের দূরত্ব মিলিমিটারে মাপার মতো ব্যাপার।

তাই মনে রেখ: এক বছর হল সময়ের একটা ইউনিট — ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। আর আলোক-বর্ষ হল দূরত্বের ইউনিট — ৬৩,৫০০ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট।

প্রক্সিমা যেতে কত আলোক-বর্ষ লাগবে? এক একটি আলোক-বর্ষ ৬৩,৫০০ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিটের সমান; প্রক্সিমার দূরত্ব ২ লক্ষ ৬০ হাজার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিট। তাহলে প্রক্সিমা হল চারের বেশি আলোক-বর্ষ দূরে।

আর একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

পৃথিবী থেকে একটি অভিযাত্রী দল নিরাপদে হাজির হয়েছে প্রক্সিমায়। অতি শক্তিশালী রেডিও স্টেশনের সাহায্যে তারা অচিরে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল।

'হ্যালো, হ্যালো। এটা প্রক্সিমা। প্রক্সিমা ডাকছে। শুনতে পারছ, পৃথিবী?'

'হ্যালো, প্রক্সিমা। হ্যালো, প্রক্সিমা। পৃথিবী ডাকছে প্রক্সিমাকে। বেশ শোনা যাচ্ছে। যাত্রা কেমন হল?'

'চমৎকার, পথে উল্লেখ করার মতো কিছু ঘটেনি। আমাদের আরো লোক আর খাবারদাবার পাঠাচ্ছ তো?'

'ওখানে এমন কোনো গ্রহ পেলে যেখানে লোক থাকে?'

'এখনো পাইনি। ছোট একটা গ্রহে তাঁবু ফেলেছি, কিন্তু ধূধূ জায়গা, আর খাবার যা আছে তা মানুষের পেটের যোগ্য নয়।'

'আচ্ছা। লোক আর মালসুদ্ধ মহাশূন্যযান আরো পাঠাচ্ছি। আমাদের স্টেশন এখন তাহলে বন্ধ করি। বিদায়, প্রক্সিমা।'

'বিদায়, পৃথিবী।'

অল্পক্ষণ কথাবার্তা চলল, কিন্তু কতক্ষণ বলো তো? প্রায় ২৫ বছরের বেশি! প্রত্যেকটির প্রশ্নের পর স্টেশনগুলোকে আট বছরের বেশি অপেক্ষা করতে হবে উত্তরের জন্য, কেননা রেডিও-তরঙ্গ চলে আলোর গতিতে।

কি বিরাট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! সবচেয়ে কাছের তারাগুলির দূরত্ব কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। হয়ত ট্রেন, রকেট আর রেডিওতে কথাবার্তার গল্পগুলি ব্যাপারটা বোধগম্য করায় কিছু কাজ দিয়েছে।

পুরাকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত ছোট ভাবত লোকে।

একটি গ্রীক উপকথায় আছে যে হেফেস্টাস দেব (রোমানদের ভল্কান) আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি নেহাই ফেলেন, ন দিন আর ন রাত্রি সেটা শূন্যলোকে চলে। গ্রীকদের ধারণা ছিল এটা বিরাট একটা দূরত্ব কিন্তু ন দিন আর ন রাত্রে পড়ন্ত একটা জিনিস মাত্র ৫ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করবে। এখান থেকে চাঁদ যতদূর তার একটু বেশি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রীকরা যতটা বড়ো মনে করতে তার চেয়ে এমন কি আমাদের সৌরজগৎই হাজার হাজার গুণ বড়ো।

তারা-ভরা আকাশের ছবি

চাঁদহীন রাতে তারা-ভরা আকাশ দেখতে অদ্ভুত সুন্দর। ঘননীল আকাশের গায়ে ছোট বড়ো তারার দপদপানি। মনে হয় সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ। উপরে তাকিয়ে মনে হয় ওদের গোণা অসম্ভব। এটা ঠিক নয়। খালি চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা গোণা হয়েছে অনেক, অনেক দিন আগে। একটি গোলার্ধে ওদের সংখ্যা হাজার তিনেক মাত্র।

হ্যাঁ, মাত্র তিন হাজার — কল্পনাকে অভিভূত করে দেওয়া অবিশ্বাস্য সেই ঝাঁক নয়।

তারার প্রথম তালিকা বানান চীনে জ্যোতির্বিজ্ঞানী শি শেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। তারার তালিকার অর্থ — আকাশে অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণীত-করা সব তারার ফিরিস্তি।

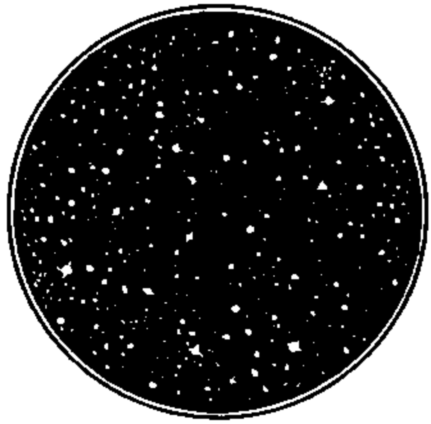
পরে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস আর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সবগুলির নয়, সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলির তালিকা। সমকালীনরা হিপার্কাসের তালিকাকে মহান একটা কীর্তি বলে অভিহিত করেন। সত্যিই মহান: তখনকার দিনে আকাশে কোনো তারার অবস্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তখন সম্বল শুধু অতি সাধারণ সহজ যন্ত্রপাতি আর খালি চোখ।

পরে, পোনেরো শতকে সমরখন্দের খাঁ উলুগ বেগের আদেশে একটি উৎকৃষ্ট নক্ষত্রতালিকা রচিত হয়। উলুগ বেগ নির্মিত মানমন্দিরে এক শ'র বেশি বিজ্ঞানী কাজ চালান। মানমন্দিরের অবশিষ্টাংশ এখনো সমরখন্দে বর্তমান।

টেলিস্কোপ ছাড়াই পর্যবেক্ষণ চলে, কিন্তু ফলাফল হয় অত্যন্ত সঠিক। হিপার্কাসের মৃত্যুর পর ষোলো শ' বছরের মধ্যে এই প্রথম সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাগুলির অবস্থান নির্ণীত হল। পরে তালিকাভুক্ত হয় খালি চোখে দৃশ্যমান সমস্ত তারা।

চোখে যা দেখি তা টেলিস্কোপে দেখা তারার তুলনায় যৎসামান্য। গ্যালিলিও তাঁর ছোট ও দুর্বল টেলিস্কোপ ঘোরালেন আকাশের সেই দিকে যেখানে মাত্র তিনটি তারা

খালি চোখে ধরা পড়ত, আর সে জায়গায় দেখলেন বিশটি। টেলিস্কোপের উন্নতি হতে থাকল, আরো তারা আবিষ্কৃত হল। আজকের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপে কত লক্ষ লক্ষ তারা চোখে পড়ে। অবশ্য তালিকাভুক্ত হয়নি সবকটা। আধুনিক তালিকায় তবু হাজার হাজার তারা আছে।



টেলিস্কোপে দেখা আকাশের একটা অংশ।

তালিকায় নেই এমন সব তারাও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নথিবদ্ধ করেছেন সম্পূর্ণভাবে। সমগ্র আকাশকে কয়েকটা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক একটি বিভাগ এক একটি মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণাধীন। কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি মানমন্দির নিজের নিজের এলাকার ছবি তোলে, আর ফটোগ্রাফের প্লেট সর্বদাই সমান সাইজের। যদি মনে হয় যে আকাশের একটা ভাগে নতুন একটি তারার আবির্ভাব ঘটেছে, পুরোনো একটি অদৃশ্য হয়েছে, তাহলে সে ভাগের একটা ছবি তুলে পুরোনো নেগেটিভের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই হল।

তারার নিরীক্ষায় ফটোগ্রাফির অসীম গুরুত্বের কথা বলা দরকার।

প্রাচীন কালে যন্ত্রণা দেবার একটি ভয়াবহ উপায় ছিল: লোকের হাতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে দেওয়া হত। প্রথমে মনে হবে, এ আবার কী যন্ত্রণা। প্রথম ফোঁটাগুলি হাতের কোনো ক্ষতি করত না, তারপর চামড়ায় একটা ফোস্কা পড়ত, ফোস্কা ফাটত, তারপর প্রত্যেকটি জলের ফোঁটা অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দিত ক্ষতে। একটা অনেক দিনের কথা তো আছে: 'ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর পর্যন্ত ক্ষয়ে যায়।'

ফটোগ্রাফিক প্লেটে বা ফিলমে আলোর ক্রিয়াটা ঠিক এ-রকম। প্রথম প্রথম অত্যন্ত ক্ষীণজ্যোতি তারার আলোক-রশ্মি প্লেটে কোনো দাগ কাটে না; কিন্তু সময় কাটে, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর প্লেটে দেখা দেয় তারাটির প্রতিচ্ছবি। বলতে গেলে তারার রশ্মি প্লেটে তারার একটা ছবি যেন খোদাই করে। কিন্তু মানুষের চোখে অত শক্তি নেই। টেলিস্কোপে তাকিয়ে একটা ক্ষীণজ্যোতি তারা দেখতে পেলে না, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এক নাগাড়ে দশ ঘণ্টা চেয়ে থাকো, কিন্তু তারাটি চোখে পড়বে না।

১৬৮ পৃষ্ঠার ছবিটা দেখ।

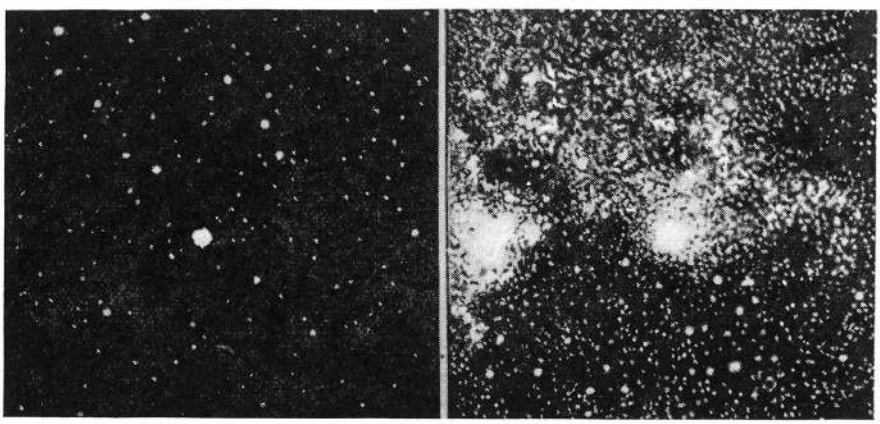
বাঁ দিকের ছবিটা খালি চোখে দেখা আলফা সিগ্নি তারার আশে পাশের এলাকার। ডান দিকেরটা ১৩ ঘণ্টা এক্সপোজারে তোলা একই জায়গার ছবি।

আলোর একটা বিন্দুর আকারে কোনো তারার প্রতিচ্ছবি ফটো-প্লেটে পেতে হলে টেলিস্কোপকে চালাতে হয় ঘড়িযন্ত্রে। দৃষ্টিক্ষেত্রের সমস্ত তারাকে রাখতে হয় প্লেটের একটা অংশে।

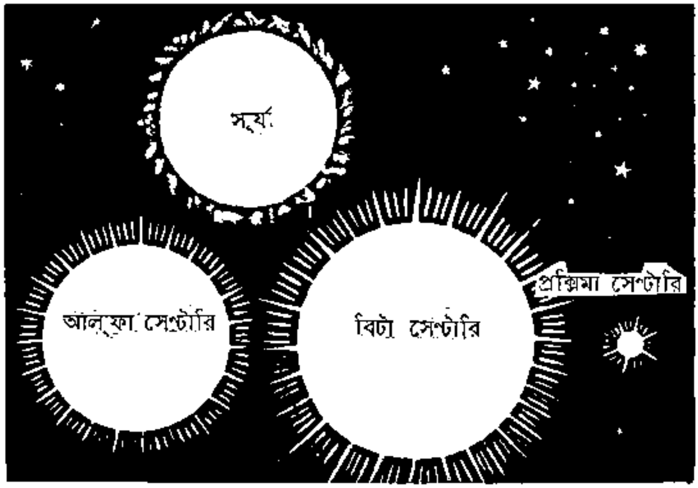
তারার তালিকায় শুধু অবস্থান নয়, তাদের ঔজ্জ্বল্যের কথাও থাকে। ঔজ্জ্বল্য অনুসারে তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয় — কয়েকটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, অন্যগুলি অতি ক্ষীণ।

দৃশ্যমান সমস্ত তারা-ভরা আকাশের চেয়ে তিন হাজার গুণ বেশি আলো দেয় পূর্ণচন্দ্র। আর একটা ছোট চাঁদ, এমন কি আসল চাঁদের এক-শতাংশ আয়তনের একটা চাঁদ যদি থাকত, তার জ্যোতি হত সবকটি তারার জ্যোতির চেয়ে বেশি।

টেলিস্কোপে দেখলে তারাগুলোকে ঘননীল আকাশের গায়ে ছোট ছোট উজ্জ্বল বিন্দুর মতো ঠেকে। তারার আয়তন বাড়িয়ে গ্রহের মতো চক্রফলক বা বৃত্ত করে দেয় না টেলিস্কোপ। আমাদের কাছে আনে শুধু তাদের, তবু তখনো এত দূরে তারা যে বৃত্তের মতো করে দেখা চলে না। কিন্তু কাছে আনে বলে খালি চোখে না-দেখা তারাগুলিকে আমরা দেখি। তারাবিশেষের আয়তন বাড়ানো টেলিস্কোপের কাজ নয়, তার কাজ হল দৃশ্যমান তারার সংখ্যা ও তাদের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা বাড়ানো।



খালি চোখে দেখা আকাশের একটা অংশ (বাঁ দিকে) আর (ডান দিকে) শক্তিশালী টেলিস্কোপে তোলা ফটো।



সূর্য ও কয়েকটি নক্ষত্রের তুলনামূলক আয়তন।

তারাগুলি রঙ বেরঙের। সিরিয়স বা লুব্ধকের রঙ সাদা, কাপেল্লা হলুদ, আর্কটুরাস নারাঙ্গি আর আল্‌ডেবারান লাল। এদের নাম অতিপ্রাচীন, এখনো সেই নামেই ডাকা হয়। অবশ্য সবকটি জানা তারার নাম দেওয়া সম্ভব হয়নি, সবচেয়ে উজ্জ্বলগুলির শুধু নামকরণ হয়েছে।

আদিকাল থেকেই লোকে লক্ষ্য করেছে যে উজ্জ্বল তারাগুলির কয়েকটি জোট বেঁধে আকাশে এক একটা ছক বানিয়ে থাকে। এদের বলা হয় নক্ষত্রমণ্ডল। 'কম্পাসের পয়েণ্ট' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়ে কিছু বলেছি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনো নক্ষত্রমণ্ডলগুলির গ্রীক নাম ব্যবহার করেন। পরবর্তী কালে অনেক নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আবিষ্কৃত হয়, তাদের নাম সাধারণত পৌরানিক নয়, সাধারণ জিনিসের নাম। এ-ভাবে আকাশে দেখা দিল 'ক্লক', 'মাইক্রোস্কোপ', এমন কি 'পাম্প' এবং 'কম্পাস'। অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এগুলির লাটিন নাম ব্যবহার করেন — হর্লোগিয়ম, মাইক্রস্কোপিয়ম ইত্যাদি।

আকাশে ৮৮টি নক্ষত্রমণ্ডল এখন আমাদের পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাপারটা কী? তাঁরা জানেন এক একটা নক্ষত্রমণ্ডল হল দৃশ্যমান উজ্জ্বল তারার দঙ্গল। এ বইতে একাধিকবার বলেছি যে তারাগুলি দেখতেই শুধু গতিহীন, স্থিরনিবদ্ধ। আসলে মহাবেগে তারা ধাবমান, কিন্তু অনেক দূর থেকে। হাজার হাজার বা



উত্তর গোলার্ধের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলগুলি।

লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেলে কোনো তারার স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব। নক্ষত্রমণ্ডলের আকার ক্রমাগত বদলায়, কিন্তু অলক্ষিতে।

নক্ষত্রমণ্ডলগুলির নামকরণ হয় কেন? যে-কারণে রাস্তাঘাট সহর গ্রামের নাম দেওয়া হয়, ঠিক সে-কারণে। মণ্ডল হিসেবে তারার 'ঠিকানা' দেওয়া বেশ সহজ। আগে বলেছি কয়েকটি তারার মাত্র নিজের নাম আছে। অন্যদের নাম দেওয়া হয় এ-ভাবে: প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডলে কয়েকটি তারা উজ্জ্বল আর বেশির ভাগ ক্ষীণ। উজ্জ্বল তারাগুলিকে গ্রিক বর্ণমালার অক্ষরমাফিক ডাকা হয় যেমন আল্ফা সেণ্টারি, বিটা হার্কিউলিস, ইত্যাদি। ক্ষীণজ্যোতি তারাগুলিকে ডাকা হয় যেমন ৬১ সিগ্নি (সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলের ৬১ তারা)।

নাবিক, স্থল পর্যটক, বিমানবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ইত্যাদি অনেকের প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে চেনা দরকার। অপরিচিত স্থানে রাত্রে এদের দেখে চলার সুবিধে।

আকাশ-মানচিত্রের একটা জিনিস আমাদের প্রায়ই মনে থাকে না। ছবিটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল পরিস্থিতির খাঁটি প্রতিভূ নয়। প্রত্যেকটি তারা হল এক একটি সূর্য, আলোর সাহায্যে আমাদের কাছে নিজের অস্তিত্বের বার্তা পাঠায়। আলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছয় না, আসে সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে। পৃথিবীবাসীদের কাছে এটা তাজ্জব বেগ বটে, তবে শুনেছ তো যে সবচেয়ে কাছের তারায় যেতে আলোর লাগে চার বছরের বেশি। আর এমন অনেক তারা আছে যাদের আলো আমাদের কাছে আসে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর পরে।

এখনকার তারাকে আমরা দেখি না, দেখি তার অতীত অবস্থাকে। অসম্ভবকে কল্পনা করার চেষ্টা করো: সমস্ত তারা একসঙ্গে নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কি আকাশ কালো আর অন্ধকার হয়ে যাবে? মোটেই্ না। প্রথম তারা অর্থাৎ প্রক্সিমা নিভবে চার বছর বাদে, উধাও হয়ে যাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের টেলিস্কোপের দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, খালি চোখে তো নজরে পড়বেই না। অন্য তারাগুলো আগেকার মতোই জ্বলবে, দু তিন বছরের মধ্যে কয়েকটা ছোট তারা মিলিয়ে যাবে। সর্বনাশের ন বছর পরে ঝকঝকে সিরিয়স

বিলুপ্ত হবে, তাতে অবশ্য আমাদের দেখা আকাশের ইতরবিশেষ হবে না। শত শত, হাজার হাজার বছর ধরে নক্ষত্র খচিত আকাশ পৃথিবীর উপরে প্রসারিত থাকবে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে শুধু শক্তিশালী টেলিস্কোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানী (তখনো যদি পৃথিবীতে মানুষ থাকে) আকাশ থেকে শেষ তারাটিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখবেন।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আকাশে একটা নতুন তারার হঠাৎ ঝলক চোখে পড়ল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর (এ-রকম তো ঘটে)। প্রথম কখন তারাটি এ-ভাবে জ্বলে ওঠে? আজ। কিন্তু আজ নয় মোটেই, হয়ত শ'খানেক, হয়ত হাজার বছর আগে। আজ শুধু ওর আলো আমাদের খবর দিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নতুন একটা ঘটনা ঘটেছে। আর আজ যদি কোনো তারার প্রথম দীপ্তি ফুটে ওঠে, লক্ষ লক্ষ বছর পরে তাকে দেখবেন পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

তারার আলো হল সুদূর নানা জগতের একমাত্র সংবাদদাতা। ওরা আমাদের কতটা জানায়? মহাশূন্যের কোথাও তারা আছে, শুধু এ কথাটা? না, কেননা লোকে এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে যেগুলি তারার আলো থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করে। তারা জানে তারাটি কত সুদূরে, মহাশূন্যে কোন দিকে তার যাত্রা, কত তার গতিবেগ, কী দিয়ে সে তৈরি। মাঝে মাঝে বিজ্ঞানীরা কোনো একটা তারার বয়স, আয়তন আর ভর বের করে ফেলেন, এমন কি তারাটি নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে পাক খায় কিনা, তার অনুচর বা গ্রহ আছে কিনা, সে কথাটা পর্যন্ত বের করেন (এ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিকাশের উচ্চ একটা স্তরে এসেছে। উত্তরসূরীরা তারাদের বিষয়ে কত কী জেনেছে সেটা আগেকার দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বললে তাঁরা নিঃসন্দেহে বলে উঠতেন:

'গাঁজাখুরি ব্যাপার!'

কাল যেটা ছিল অসম্ভব আজ সেটা সম্ভব। মানুষের মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যালোকের ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করছে।

উপসংহার

মহাজাগতিক যুগের সূত্রপাত হল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় মহাশূন্যে।

বছর কাটল, আবার ঘটল চাঞ্চল্যকর নানা ঘটনা: প্রথম কৃত্রিম গ্রহ সূর্যের চারদিকে নিজের অক্ষয় পথ রচনা করল, চন্দ্রে পেঁছিল সোভিয়েত জাতীয় প্রতীক, চন্দ্রের অগোচর দিকের ছবি তোলা হল।

মহাজগৎ বিজয়ের সংগ্রামে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন ১৯৬০ সালে: জীবন্ত প্রাণী মহাশূন্যে যাত্রা সমাপ্ত করে ফিরে আসে পৃথিবীতে।

১৯৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আর একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল — সৌরমণ্ডলের গ্রহে যাবার পথ খুলে গেল। শুক্রগ্রহের দিকে রওনা হল স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশন। এর নির্মাতা সোভিয়েত মানুষ।

এই স্টেশন পৃথিবীর বুক থেকে সরাসরি নিজের যাত্রাপথে যায়নি। একটি ভারি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে নিয়ে যায় বহুপর্যায়ী নিখুঁত একটি রকেট। সেই দিনই উপগ্রহ থেকে বেতার সঙ্কেতে একটি মহাজাগতিক রকেট শুক্র অভিমুখে পাড়ি দেয়। রকেটটি স্বয়ংক্রিয় আন্তঃগ্রহ স্টেশনের বাহন। স্টেশনটির ওজন ৬৪৩·৫ কিলোগ্রাম. বহু মাপযন্ত্র ও বেতারযন্ত্রের আধার এটি। বেতারযন্ত্রে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে বার্তা পাঠানো এবং গ্রহণ করা যায়।

সমস্ত পৃথিবী হতবাক হয় এই অত্যাশ্চর্য কীর্তিতে। এ-রকম একটি জমকালো স্টেশন সৃষ্টির আগে সমস্ত যন্ত্রপাতি চুলচেরা সঠিক নিখুঁত ও শক্ত করা দরকার। উৎক্ষেপের সেই নিদারুণ ধাক্কার পর, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাত্রার পর একটা স্ক্রু একটা স্প্রিং এক চুল নড়লে চলবে না; স্থানচ্যুত হওয়ার মানে সমস্ত কাজ পণ্ড হওয়া। যন্ত্রপাতি আকারে মিনিয়েচরের মতো এবং হালকা —রুমিং মিল বা স্বয়ংক্রিয় ক্রেন তো নয় — ওরা হল তার এবং লেভার, চাবি এবং সুইচের একটি জটিল বুনোট। সমস্ত যন্ত্রপাতি টিকে থাকে, স্টেশনটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছয়, এবং প্রথম তথ্য থেকে বোঝা যায় যে এটি তার কোটি যোজন দীর্ঘ পথে লক্ষ্য অভিমুখে ধাবমান। ১৯৬১ সালের মে মাসের মধ্যে শুক্রগ্রহে এটির পৌঁছবার কথা ছিল।

শুক্র অভিমুখে মহাব্যোম স্টেশন পাঠাবার পর একমাস যেতে না যেতে সারা পৃথিবী আর একটি অত্যাশ্চর্য সংবাদে অভিভূত হল। ঘটল মহান একটি ঘটনা — ইতিহাসে প্রথম মানুষ যাত্রা করল মহশূন্যে।

১৯৬১ সাল, ১২ই এপ্রিল, সকাল নটা বেজে সাত মিনিটে (মস্কো সময়) সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মহাব্যোমযান 'ভস্তক' (উদয়াচল) উঠল পৃথিবী প্রদক্ষিণের কক্ষপথে। ওজন ৪,৭২৫ কিলোগ্রাম। এর ভিতরে ছিলেন প্রথম মহাকাশচারী, সোভিয়েত মেজর ইউরি গাগারিন।

পূর্বনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ এবং বিচরণ-কর্মসূচীর সার্থক পরিপূরণ এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর 'ভস্তক' সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি পূর্বনির্ধারিত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে দশটা-পঞ্চান্নয়।

যাত্রার পুরো সময়টা দুঃসাহসী মহাকাশচারী গাগারিনের সঙ্গে উভয়মুখী বেতার

যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। রেডিও-টেলিমেট্রিক ও টেলিভিশনের সাহায্যে, বিচরণের সময় তাঁর অবস্থায় নজর রাখা হয়। মহাকাশে বিচরণ এবং পৃথিবীতে অবতরণের সময় তিনি চমৎকার ছিলেন।

সোভিয়েত 'ভস্তক'এর যাত্রা প্রকৃতির উপর মানুষের অভূতপূর্ব জয়লাভ, সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনিকের মহান কীর্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে বীরত্বপূর্ণ এই যাত্রা।

প্রথম সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ এবং 'ভস্তক'এর মধ্যে কালের ব্যবধান চার বছরেরও কম। সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনিক যে মহীয়ান পথ রচনা করেছে তার বিভিন্ন পর্যায় সকলের কাছে পরিচিত: প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক রকেট, চাঁদে প্রথম মহাব্যোমযান, শুক্র অভিমুখে উড্ডীন মহাব্যোমযান; জীবন্ত প্রাণী নিয়ে একটির পর একটি মহাব্যোমযান গিয়ে ফিরে আসে ভূপৃষ্ঠে। সোভিয়েত মানুষই যে প্রথম মহাকাশে বিচরণ করেছে তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত। ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই কীর্তিতে ফুটে উঠেছে সোভিয়েত জনগণের প্রতিভা, সমাজতন্ত্রের মহান শক্তি।

মহাব্যোমে বিচরণের যুগ শুরু হয়েছে!

বেশি দিন আর লাগবে না, স্বয়ংক্রিয় পোত পেঁছবে চাঁদ, শুক্রগ্রহ এবং মঙ্গলগ্রহে। যন্ত্রমানুষ গ্রহের আবহাওয়া দেখে শুনে পৃথিবীতে বেতারযোগে খবর পাঠাবে, ফটো নেবে, রকেট অবতরণের স্থান ঠিক করবে... তখন অজানা জগতের মাটিতে পা দেবে মানুষ।

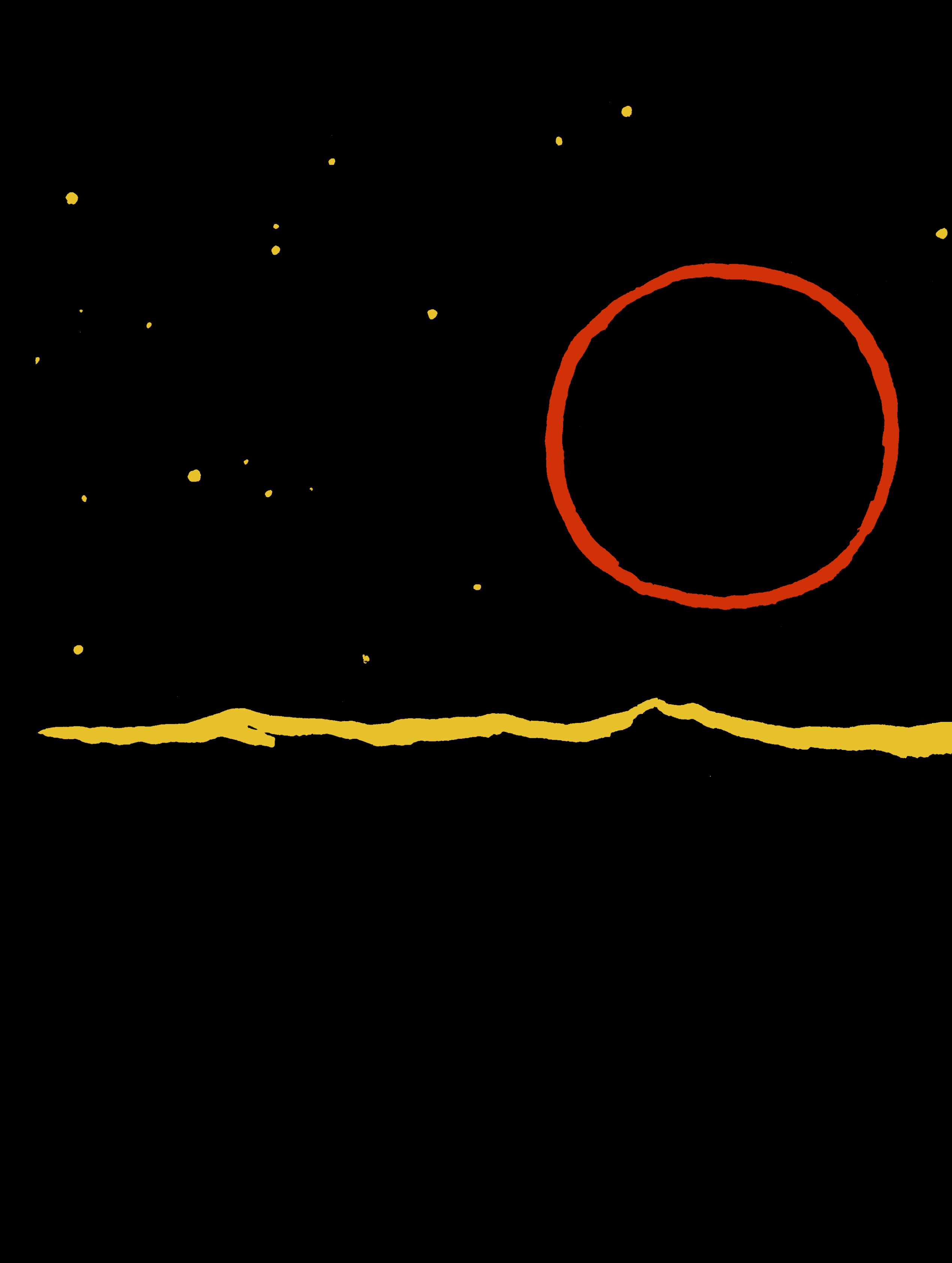
সন্দেহ নেই যে কয়েক দশক বছর পরে সূর্যের অদূরবর্তী মহাকাশ মানুষের আয়ত্তে আসবে। তারপর শক্তিশালী মহাজাগতিক পোত পাড়ি দেবে দূর নক্ষত্রলোকে।

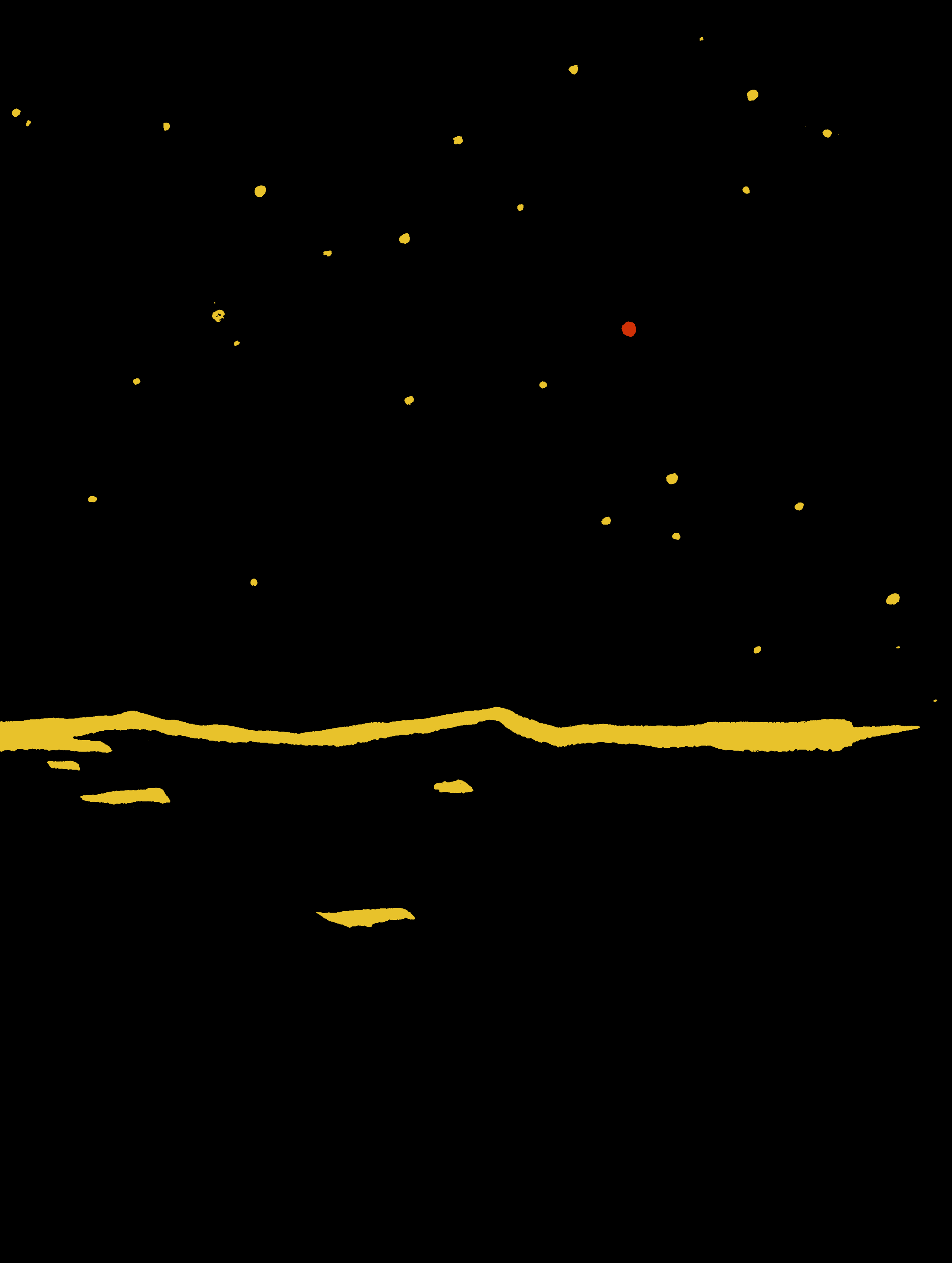
পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union





আ. ভলকভ পৃথিবী ও আকাশ

